প্রথম প্রকাশ, ১৩৮৭

প্রকাশক
সুধাংশুশেখর দে
দে'জ পাবলিশিং
৩১/১বি মহাত্মা গান্ধি রোড
কলকাতা ৯

প্রচ্ছদ ও অলংকরণ
গৌতম রায়

মুদ্রাকর
নিশিকান্ত হাটই
তুষার প্রিন্টিং ওয়ার্কস
২৬ বিধান সরণি
কলকাতা ৬

উৎসর্গ

ইন্দ্রাণী ও শ্যামলেন্দু ভট্টাচার্যকে

মনে আছে জুল ভের্ন-এর সেই সাড়াজাগানো 'আশিদিনে ভূপ্রদক্ষিণ' (*Le Tour du monde en quatrevingts jours*)? ভারতবর্ষ আর চীনদেশ—প্রাচীর এই দুই প্রাচীন দেশের চমকপ্রদ ও উপভোগ্য বিবরণ ছিলো তাতে, এই দুই দেশ সম্বন্ধে পাঠকদের কৌতূহলও বেড়ে গিয়েছিলো প্রচুর। আর সেই জন্যেই ভারত সম্বন্ধে পাঠকদের কৌতূহল ও চাহিদা মেটাবার জন্য তিনি লিখেছিলেন সিপাহীবিদ্রোহের পটভূমিকায় 'স্টীম হাউস' (*La Maison à vapeur*)। ঠিক সেই সময়েই 'স্টীম হাউস'-এর এই জুড়িরই 'যত ঝক্কি যত ঝামেলা' তিনি লিখেছিলেন (*Les Tribulations d'un chinois en Chine*. *1879*) যে-গল্পটা ফাঁদা হয়েছে চীনদেশে, তাই-পিং বিদ্রোহের ঠিক অব্যবহিত পরে। সেই রুদ্ধশ্বাস ও রগরগে আবহাওয়ায় এই গল্পের নায়ক কিন-ফো তার পরিচারক সুন আর দুই মার্কিন গোয়েন্দা ক্রেগ আর ফ্রাই-এর সঙ্গে ছুটে বেরিয়েছে এই বিশাল দেশের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত পর্যন্ত—লাও-শেন নামে এক দুর্ধর্ষ দস্যুর সন্ধানে। রোমাঞ্চকর উপন্যাস, আর পাতায়-পাতায় তাকলাগানো ধাঁধাজাগানো সব চমকপ্রদ বিস্ময়, আর তারই সঙ্গে মিশেছে হাস্যরোল। এমন বই জুল ভের্নও আর লেখেননি। অ্যাদ্দিন পরে সে-বই বেরুলো মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের তর্জমায়: যত রহস্য, যত রোমাঞ্চ, তত মজা!



জুল ভের্ন (১৮২৮–১৯০৫)

১

জ্যোৎস্না রাতের প্রথম প্রহর

ব'সে ছিলো ছয় জনে : সান্ধ্য ভোজ চলেছে ; মারবেল পাথরের চেয়ারের হাতলে কনুই ঠেকিয়ে পদ্মমূলের টুকরো ঠোকরাতে-ঠোকরাতে বললো একজন, 'যা ই বলো, বেঁচে থাকার মধ্যেও কিন্তু দিব্য সুখ আছে।'

'তা আছে বৈকি, তবে দুঃখও অনেক,' হাঙরের ডানা গলায় বেঁধে গিয়ে কাশছিলো একজন, অনেক কষ্টে কাশির দমকের হাত থেকে রেহাই পেয়ে সে বললো।

'তাহ'লে দার্শনিক হ'য়ে যাও,' এদের মধ্যে একজন ছিলো বয়স্ক, কাঠের রিম-ওলা মস্ত চশমা তার চোখে ; সে উপদেশ দিলে, 'তাহ'লে দার্শনিকের মতো কোনো উচ্চবাচ্য না-ক'রে জীবন যা দেয়, তা-ই গ্রহণ করো ; আজ কেশে-কেশে তোমার দমবন্ধ হ'য়ে যাবার উপক্রম হয়েছে, কাল এই সোমরসের মতো দেখবে কোথায় উধাও হ'য়ে গেছে সেই অস্বাচ্ছন্দ্য। জীবন এই রকমই!' ব'লে সে আস্ত এক পাত্রভর্তি মদ ঢেলে দিলো গলায়।

'আমার কথা যদি বলো,' চতুর্থ একজন মন্তব্য করলে সুচিন্তিত, 'আমার তো বেঁচে থাকতে দিব্যি লাগে—বিশেষ ক'রে যদি প্রচুর টাকাকড়ি থাকে, আর যদি কোনো কাজ-কারবার করতে না-হয়।'

'উঁহু, ঠিক তার উলটো,' পঞ্চমজন তার মত ব্যক্ত করলে, 'সত্যিকার সুখ কিন্তু হাড়ভাঙা খাটুনি আর দিবারাত্রি অধ্যয়নের মধ্যেই ; সুখ পেতে হ'লে তোমাকে জ্ঞান অর্জন করতেই হবে।'

'আর শেষকালে এই পরম দিব্যজ্ঞান লাভ হবে যে কিছুই তোমার জানা নেই।'

'তা এই বোধ থেকেই কি বোধির জন্ম হয় না? এটাই তো সূচনা—'

'এই যদি সূচনা হয় তো শেষ কোনখানে?'

'বোধির আবার শেষ কী? জ্ঞানের আবার কোনো সীমা আছে নাকি?' চশমাধারী জানালো, 'তবে তোমার যদি বৎসামান্য কাণ্ডজ্ঞান থাকে তাহ'লেই তুষ্টি আর সন্তোষের অভাব থাকবে না।'

'আর এ-বিষয়ে আমাদের গৃহকর্তার অভিমত কী? জীবনকে তার কী মনে হয়? সুখসমৃদ্ধির আনন্দমেলা, না দুঃখকষ্টের অগ্নিজ্বালা?' গৃহস্বামী যথারীতি টেবিলের মাথায় বসেছিলো, তাকে উদ্দেশ ক'রে প্রথম ব্যক্তি এই প্রশ্ন রাখলো এবার।

গৃহকর্তা এতক্ষণ চুপচাপ বসেছিলো; একটু যেন আনমনা, এ-সব অহেতুক তর্কে তার যেন মন নেই, তরমুজের বিচি ঠোকরাতে-ঠোকরাতে সে যেন অন্য-কোনো কথা ভাবছিলো এতক্ষণ। এবার সোজাসুজি তাকেই জিগেশ করায় সে কেবল তাচ্ছিল্যের সঙ্গে একটি আওয়াজই বের করলো মুখ দিয়ে: 'ফুঃ!'

এখন, 'ফুঃ' শব্দটা সব ভাষারই অন্যতম মূল্যবান সম্পত্তি; এমনিতে ছোট্ট একখানা এক-অক্ষুরে শব্দ হ'লে কী হবে, তার থেকে অনেক রকম অর্থ বের করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে এটা যেন তাঁর পাঁচ জন অতিথির মধ্যে কোনো তুমুল তর্ক শুরু ক'রে দেয়ার সংকেত হিশেবে কাজ করলো; প্রত্যেকেই অত্যন্ত উত্তেজিত ও অনুপ্রাণিত হ'য়ে উঠে নিজের-নিজের মতের সপক্ষে প্রচুর বাকতাল্লা শুরু ক'রে দিলো, আর মাঝে-মাঝে প্রত্যেকেই একটু থেমে গিয়ে এ-বিষয়ে তাদের গৃহকর্তার মত কী জানতে চাইলো।

গৃহকর্তা অবিশ্যি বেশ কিছুক্ষণ আর-কোনো বাক্যব্যয় করা থেকে বিরত রইলো। কিন্তু অবশেষে সে এই স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হ'লো যে বেঁচে-থাকা সম্বন্ধে তার কোনো বক্তব্য নেই: জীবন তার কাছে আমোদের প্রস্রবণ নয়, দুঃখের নির্ঝরও নয়—সুখদুঃখের কোনো অনুভূতিই জীবন তাকে দেয় না; জীবনকে তার কাছে কোনো অতিতুচ্ছ প্রতিষ্ঠান ব'লে মনে হয়; জীবনকে হাজার নিংড়েও কোনো তীব্র আনন্দের অনুভূতি ভোগ করা যাবে ব'লে তার নাকি মনে হয় না।

শুনে শ্রোতাদের মধ্য থেকে সমস্বরে বিস্ময়ের ধ্বনি উত্থিত হ'লো।

'শোনো, ওর কথা শোনো একবার!' বললো একজন।

'কোনো পল্লপাতাও জীবনে যার আরাম নষ্ট করেনি, তার মুখের কথা শোনো তোমরা,' আরেকজন বললে।

'আর এত অল্প বয়েস তার, এখনো—'

'শুধু যে তরুণ তা নয়, দিব্য আছে—সুস্থ, ধনী, স্বাস্থ্যবান—'

'ঐশ্বর্যের যার কোনো পরিমাণ নেই—'

'বোধহয় একটু বেশি ধনী, আর তাইতেই এই গণ্ডগোল।'

এবংবিধ মন্তব্যও গৃহকর্তার ভাবলেশহীন মুখে স্মিত হাসির কোনো ঝাপশা

রেখাও ফুটিয়ে তুলতে পারলো না। কেবল অসহায় ভঙ্গি ক'রে কাঁধ ঝাঁকালো সে একবার ; ভঙ্গিটা তার এ-রকম, যেন জীবনখাতার পাতার দিকে চোখ চেয়ে দেখারও মেজাজ নেই তার, যেন কোনো তাড়াও নেই পাতা উলটে হুড়মুড় ক'রে বিষয়টা দেখে নেবার।

বয়েস তার একত্রিশ। নিখুঁত তার স্বাস্থ্য, অজস্র তার বিত্তসম্পদ ; রুচি বা সংস্কৃতির অভাব থেকে যে তার মন নিঃসাড় হ'য়ে গেছে তা নয় ; আর যদি মেধা আর বুদ্ধির কথা ওঠে তো বলতে হয় যে সে সাধারণ লোকের চেয়ে কিঞ্চিৎ ঊর্ধ্বেই সে স্থান পাবে। এই মরলোকের যাবতীয় জীবদের মধ্যে সবচেয়ে সুখী মানুষ না-হবার কোনো যুক্তিসংগত কারণ তার নেই।

এই হৈ-চৈ এর মধ্যে তখন দার্শনিকের গম্ভীর গলা শোনা গেলো, যেন কোনো প্রাচীন কোরাসের মধ্যে দলনেতার গলা বেজে উঠেছে : 'শোনো হে ছোকরা, নিজেকে যদি তোমার সুখী ব'লে মনে না-হয় তো এটা জেনে নাও যে এতকাল তোমার সুখের চরিত্র ছিলো নেতিমূলক ; স্বাস্থ্য, সম্পদ, ঐশ্বর্য— এ-সব ভোগ করার জন্য এক-আধবার তাদের থেকে বঞ্চিত হওয়াও ভালো। কিন্তু তোমার আবার কখনো একফোঁটাও অসুখ করেনি ; দুর্ভাগ্য কাকে বলে তা তুমি জানো না, সেই জন্যেই আবারও বলছি, কোন বিপুল আশীর্বাদ তুমি লাভ করছো, তা অনুধাবন করার কোনো ক্ষমতা তোমার নেই।' দামি জাতের ঝলমলে শ্যাম্পেন ঢেলে গেলাশ ভ'রে নিলে সে, তারপর গেলাশটা তুলে ধ'রে বললে, 'বন্ধুগণ, এসো, আমরা কামনা করি, "অচিরেই যেন আমাদের গৃহস্বামী কোনো দুর্ভাগ্যের কবলে পড়েন—তাঁর ঝলমলে জীবনে শিগগিরই যেন কোনো গভীর ছায়াপাত ঘটে !" '

অভ্যাগতদের হাতের গেলাশগুলি নিঃশেষ হ'য়ে গেলো। গৃহকর্তা কেবল সামান্য মাথা হেলিয়ে তাদের কামনাকে স্বীকৃতি দিলে, তারপর আবার তার স্বাভাবিক নির্বেদে তলিয়ে গেলো।

এবার হয়তো কেউ জিগেশ করতে পারেন এই বাণীবিনিময় হচ্ছিলো কোথায়—সে কি পারীতে, লণ্ডনে, হ্বীন-এ, না কি সেন্টপিটার্সবুর্গে ? ইওরোপের কোনো রেস্তোরাঁয় ব'সে, না কি নতুন মহাদেশ আমেরিকার কোনো হোটেলে গিয়ে এরা উৎফুল্লভাবে পানাহার সমাধা করছিলো ? একটা জিনিশ অবশ্য নিশ্চিত আন্দাজ করা যাচ্ছে ; এরা কেউই ফরাশি নয়, কারণ এতাবৎ-কাল কেউই রাজনীতি নিয়ে কোনো কথা উচ্চারণ করেনি।

কুঠুরিটা মস্তও নয়, আবার একেবারে ছোটোও নয়, মাঝারি মাপের—

কিন্তু চমৎকার সাজানো। নীল আর কমলা রঙের জানলার কাচের মধ্য দিয়ে অস্ত সূর্যের শেষ রশ্মিগুলি ঝিলিক দিচ্ছে; তিন দিক থেকে যাতে আলো-বাতাস আসতে পারে, ঝুলঝুলিওলা তেমনি কতগুলো বিশেষ জানলা আছে ঘরটিতে; সন্ধ্যাবাতাসে ঝুলঝুলির ঝুলের ঝালরগুলিতে ঢেউ খেলে যাচ্ছে, আর ঝাড়-লণ্ঠনের ভিতর থেকে হালকা আলোর রেখা বেরিয়ে এসে দিনের শেষ আলোর সঙ্গে মিশে যাচ্ছে। জানলার উপর কাচের পরদার গায়ে কোনো অতিকায় ও আশ্চর্য জগতের নানান দৃশ্য আঁকা—ভাস্কর্যের নানা নিদর্শনেতে সেই অসম্ভব জগতেরই আভাস পাওয়া যায়। রেশমি কাপড়ের ঝালর ঝুলছে উপর থেকে, দেয়ালে পিতল-সব আয়না বসানো; কড়িকাঠ থেকে ঝুলছে একটি টানা পাখা, আর অলংকৃত সেই মশলিনের পাখা ছন্দোময়ভাবে দুলে-দুলে ভ্যাপসা, বুকে-চেপে-বসা, গরমকে হটিয়ে দেবার চেষ্টা করছে।

টেবিলটি আয়তাকার, কালো লাক্ষার তৈরি; কোনো টেবিল-ঢাকনি নেই টেবিলের উপর; পোর্সেলেন আর রুপোর বাসন-কোশনের স্পষ্ট প্রতিভাস দেখা যায় টেবিলের গায়ে, যেন টেবিলটা কোনো মস্ত স্ফটিক দিয়ে তৈরি।

ন্যাপকিনের বদলে প্রত্যেককে নানা রকম ছবি-আঁকা পাৎলা চৌকো-চৌকো কাগজের টুকরো দেয়া হয়েছে। টেবিলের চারপাশে গোল ক'রে বসানো সব কালো মারবেল পাথরের চেয়ার; কুশান-বসানো অন্য-সব লাউন্‌জের চেয়ে এখানকার আবহাওয়ায় এ-সব চেয়ারই বেশি আরামপ্রদ।

শান্ত একদল তরুণী দাঁড়িয়ে আছে আদেশের অপেক্ষায়; কালো খোঁপায় তারা গুঁজেছে লিলি আর চন্দ্রমল্লিকা, সোনার বালা আর চুড়ি প'রে আছে তারা হাতে; নরম তাদের কাজ করার ভঙ্গি, স্মিতমুখে চটপট তারা থালা বা রেকাবি সরিয়ে ফ্যালে একহাতেই, যাতে আর-কেউ পাখা নেড়ে হাওয়া করতে পারে অতিথিদের।

পুরো ভোজসভাটাই যেমনভাবে সমাধা হ'লো তার চেয়ে সুন্দরভাবে আর-কিছুতেই অতিথি-সংবর্ধনা করা যেতে পারে না। সরাইখানার মালিক বোধহয় জানতো যে সে অভিজাত ভোজনরসিকদের আপ্যায়ন করতে যাচ্ছে, তাই খাদ্যতালিকায় নানা সুখাদ্যের সমাবেশ ঘটিয়ে সে আজ এমনকি নিজের পূর্ব-খ্যাতিকেও ম্লান ক'রে গেছে।

প্রথমে সে পরিবেশন করলে চিনির পিঠে, ক্যাভিয়ের, একরকম ডিমের খাদ্য, কড়িংভাজা, শুকনো ফল, আর নিং-পো ঝিনুক। তারপরে ক্ষণিক বিরতি দিয়ে একটু পরে-পরে পরিবেশন করা হ'লো সিদ্ধে-সেদ্ধ হাঁস-পায়রার ডিম, ডিমের

তুষুষে ভাজা শোয়ালো, মিষ্টি চাটনি-মাখানো ডিমি মাছের কলজে, টাটকা জলের ব্যাঙাচি, ভাজা কাঁকড়ার দাঁড়া, চড়ুই পাখির দু-নম্বর পাকস্থলি, রক্ত-ঠাশা ভেড়ার চোখ, নুনে-চোবানো মুলোর সঙ্গে খুবানির শাঁস, সিরাপে-ডোবানো বাঁশের মূল, আর মিষ্টি স্যালাড। সব শেষে পরিবেশন করা হ'লো সিঙাপুরের আনারস, চিনেবাদাম, নুন-মাখা কাজুবাদাম, রসে-ভরা পক্ক আম, কোয়াংতুঙের কমলা। আর সেই সঙ্গে পানীয় ছিলো বিয়ার, শাও-শিংনের সোমরস, আর রাশি-রাশি শ্যাম্পেন। ফল-মিষ্টির পরে ভাত এলো, অতিথিরা ছোটো-ছোটো সরু-সরু কাঠের চামচে বা চপস্টিক দিয়ে তা মুখে তুললো।

ভোজপর্ব সমাধা হ'তে তিন ঘণ্টা লাগলো। অবশেষে খাদ্যসভার শেষ হ'লো ; ইওরোপীয় ভোজসভার মতোই, অপর্যাপ্ত, গোলাপজল পরিবেশন করা কুলকুচো করার জন্য, তারপর পরিচারিকারা ভাপ-ওঠা গরম জলে চোবানো ন্যাপকিন নিয়ে এলো, আর অতিথিরা পরম পরিতোষের সঙ্গে ওই তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছে নিলো।

এর পরে আরাম ক'রে হেলান দিয়ে ব'সে সবাই গীতবাদ্য উপভোগ করতে বসলো। ঘরে ঢুকলো একদল সুন্দরী তরুণী, সুন্দর ক'রে সাজা, পরিচ্ছন্ন ও রুচিমণ্ডিত—এরাই গাইবে আর বাজাবে। তাদের গীতবাদ্যে অবশ্য কোনো সমতান বা সুরলালিত্য ছিলো না, কিছু চিৎকার, স্ফুট-অস্ফুট আওয়াজ, গলাফাটা চ্যাঁচামেচি—তাতে না-আছে ছন্দ, না-বা আছে তাল—এই নাকি তাদের সংগীত। বাদ্যযন্ত্রগুলি এই সমতানেরই যোগ্য সংগত : তার-ছেঁড়া তম্বুরা, বেসুরো বেহালা, সাপের চামড়া-ঢাকা কর্কশ গিটার, তীক্ষ্ণ বাঁশি—কোনোটার থেকেই কোনো সুরেলা আওয়াজ বেরোলো না।

তরুণীদের ঘরে নিয়ে এসেছিলো একটি লোক, সে-ই এই লাস্যময় জলসার নেতা ; গৃহকর্তার হাতে প্রথমেই সে একটি প্রোগ্রাম তুলে দিয়েছিলো, আর গৃহকর্তা তাকে যথেচ্ছ প্রমোদ বিতরণের অনুমতি দিলে প্রথমেই সে তার অর্কেস্ট্রাকে 'দশ ফুলের তোড়া' সুরটি বাজাতে বলেছিলো—হালফিলের ফ্যাশন অনুযায়ী সেটাই তখন সবচেয়ে প্রিয় সুর। সেটা শেষ হ'লে আরো কতগুলি ওই জাতেরই হালফ্যাশানের গান শোনালে তারা, অবশেষে তাদের জলসা শেষ হ'লে—আগেই তাদের প্রচুর অর্থ দেয়া হয়েছিলো—শ্রোতৃগণ সোৎসাহে করতালি দিয়ে বিদায় জানালে তাদের, আর তারা, অন্য শ্রোতাদের কাছ থেকে আরো হাততালি পাবার আশায়, একে-একে প্রস্থান করলো।

জলসা শেষ হ'য়ে যেতেই আসন ছেড়ে উঠলো অতিথিরা, তারপর

পরস্পরের মধ্যে কিছু ভদ্রতাবিনিময়ের পর আরেকটা টেবিলে গিয়ে বসলো। আমন্ত্রণ ঢাকনি-বসানো পেয়ালা ছিলো এই টেবিলে—প্রত্যেকটি পেয়ালাতেই বোধিসত্বের প্রতিচ্ছবি আঁকা—তাঁর সেই কিংবদন্তির চাকার উপর দাঁড়িয়ে আছেন এই বৌদ্ধ ভিক্ষু। পেয়ালা-ভর্তি ফোটানো জল; এবার প্রত্যেককেই চা-পাতা দেয়া হ'লো; যে-যার পেয়ালায় চা-পাতা দিয়ে, চিনি ছাড়াই, সেই চায়ের জল ঢোঁকে-ঢোঁকে গলাধঃকরণ ক'রে নিলে। এ কি যে-সে চা! সরাসরি গিব, গিব অ্যাণ্ড কম্পানির গুদোম থেকে আনানো—ভেজাল মেশানো চা—এ-কথা বলার কোনো সুযোগই নেই; চায়ের রাজা বলা যায় একে; বিশুদ্ধ, বহির্প্রভাবহীন এই চা-পাতা—সত্তকোটা ছুটি পাতা আর একটি কুঁড়ি তুলে নেয় দস্তানা-পরা বালক-ভৃত্যেরা, আর একটি কুঁড়ি ফুটলেই সে-গাছ ম'রে যায় ব'লে এই চা অতি দুর্লভ সামগ্রী ব'লে গণ্য হয়।

তার সুগন্ধ আর স্বাদ চেখে দেখলে যে-কোনো লোকই অভিভূত হ'য়ে যেতো, কিন্তু এরা সবাই সমঝদার ভোক্তা, আস্তে এক-একটা চুমুক দেয়, সর্বেন্দ্রিয় দিয়ে স্বাদ নেয় তার, আস্তে ঢোঁক গেলে, তারপর আবার একটা চুমুক দেয়। এরা সবাই সম্ভ্রান্তবংশের পুরুষ, আভিজাত্যমণ্ডিত; পরনে মূল্যবান 'হন-শাওল' বা পাৎলা শার্ট, 'মা-কোয়ালা' বা ছোট্ট শিরো-বসন, 'হাওলট' বা পাশে-বোতাম-লাগানো লম্বা ঢোলা কামিজ। পায়ে হলদে চটি, আর পাৎলা মোজা, মোজার উপর থেকে উঠে গেছে রেশমি আঁটো পাজামা, কোমরের কাছে জরির কাজ-করা রেশমি কোমরবন্ধ দিয়ে বাঁধা; আর তা থেকে ঝুলছে সুন্দর কাজ-করা নানাবর্ণ ঝালর; বুকের উপর তারা লাগিয়েছে সূক্ষ্ম কাজ-করা রেশমের উদর-বসন।

এই বর্ণনার পরে এই কথা বলা নিশ্চয়ই বাহুল্য যে এরা সেই দেশেরই বাসিন্দে যেখানে প্রতি বছর চা-বাগান থেকে সুগন্ধি পাতা তোলার উৎসব হয়। তাদের কাছে ভোজসভার খাদ্য-তালিকায় হাঙরের কানকো, তিমিমাছের কলজে, ভাজা ফড়িং বা টাটকা-জলের ব্যাঙাচি কোনো নতুন সুখাদ্য নয়, এমনকি যে-রুচিসম্মত আভিজাত্যের সঙ্গে এ-সব পরিবেশন করা হয়েছে, তাও এদের কাছে নতুন-কিছু নয়। কিন্তু খাদ্যের রেকাবি বা ভোজসভার কোনো উপকরণেই যারা এতক্ষণ কোনো বিস্ময় প্রকাশ করেনি, গৃহস্বামী যখন বললো যে তাদের কাছে তার কিছু বক্তব্য আছে, তারাই তখন অতিমাত্রায় বিস্মিত ও উচ্চকিত হ'য়ে উঠলো।

পেয়ালাগুলো আবার চায়ে ভরা হ'লো। নিজের পেয়ালাটা মুখে তুলে

টেবিলে কনুই ঠেকিয়ে, শূন্যের দিকে তাকিয়ে গৃহকর্তা তার বক্তব্য শুরু করলে: 'আমার কথা শুনে তোমরা হেসো না, কিন্তু এবার আমি আমার জীবনে একটা নতুন উপাদান আনতে চাচ্ছি। তার ফল ভালো হবে কি মন্দ হবে জানি না, শুধু ভবিষ্যৎই এ-বিষয়ে কিছু বলতে পারে। সান্নিধ্য দিয়ে তোমরা আজকের যে-সান্ধ্যভোজকে অনুগৃহীত করেছো, কুমার হিশেবে এটাই আমার শেষ আমন্ত্রণ। আর পক্ষকালের মধ্যেই আমি বিয়ে করবো!'

'বিবাহিত আর সুখী! নরকুলের সবচেয়ে সুখী ব্যক্তি!' অভ্যাগতদের মধ্যে যে-আশাবাদী ছিলো, সে ব'লে উঠলো, 'ভাখো, বন্ধু, সমস্ত লক্ষণই তোমার সৌভাগ্য ইঙ্গিত করছে,' আঙুল তুলে দেখালো সে কেমন ক'রে ঝাড়লণ্ঠনের পাণ্ডুর আলোয় সব কি-রকম মোলায়েম দেখাচ্ছে, দেখালো বাঁকা জানলার কুলুঙ্গিতে ম্যাগপাইরা কেমন কিচির-মিচির করছে, আর কেমন লম্বমানভাবে চা-পাতাগুলো ভাসছে চায়ের পেয়ালায়।

পরক্ষণেই সমস্বরে অভিনন্দন জানালো সবাই; গৃহকর্তা কিন্তু অবিচল ও শান্তভাবে সব অভিনন্দন গ্রহণ করলে। এই কথাটা তার মাথায় ঢুকলো না যে মহিলাটির পরিচয় দেয়া উচিত তার, আর অন্য-কেউ তার সেই আনমনা ভাব ভাঙাবার সাহস পেলে না। কেবল দার্শনিক ব্যক্তিটিই এদের এই অভিনন্দনের ঐকতানে যোগ দেয়নি; সে চুপচাপ ব'সে ছিলো দু-হাত ভাঁজ ক'রে; চোখ দুটি তার আধবোজা, ঠোঁটের ফাঁকে ব্যঙ্গের স্মিত ছোপ; যেন বিনামূল্যে এ-রকম অভিনন্দন জ্ঞাপনের বিরুদ্ধে তার কোনো বক্তব্য আছে।

গৃহকর্তা তার দিকে তাকালো একটু, তারপর নিজের আসন ছেড়ে উঠে তার দিকে এগোতে-এগোতে বললে, 'তোমার কি মনে হয় আমার বয়েস খুব বেশি? বিয়ে-করা উচিত নয়?' এতক্ষণ তার কথায় কোনো আবেগের ছাপ দেখা যায়নি, কিন্তু এবার তার গলা একটু কেঁপে গেলো।

'না।'

'তাহ'লে কি বিয়ে-করার পক্ষে খুব কম বয়েস?'

'না।'

'কোনো ভুল করছি নাকি তাহ'লে?'

'সম্ভবত করছো।'

'জানো, আমাকে সুখী করার মতো সব গুণই মেয়েটির আছে?'

'খুব সত্যি।'

'তাহ'লে মুশকিলটা কিসের ?'

'মুশকিলটা তোমার নিজের মধ্যে !'

'আমি কি কোনো দিনই সুখী হবো না ?'

'অসুখী হওয়া কাকে বলে তা না-জানা পর্যন্ত কোনোদিনই হবে না।'

'কিন্তু আমি যে দুর্ভাগ্যের চৌহদ্দির বাইরে—'

'তাহ'লে তোমার আর-কোনো উদ্ধার নেই।'

'বাজে কথা! সব বাজে কথা!' এদের মধ্যে সব চেয়ে যার বয়েস কম, সে তীব্র স্বরে প্রতিবাদ ক'রে উঠলো। 'ওই দার্শনিকের কথাগুলি সব তত্ত্ব-কথার গাঁড়াকল! ওর মাথায় সারাক্ষণ সব তত্ত্বকথা ঘুরে বেড়াচ্ছে—আর কী সব তত্ত্বকথা—সব বাজে বস্তাপচা! বন্ধু হে, বিয়েটা ক'রেই ফ্যালো; যত তাড়াতাড়ি পারো বিয়ে করো। আমি নিজেই করতুম অ্যাদ্দিনে, কিন্তু একবার একজনের কাছে একটা প্রতিজ্ঞা ক'রে ফেলেছিলুম, তাতেই আটকাচ্ছে! আমরা তোমার স্বাস্থ্য পান করবো। তোমার সুখ-সৌভাগ্য যেন কোনোদিনই না-ফুরোয়!'

'আমি কেবল আমার আশাটাই ব্যক্ত করতে পারি,' দার্শনিকের প্রত্যুত্তর এলো, 'যেন কোনো দুঃখকষ্টের মধ্য দিয়ে অবশেষে ওর কাছে সুখ আসে।'

গৃহকর্তার স্বাস্থ্য পান করলো তারা; তারপর অতিথিরা আসন ছেড়ে উঠে ঘুষি মারার ভঙ্গিতে হাত মুঠো ক'রে মুষ্টিবদ্ধ হাত কপালে তুলে মাথা নুইয়ে অভিবাদন ক'রে বিদায় নিলে।

কুঠুরিটির বর্ণনা, অদ্ভুত ভোজ্যতালিকা, আর অতিথিদের বসনভূষণ ও বিদায়গ্রহণের ভঙ্গি থেকে এটা নিশ্চয়ই চট ক'রে বোঝা যাবে যে এখানে যে-চৈনিকদের কথা বলা হচ্ছে, তারা ঠিক সাধারণ সেই সব চৈনিক নয়, কাগজের পরদা বা পুরোনো পোর্সেলেনের বাসন-কোশন থেকে যারা হঠাৎ বেরিয়ে আসতে পারে। বরং এরা আধুনিক চিন-সাম্রাজ্যের লোক—ইওরোপের সান্নিধ্যে এসে শিক্ষা, ভ্রমণ ও ভাব-বিনিময়ের মধ্য দিয়ে যারা প্রতীচীর সভ্যতার নানা আদবকায়দা গ্রহণ ক'রে নিয়েছে। আসলে কোয়াংতুঙের মুক্তোনদীর এক প্রমোদতরীর সেলুনে বসেছিলো তারা এতক্ষণ—বজরাটার মালিক বিত্তশালী কিন-ফো; দার্শনিক ওয়াং-এর সঙ্গে হরিহরভাব—অচ্ছেদ্য তাদের বন্ধুতা; এতক্ষণ তারা দুজনে তাদের ছেলেবেলার চারবন্ধুকে আপ্যায়ন করছিলো; তাদের একজন হ'লো পাও-শেন, চতুর্থ শ্রেণীর এক মান্দারিন, তার গাঢ়-নীল বল থেকেই তা বোঝা যায়; আরেকজনের নাম ইন-পাং,

অ্যাপোথেকারি স্ট্রিটের এক ধনী রেশম-বিক্রেতা সে; তৃতীয়জনের নাম টিম, স্ফূর্তিবাজ, হাসিখুশি, আমোদ-প্রমোদই তার সর্বস্ব; আর চতুর্থজনের নাম হো-ওয়াল—কবি ও সাহিত্যিক।

এই ভাবেই চতুর্থ চাঁদের সপ্তবিংশতি দিবসের পাঁচ প্রহরের প্রথমটি কেটে গেলো, আর সন্ধ্যা চ'লে পড়লো দ্বিতীয় প্রহরে—রোমান্টিক চিনে রাত্রির দ্বিতীয় যামে।

২

কে, কী, কবে, কেন, কোথায়

কোয়াংতুঙে এই বিদায়ভোজের ব্যবস্থা করার বিশেষ কারণ ছিলো কিন-ফোর। তার বাল্য ও কৈশোর কেটেছিলো কুয়াংতুঙের রাজধানীতে, আর সে ছিলো ধনী আর হাত-খোলা, ফলে তার বন্ধুর সংখ্যা নেহাৎ কম ছিলো না। তার ইচ্ছে ছিলো চ'লে যাবার আগে বন্ধুদের সে শুভেচ্ছা জানায়। কিন্তু জীবন তার বন্ধুদের ছত্রভঙ্গ ক'রে দিয়েছে, বিভিন্ন জায়গায় চ'লে গেছে তারা জীবিকার সন্ধানে; থাকার মধ্যে ছিলো কেবল এই চার জন, যারা তার এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করলে। কিনফো-র বাড়ি আসলে শাংহাই, কোয়াংতুঙে সে এসেছিলো হাওয়া বদলাতে—মাত্র কয়েক দিনের জন্য, সেই রাতেই স্টিমবোটে ক'রে তার বেরিয়ে পড়ার কথা—এই স্টিমবোট সব বড়ো-বড়ো বন্দরেই থামে—কয়েক দিন ঘুরে অবশেষে নিজের আস্তানায় সে ফিরে যাবে, এই ছিলো তার পরিকল্পনা।

স্বভাবতই দার্শনিক ওয়াং-ও তার সঙ্গী হয়েছিলো; তাকে বলা যায় কিন-ফোর মাস্টারমশাই, কচিৎ সে তার ছাত্রকে একা রেখে বেরোয়। টিম যখন তাকে 'তত্ত্বকথার গ্যাঁড়াকল' বলেছিলো তখন সে বলতে গেলে চাঁদমারিতেই তীর বিঁধিয়ে দিয়েছিলো; কারণ সুযোগ পেলে ওয়াং কিছুতেই পণ্ডিতিয়ানা দেখাতে ছাড়ে না—বড়ো-বড়ো আপ্তবাক্য আওড়ায় সর্বদা, যদিও এ-কথাটা বলা ভালো যে শান্ত গম্ভীর ও বিমনা কিন-ফোর উপর তার প্রভাব দেখা যায় যৎসামান্যই।

কিন-ফো অত্যন্ত সুপুরুষ; উত্তরের চিনে সে, তাতারদের সঙ্গে কোনোদিনই তাদের রক্ত মিশে যায়নি। তার বাবা-মার ধমনীতে এক ফোঁটাও তাতার

রকম ছিলো না, সেটা দক্ষিণে একেবারেই কল্পনাতীত—দক্ষিণের লোকেরা ধনী-গরিব নির্বিশেষে মানুষের সঙ্গে মিশে দো-আঁশলা হ'য়ে গিয়েছিলো। কিন-ফো লম্বা ও সুগঠিত, গাত্রবর্ণ পীত নয়, বরং গৌর; চোখের উপর ভুরুযুগল যেন সমান্তরালভাবে বসানো, যদিও কপালের কাছে গিয়ে একটু উপর দিকে তাকিয়েছে, খাড়া নাক, অর্থাৎ তাকে দেখে প্রাচী ও প্রতীচীর সবাই সুপুরুষ বলতে বাধ্য হবে। মাথাটি তার ঠিক একেবারে ঘাড়ের উপর বসানো—গ্রীবা যাকে বলে তা যেন প্রায় নেই, আর এটাই বোঝায় যে সে আসলে চৈনিক. চকচকে কালো চুলের বেণী সাপের মতো প'ড়ে আছে তার পিঠে। আধাবৃত্তের আকারে সূক্ষ্ম গোঁফের রেখা দেখা যায় তার ঠোঁটের উপর, যেন কোনো স্বর-লিপির মধ্যে শব্দের ইঙ্গিত। আঙুলে বড়ো-বড়ো নখ, প্রায় আধ ইঞ্চি বড়ো হবে: তাকে যে নিজের হাতে কোনো কাজই করতে হয় না, নখগুলো আসলে তারই সাক্ষী, যদিও তার চেহারা দেখেই এটা বুঝতে অসুবিধে হয় না যে সে যাকে বলে মস্ত বড়োলোক।

তার জন্ম হয়েছিলো পিকিং-এ। পিকিং-এ জন্ম হ'লে গর্বের আর সীমা থাকে না কারু, লোকে বলে যে 'উপর থেকে' এসেছে। ছ-বছর বয়েস পর্যন্ত পিকিং-এই ছিলো কিন ফো, তারপর তাদের পরিবার শাংহাই চ'লে আসে।

তার বাবা চুং হৌ উত্তরের অভিজাতদের একজন, এবং স্বদেশীদের অনেকের মতোই বণিকবুদ্ধিতে তাঁর প্রবণতা ও ক্ষমতা ছিলো প্রচুর। জীবনের প্রথম ভাগে তাঁর দেশের এমন-কোনো মূল্যবান সামগ্রী ছিলো না, যা তাঁর ব্যাবসার অন্তর্ভুক্ত ছিলো না: সোচাচৌ-এর কাগজ, সু-চুর রেশম, ফরমোজার চিনি, হান-কৌ আর ফু-চৌ-এর চা, হোনান-এর লোহা, ইয়েনান-এর তামা আর পিতল—সব ছিলো তাঁর বাণিজ্যের সামগ্রী। তাঁর প্রধান কারখানা বা 'কং' ছিলো শাংহাইতে, কিন্তু নানকিং, তিয়েনসিন, মাকাও আর হংকং-এও তাঁর শাখা-প্রতিষ্ঠান ছিলো। ইংরেজদের জাহাজে ক'রে তাঁর মাল সরবরাহ করা হ'তো, লিয়ঁতে রেশমের আর কলকাতায় আফিমের দর কত সে-খবর তাঁর কাছে রোজ তারবার্তায় যেতো, অন্যান্য চিনে বণিকের সঙ্গে তাঁর নানা দিক থেকে তফাৎ ছিলো, মান্দারিনের প্রভাব বা সরকারের চাপ এড়িয়ে তিনি বাষ্প ও বিদ্যুতের সাহায্য গ্রহণ করতে কসুর করেননি—কারণ তাঁর মত হয়েছিলো এ-কালে বাষ্প আর বিদ্যুৎই প্রগতির বাহক।

চুং-হৌ-এর ব্যাবসা এত ভালো চলেছিলো যে কেবল যে চিন সাম্রাজ্যের মধ্যেই তা সীমিত ছিলো, তা নয়; শাংহাই, মাকাও আর হংকং-এর কম্পানি

ইংরেজ, পর্তুগিজ ও মার্কিন প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে তাঁর লেনদেন চলতো—আর যখন ছেলে কিন-কোর জন্ম হ'লো, তখন তিনি ৪০০,০০০ ডলারের মালিক। পরে আমেরিকায় কুলি চালান দেবার ভার নিয়ে এই অর্থকে তিনি তিন-ডবল ক'রে তুলেছিলেন।

এ-তথ্যটা তর্কাতীত যে চিনের লোকসংখ্যার কোনো মাথামুণ্ডু নেই—এত বড়ো দেশ, কিন্তু তাতেও কুলোয় না, ৩৬০,০০০,০০০-এর চেয়ে কম হবে না লোকসংখ্যা: সারা জগতের জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ। যদিও জগতের কাছে কোনো চিনের কামনা অতি সামান্ত, তবু তাকে তো বেঁচে থাকতে হবে, আর চিনদেশে প্রচুর ধান ও অন্তান্ত নানা শস্ত ফললেও তা লোকের চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল, বিশাল জনসমষ্টিকে ফালতু ব'লে মনে হয়; আর এই অতিরিক্ত লোকজনের সংখ্যা কমাবার উপায় বের করেছিলো ইংরেজ আর ফরাশিরা—চিনের প্রাচীর পেরিয়ে সারা জগতে তাদের ছড়িয়ে দেবার 'নৈতিক দায়িত্ব' নিয়েছিলো যেন তারা। দেশত্যাগের হিড়িক যখন পূর্ণবেগে এলো সব চেয়ে বেশি লোক গিয়েছিলো উত্তর আমেরিকায়, বিশেষ ক'রে ক্যালিফরনিয়া অঞ্চলে, আর এত লোক সেখানে গিয়ে হাজির হয়েছিলো যে আমেরিকার কংগ্রেস এই 'পীত মড়কে'র হাত থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্ত কতগুলি বিধিনিষেধ আরোপ করতে বাধ্য হয়েছিলো; কিন্তু শিগগিরই এই তথ্যটি আবিষ্কার হ'লো যে ৫০,০০০,০০০ লোকের মহাপ্রস্থানে চিন সাম্রাজ্যের যদিও বিশেষ-কিছু এসে যায় না, কিন্তু আমেরিকার মাটিতে ওই মোঙ্গোল বসতি শ্বেতাঙ্গদের রক্ত ও গাত্রবর্ণের বিশুদ্ধতা ধ্বংস ক'রে দেবে।

কিন্তু তবু হাজার বিধিনিষেধ সত্ত্বেও চৈনিক অনুপ্রবেশ রোধ করা গেলো না। সব কাজেই কুলি লাগে, আর চৈনিক কুলি অল্পেতেই খুশি: রোজ একমুঠো ভাত, এক পেয়ালা চা আর খানিকটে তামাক পেলেই তারা তুষ্ট; তাছাড়া ক্যালিফরনিয়া, অরেগন, ভারজিনিয়া, সল্ট-লেকে তারা খুব কাজে এলো, শুধু তাই নয় মজুরদের পারিশ্রমিকও যথেষ্ট কমিয়ে দিলো। তাদের যাতায়াতের সুবিধের জন্ত কম্পানি বসলো, চিনে বসলো পাঁচটা, আর সান ফ্রান্সিসকোয় একটা। সেই সঙ্গে আরেকটা—তিং-তোং নামে একটি ছোটো প্রতিষ্ঠানেরও জন্ম হ'লো, তাদের দায়িত্ব হ'লো এদের আবার ফিরিয়ে আনা।

এই তিং-তোং না-হ'লে কিছুতেই চলতো না। চিনেরা যদিও আমেরিকায় ভাগ্যান্বেষণে যেতে এক পায়ে খাড়া ছিলো, তবু এটা তারা চাইতো যে দৈবাৎ এই বিদেশ-বিভুঁয়ে ম'রে গেলে তাদের মৃতদেহ যেন স্বদেশে এনে সৎকার করা

হয়। চুক্তির মধ্যে এই কথাটা না-থাকলে কেউই দেশ ছেড়ে এক পা বাড়াতে চাইতো না; আর তাই তিং-তোং নামে মৃত্যু-প্রতিষ্ঠানের জন্ম হ'লো। যাদের কাজ ছিলো ক্যালিফরনিয়া থেকে রাশি-রাশি মৃতদেহ এনে শাংহাই, হংকং আর তিয়েনসিনে পৌঁছে দেয়া।

এই নতুন প্রতিষ্ঠানের অর্থলাভের দিকটা প্রথম যাদের চোখে পড়েছিলো তাদের মধ্যে উৎসাহী চু-হো একজন। বিপুল উদ্যমে এই ব্যাবসায় যোগ দিয়েছিলেন তিনি: ১৮৬৭ সালে যখন তাঁর মৃত্যু হ'লো তখন তিনি কুয়াং-তুং-এর তিং-তোং কম্পানিরই কেবল ডিরেক্টার নন, সান ফ্রানসিসকোর তিং-তোং-এরও একজন পরিচালক হ'য়ে বসেছেন।

চুং-হোয়ের ব্যাবসাবুদ্ধি এত প্রখর ছিলো যে তাঁর মৃত্যুর পর কিন-ফো আবিষ্কার করলে যে ক্যালিফরনিয়ার সেনট্রাল ব্যাংকে তার নামে ৮০০,০০০ ডলার খাটছে। কিন-ফোর ব্যাবসাবুদ্ধি এটুকু ছিলো যে এই টাকা ছোঁবার চেষ্টা সে করেনি। তার বয়স তখন মাত্র উনিশ, মা-বাবা কেউই বেঁচে নেই — শুধু যে একেবারে একা হ'য়ে পড়তো তা নয়, ব'খেও যেতে হয়তো, যদি না তার অন্তরঙ্গ বন্ধু আর গুরু ওয়াং থাকতো। শাংহাইয়ে তাদের বাড়িতে সতেরো বছর ধ'রে বাস করেছে ওয়াং, পিতাপুত্র দুজনেরই বন্ধু ও মন্ত্রণাদাতা সে, কোত্থেকে যে তার অভ্যুদয়, আর তার পূর্ব পরিচয়ই বা কী, তা বোধহয় চুং-হো আর কিন-ফোই কেবল বলতে পারতো, কিন্তু এমনকি তারাও এ-বিষয়ে কদাচ কোনো টুঁ শব্দ করেনি। বোধকরি সেই জন্যেই পরদা তুলে তার অতীতের দিকে উঁকি দেয়া ভালো হবে।

চিনদেশে এটা সবাই ধ'রে নেয় যে কোনো পুনরুত্থিত আত্মা বহু সহস্র লোকের হৃৎপিণ্ডে অনেক বছর ধ'রে বেঁচে থাকে। নামজাদা মিং রাজবংশ তিনশো বছর ধ'রে নানা আন্দোলনের মধ্যেও টিকে ছিলো, অবশেষে সপ্তদশ শতকে — ১৬৪৪ সালে — রাজবংশের তদানীন্তন প্রতিভূ যখন আবিষ্কার করলেন যে তিনি শত্রুপক্ষের সঙ্গে একা এঁটে-ওঠার মতো বল ধরেন না, তখন তাতার সুলতানের সাহায্য প্রার্থনা করেন। তাতার সুলতান সুযোগ পেয়ে তক্ষুনি তাঁর সাহায্যে এগিয়ে এলেন, বিপ্লব প্রশমিত হ'লো, কিন্তু সেই দুর্বল মিং রাজকে সরিয়ে দিয়ে এই সুযোগে তিনি স্বীয় পুত্র চুন-চিকে চিন সম্রাটের সিংহাসনে বসিয়ে দিলেন।

সেই থেকে বহিরাগতদের হাতেই সব ক্ষমতা; মাঞ্চুরাজেরাই তারপর থেকে চৈনিক সিংহাসনে বসেছেন একের পর এক। ধীরে-ধীরে নিম্নশ্রেণীর

লোকের মধ্যে দুই জাতির রক্ত মিশে গেলো, বিশুদ্ধ চৈনিক রক্তের স্থান নিলো দো-আঁশলা নতুন এক জাতি; কিন্তু উত্তরের অভিজাত সম্প্রদায়ের মধ্যে চৈনিক আর তাতারদের কিছুতেই আর মিশ্রণ ঘটলো না—বরং আরো স্পষ্ট ও দৃঢ় হ'লো বিভেদ; এমনকি অদ্যাবধি কোনো-কোনো প্রদেশে অপসৃত মিং রাজবংশের অনুগত পরিবার দেখা যাবে।

আর এদেরই একজন ছিলেন কিন-ফোর বাবা। বংশের ঐতিহ্য সম্বন্ধে অত্যন্ত সচেতন ছিলেন তিনি; তাতারশক্তির বিরুদ্ধে কোনো বিদ্রোহ উত্থিত হ'লে তিনি নিশ্চয়ই কায়মনোবাক্যে তাকে সমর্থন করতেন। কিন-ফোও বাবার রাজনৈতিক মতবাদে বিশ্বাসী ছিলো।

১৮৬০ সালে সম্রাট ছিলেন হসিয়েনফোং; ফ্রান্স আর ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন তিনি; সেই বছরই ২৫শে অক্টোবর পিকিং চুক্তির দ্বারা সেই যুদ্ধের অবসান হয়। কিন্তু তার আগে পর্যন্ত তিনশো বছর ধ'রে শাসককুলকে সব সময়ই প্রচণ্ড অভ্যুত্থানের ভয়ে-ভয়ে কাটাতে হয়েছে। চ্যাং-মো বা তাই-পিং বিদ্রোহীরা ১৮৫৩ সালে নানকিং দখল করেছিলো, তারও দু-বছর পর অধিকার করেছিলো শাংহাই। হসিয়েনফোং-এর মৃত্যুর পর তাঁর ৬-বছরের পুত্র প্রথমেই তাই-পিং বিদ্রোহীদের সম্মুখীন হয়েছিলেন; বড়োলাট লি আর ইংরেজ সেনাপতি কর্নেল গরডনের সাহায্য ছাড়া যুবরাজ কং সিংহাসনে আরোহণ করতে পারতেন কিনা সন্দেহ। তাতারদের জাতশত্রু তাই-পিংদের উদ্দেশ্য ছিলো হসিং রাজবংশকে উৎপাটিত ক'রে মিং রাজবংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। অত্যন্ত সবল ছিলো তাই-পিঙেরা; চারটে বাহিনী ছিলো তাদের; প্রথম বাহিনী ছিলো কালো নিশেনের দল: যাবতীয় গুপ্তহত্যার ভার ছিলো তাদের উপর; দ্বিতীয় বাহিনীকে বলা হ'তো লালঝাণ্ডা বাহিনী: বিষয়-সম্পত্তিতে আগুন লাগিয়ে ছারখার ক'রে ফেলার দায়িত্ব নিয়েছিলো তারা; পীত পতাকার বাহিনীর কাজ ছিলো লুঠতরাজ ও দস্যুবৃত্তি; আর চতুর্থ বাহিনীর পতাকা ছিলো শ্বেতবর্ণ, অন্য তিনটে বাহিনীর যথাযোগ্য পরিচালনার দায়িত্ব ছিলো তাদের। কিয়াং-সু প্রদেশে তাদের সামরিক প্রস্তুতি চলতো, শাংহাইয়ের নিকটবর্তী সু-চু আর কিয়াহিং ছিলো বিদ্রোহীদের দখলে; তুমুল যুদ্ধের পরেই সম্রাটের ফৌজ তা পুনরুদ্ধার করতে পারে। ১৮৬০ সালের ১৮ আগস্ট এমনকি শাংহাই স্বয়ং আক্রান্ত হয়; ঠিক সেই মুহূর্তে আরো উত্তরে সম্মিলিত ইঙ্গ-ফরাশি বাহিনী জেনারেল গ্রান্ট ও মঁতোবাঁর নেতৃত্বে পাই-হো নদীর কেল্লায় ঝটিকা আক্রমণ চালিয়েছিলো। চুং-হো তখন শাংহাই থাকতেন;

ফৈসিক ইঞ্জিনিয়াররা স্থ-চৌ নদীর উপর যে-চমৎকার সেতু নির্মাণ করেছিলো তার পাশেই ছিলো তাঁর বাড়ি। বলাই বাহুল্য, বিদ্রোহীদের প্রতি গোপন মমতা ছিলো তাঁর।

১৮ তারিখে সন্ধেবেলায় ঠিক যখন বিদ্রোহীরা শহর থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে, চুং-হৌ-র বাড়ির দরজা সশব্দে খুলে যায় এবং একটি উদ্‌ভ্রান্ত পলাতক এসে গৃহস্বামীর পায়ে আছড়ে পড়ে। অস্ত্রশস্ত্র কিছুই নেই তার কাছে; চুং-হৌ যদি তাকে সম্রাটের বাহিনীর কাছে সমর্পণ করতেন, তাহ'লে তক্ষুনি তার প্রাণদণ্ড হ'তো। কিন্তু কোনো তাই-পিংকে বিশ্বাসঘাতকতা ক'রে ধরিয়ে দেবার কথা চুং-হৌ স্বপ্নেও ভাবতে পারতেন না। তাড়াতাড়ি দরজা বন্ধ ক'রে ভূলুণ্ঠিত আগন্তুকের দিকে ফিরে তাকিয়ে তিনি বলেছিলেন, 'তোমাকে আমি মোটেই চিনি না। কোত্থেকে এসেছো বা এতকাল কী করতে, সে-সবও আমি জানতে চাই না। আমার অতিথি ব'লে গণ্য করতে পারো তুমি নিজেকে। এখানে তোমার কোনো ভয় নেই।'

পলাতক ব্যক্তিটি তখন সম্পূর্ণ ভেঙে পড়েছে, যেন একবিন্দু শক্তি নেই তার দেহে। ভাঙা-ভাঙা কথায় সে তার কৃতজ্ঞতা বর্ষণ শুরু করেছিলো, কিন্তু চুং-হৌ তাকে বাধা দিয়ে জিগেশ করেছিলেন, 'কী নাম তোমার?'

'ওয়াং,' উত্তর এলো।

'বাস, তাহ'লেই হবে! আর-কিছু আমি জানতে চাই না।'

কেউ যদি জানতে পারতো যে চুং হৌ এভাবে ওয়াং-এর প্রাণ বাঁচিয়েছেন তাহ'লে তাঁরও কোনো রেহাই ছিলো না। চুং হৌ এ-কথা জানতেন, কিন্তু তবু ওয়াংকে বাড়ি থেকে বের ক'রে দিলেন না।

এর পর কিছুকালের মধ্যেই বিপ্লবীরা নির্মূল হ'য়ে গেলো, ১৮৬৪ সালে সম্রাটের বাহিনী নানকিং অবরোধ করলে তাই পিং সম্রাট বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছিলেন।

সেই-যে ওয়াং তার আশ্রয়দাতার বাড়িতে থেকে গেলো, তারপর আর কোথাও গেলো না, আর কেউ তাকে তার অতীত জীবন নিয়েও কোনো প্রশ্ন করলো না। শোনা যায়, বিদ্রোহীরা নাকি অত্যন্ত নৃশংস ছিলো, নিষ্ঠুরতায় তাদের কোনো জুড়ি ছিলো না, তাই ওয়াং যে কোন পতাকার দলের লোক এটা স্পষ্ট ক'রে না-জানাই বোধকরি সবচেয়ে ভালো—তাহ'লে অন্তত এই আশা পোষণ করা যেতে পারে যে সে ছিলো শ্বেতপতাকার দলের পরিচালক মন্ত্রীর অনুচর।

তা সত্য যা-ই হোক না কেন, এটা ঠিক যে এ-রকম ব্যক্তিতে আশ্রয় পাওয়াটা ওয়াং-এর সৌভাগ্যের নজির, আর সেও উদ্ধারকর্তাদের বদান্যতার যথা-সম্ভব প্রতিদান দেবার চেষ্টা করেছে সবসময়। বিশ্বস্ত, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী—বন্ধু হিশেবে তার তুলনা হয় না, তাই পিতার মৃত্যুর পর কিন-ফো তাকে নিজের অন্তরঙ্গ বন্ধু ব'লেই গ্রহণ করেছে। পঞ্চাশ বছর বয়সী এই নীতিবিদ ও কাঠের দাঁড়ের চশমা-পরা দার্শনিকের মধ্যে অতীতের তাই-পিংকে খুঁজে পাওয়া দুষ্কর: সৈনিকসুলভ একজোড়া গোঁফ আছে তার, হালকা রঙের ঢোলা আলখাল্লা পরনে, ভাবেভঙ্গিতে কেমন ঢিলেঢালা গোছের, মাথায় সূক্ষ্মকাজ করা কাপড়ের টুপি; সব মিলিয়ে তাকে পণ্ডিত ব'লে মান্য না-ক'রে যেন উপায় নেই—চিনে বর্ণমালার আশি হাজার অক্ষরই যেন তার নখদর্পণে, তাকে দেখলে এটাই মনে হয়; পিকিং-এর যে-প্রধান ফটক দিয়ে 'স্বর্গনন্দন'দের যাবার অধিকার, সেও যেন তাদেরই একজন। হয়তো চুং-ওৌর শান্তশিষ্ট ও সদয় সান্নিধ্যে এসে সেই কঠোর বিদ্রোহীটি একেবারে হারিয়ে গেছে, তার বদলে জন্ম নিয়েছে অতীব শান্ত, ভব্য, ধীরস্থির একজন প্রাজ্ঞ দার্শনিক।

সেদিন সন্ধেবেলায় ভোজসভা শেষ হ'য়ে গেলে কিন-ফো আর ওয়াং দুজনে মিলে শাংহাইতে ফিরে যাবার স্টিমারে ওঠবার জন্যে জেটির দিকে এগিয়ে গেলো। কিন-ফোকে বড্ড চুপচাপ ও বিমনা দেখাচ্ছে; ওয়াং আশপাশে উপরে-নিচে তাকিয়ে দেখছে, কখনো তার চোখে জ্যোৎস্না ঢেলে দিচ্ছে চাঁদের টুকরো, কখনো তারা ঝিকিয়ে উঠছে তার চোখের তারায়; চিরশুভ্রতার তোরণ পেরিয়ে এলো দুজনে চুপচাপ, পেরিয়ে এলো চির আনন্দের তোরণ, আস্তে চ'লে এলো পাঁচশো দেবতার প্যাগোডার ছায়া ঢাকা পথ দিয়ে।

'পার্‌মা'টি তখন ইঞ্জিন গরম ক'রে নিচ্ছে—রওনা হবে এক্ষুনি, চোঙ দিয়ে কালো ধোঁয়া বেরোচ্ছে গলগল ক'রে। কিন-ফো আর ওয়াং তাদের জন্য নির্দিষ্ট-করা কেবিনে গিয়ে ঢুকলো—দুজনের জন্য দুটি আলাদা কেবিন—তক্ষুনি পার্ল রিভারের জল কেটে চলতে শুরু করলো স্টিমার, রোজ যার চঞ্চল স্রোতে জল্লাদের কুঠারে প্রাণহারানো লোকেদের মড়া ভেসে যায়। ফরাশিদের কামানের গোলায় ভেঙে-যাওয়া উপকূল পেরিয়ে এলো স্টিমার, চট ক'রে পেরিয়ে এলো নব তলের প্যাগোডা, পেরিয়ে গেলো জারডিন পয়েন্ট; ছোটো-ছোটো দ্বীপ আর তীরের মস্ত জাহাজগুলির মধ্যে দিয়ে পথ ক'রে-ক'রে সে-রাত্তে একশো মাইল অতিক্রম ক'রে এলো স্টিমার, ঊষাকালে পেরিয়ে এলো 'বাঘের মুখ',

আর সকালবেলার কুয়াশার মধ্য দিয়ে স্টিমারটির দিকে তাকিয়ে রইলো হংকং-এর ভিক্টোরিয়ার ঝাপসা চূড়ো।

পথে কোনো অসুবিধাই হ'লো না; কিন-ফো আর ওয়াং যথাসময়ে কিয়াংনান প্রদেশের উপকূলে শাংহাইতে এসে নামলো।

৩

শাংহাই

চিনে ভাষায় এই মর্মে একটা প্রবাদ আছে: 'যখন তলোয়ারে মরচে ধ'রে যায় আর কুড়ুল চকচক করে, যখন জেলখানায় কেউ থাকে না আর গোলাবাড়ি থৈ-থৈ করে, যখন মন্দিরের সিঁড়ি লোকের পায়ের চাপে জীর্ণ হ'য়ে যায় আর আদালতের উঠোনে আগাছা গজায়, যখন ডাক্তাররা পায়ে হেঁটে বেড়োয় আর রুটিওলা যায় ঘোড়ার পিঠে, তখন বুঝবে যে দেশে সুশাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এই প্রবচনে কতটা সত্য আছে কে জানে—কিন্তু এটা ঠিক যে অন্য দেশের বেলায় এই বিবরণ খাটলেও চিনের বেলায় মোটেই খাপ খায় না। চিনে বরং তলোয়ারের ফলাই ঝকমক করে সব সময়, আর কুড়ুল বা কোদালে জং ধ'রে থাকে, জেলখানায় লোক আঁটে না, কিন্তু গোলাবাড়ি প'ড়ে থাকে শূন্য; উপোষ ক'রে মরে বরং রুটিওলাই, ডাক্তার নয়, আর প্যাগোডায় হয়তো কতিপয় ধর্মভীরুর ভিড় লেগে থাকে, কিন্তু আদালতে কখনো অপরাধীর সংখ্যা কম থাকে না।

১,৩০০,০০০ বর্গমাইল বড়ো যে-দেশের দৈর্ঘ্য ১৪০০ মাইলেরও বেশি, আর প্রস্থ ৯০০ থেকে ১৩০০ মাইলের মধ্যে, যে-দেশে আঠারোটা মস্ত প্রদেশ রয়েছে, আর রয়েছে মোঙ্গোলিয়া, মাঞ্চুরিয়া, তিব্বত, টংকিং, কোরিয়া আর লু-চু দ্বীপ প্রভৃতি করদ রাজ্য, সে-দেশের শাসনব্যবস্থায় যে প্রচুর ত্রুটি থাকবে, তাতে বিচিত্র কী। বিদেশিদের কাছে এই অরাজক অবস্থা তো দিবালোকের মতোই স্বচ্ছ—এবং সম্প্রতি চিনেরাও এ-বিষয়ে ওয়াকিবহাল হ'তে শুরু করছে। সম্রাট তো 'ঈশ্বরের পুত্র,' জনগণের পিতৃপ্রতিম, জমকালো প্রাসাদে একা থাকেন যিনি, কচিৎ যাঁর দর্শন মেলে, যাঁর মুখের কথাই আইন, জীবনমৃত্যুর উপর যাঁর ক্ষমতা চূড়ান্ত, জন্মসূত্রেই এই বিপুল রাজকর যাঁর প্রাপ্য, যাঁর চরণধূলির তলায় সব মস্তকই নত হয়—তিনি—কেবল তিনি ই

হয়তো এই ধারণা পোষণ করতে পারেন যে তাঁর রাজ্যে সুখশান্তির অভাব নেই ; তাঁর চোখ ফোটাবার যাবতীয় চেষ্টাই হয়তো ব্যর্থ হ'তে বাধ্য। যিনি 'দেবপুত্র' তাঁর কি কখনো ভুল হ'তে পারে, না কি তাঁর পক্ষে ভুল-করা কোনোকালে সম্ভব ?

কিন-কো অবশ্য অনেক ভেবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে চিনেদের কর্তৃত্বে বাস করার চেয়ে ইওরোপীয় আধিপত্য স্বীকার ক'রে নেয়া অনেক ভালো, ঠিক শাংহাইতে সে থাকে না, বরং শাংহাইর যে-অংশে ইংরেজরা স্বতন্ত্র শাসনকাজ চালায় সেই জায়গাতেই সে নিজের বাড়ি করেছে।

আসল শাংহাই-র অবস্থান ওয়াং-পো ব'লে একটা ছোটো নদীর বাম তীরে, ঠিক সমকোণ ক'রে এই নদী গিয়ে পড়েছে ইয়াং-সি-কিয়াং বা নীল নদীতে, তারপর পীত সমুদ্রে গিয়ে মিশেছে। শহরটি ডিম্বাকৃতি, উত্তরে-দক্ষিণে বিস্তৃত, চারপাশে উঁচু প্রাচীর, আর প্রাচীর পেরিয়ে গেলে পড়া যায় শহরতলিতে—শহরতলিতে যাবার রাস্তা পাঁচটি। সরু নোংরা গলিগুলির দশা শান-বাঁধানো পায়ে-চলার পথের চেয়ে কিঞ্চিৎ ভালো, কুলুঙ্গির মতো ছোটো-ছোটো একেকটা দোকান, লোককে আকর্ষণ করার জন্য মালপত্তর সাজিয়ে-রাখার কোনো বালাই নেই, দোকানদারেরা অনেক সময়েই খালি গায়ে ব'সে থেকে বেচাকেনা চালায়, ঘোড়ার গাড়ি বা পাল্কি তো দূরের কথা, ঘোড়সোয়ারের দেখাই মেলে কচিৎ, এলোমেলো কতগুলি বৌদ্ধ মন্দির আর বিদেশী গির্জে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রয়েছে ; আমোদ-প্রমোদের জায়গা বলতে আছে একটি 'চা-বাগান,' একটা স্যাঁতসেঁতে কুচকাওয়াজের মাঠ—আগে নাকি এখানে ধান হ'তো, তাই জায়গাটা অমন ড্যাপশা আর ভিজে-ভিজে। এই হচ্ছে শহরটির বৈশিষ্ট্য ; সব শুনে মনে হ'তে পারে লোকে এখানে থাকে কী ক'রে, কিন্তু তবু এখানে অন্তত ২০০,০০০ লোকের বাস, আর বাণিজ্যকেন্দ্র হিশেবে তার গুরুত্বও অবহেলা করার মতো নয়।

বস্তুত নানকিং-এর চুক্তির পর শাংহাইতেই প্রথম ইওরোপীয়রা অবাধ বাণিজ্যের অধিকার পেয়েছিলো, এমনকি তাদের কুঠি তৈরিরও অনুমতি দেয়া হয়েছিলো। শহর ও শহরতলির বাইরে বার্ষিক শুল্কের বিনিময়ে তিন টুকরো জমি দেয়া হয়েছিলো ইংরেজ, ফরাশি আর মার্কিনদের—আর এই শ্বেতাঙ্গদের সংখ্যা সেখানে দু-হাজারের কম ছিলো না।

এদের মধ্যে ফরাশিদের পাওয়া জমিটুকুই যে সবচেয়ে বাজে, এ-কথা বোধকরি বলার অপেক্ষা রাখে না। শহরের উত্তরভাগে ইয়ং-কিং-পাং নদী পর্যন্ত

যে-জমিটুকু আছে তারই মালিক ছিলো ফরাশিরা, ইংরেজদের এলাকা নদীর ওপারে, ল্যাজারিস্ট আর জেস্যুইটরা গির্জে বানিয়েছে এখানে, আর সেই সূত্রে শহর থেকে চারমাইল দূরে ক্যাথলিকদের কলেজ খোলা হয়েছে, যেখান থেকে পাশ ক'রে চিনেরা ডিগ্রি নেয়। বসতিটা অবশ্য এতই ছোটো যে প্রতিবেশীদের সঙ্গে তার কোনো তুলনাই হয় না, ১৮৬১ সালে দশটি বাণিজ্যিক কুঠি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো এখানে—এখন মাত্র তিনটিই কোনোক্রমে টিঁকে আছে। এমনকি একটা ব্যাঙ্ক ছিলো আগে, সেটাও এখন ইংরেজ বসতিতে গিয়ে ব্যাবসা ফেঁদেছে।

মার্কিন বসতিটা বরং উঁয়ো-স্থং নদীর ধারে, ঠিক যেখানে সমকোণ ক'রে ওয়াং-পো বেঁকেছে, সু-চু খাল সেটাকে ইংরেজ বসতি থেকে আলাদা ক'রে রেখেছে, খালের উপরে রয়েছে একটা কাঠের সাঁকো। মার্কিন বসতির প্রধান দুই অট্টালিকা হ'লো হোটেল অ্যাস্টর আর মিশন চার্চ। এখানে অবশ্য ছোটোখাটো একটা ডক রয়েছে, মেরামতের জন্য প্রায়ই এখানে মার্কিন ও ইওরোপীয় জাহাজ আসে।

বসতি তিনটির মধ্যে সবচেয়ে উন্নতিশীল যেটি তার মালিক ইংরেজরা। নদীর ধারে-ধারে বারান্দা আর বাগানওলা সুন্দর বাংলো তুলেছে তারা, ধনী সদাগরদের বাড়ি এ-সব, একটা বাড়ি ওরিয়েন্টাল ব্যাঙ্কের, ডেন্ট, জারডিন আর রাসেলদের প্রতিষ্ঠান রয়েছে সেখানে, আর রয়েছে ইংরেজদের ক্লাব, নাট্যশালা, টেনিস-কোর্ট, ঘোড়দৌড়ের মাঠ, গ্রন্থাগার—সব মিলিয়ে লোকে যাকে বলে 'আদর্শ বসতি'। বেশ সুশৃঙ্খল সাজানো-গোছানো জায়গাটা, মঁসিয় লিয়ঁ রুসে যার মধ্যে ইংরেজ চরিত্রের গৃহিণীপনা খুঁজে পেয়েছেন।

কেউ যদি হঠাৎ ইয়াং-সি-কিয়াং নদী দিয়ে এখানে ভেলা ভাসিয়ে আসে, তাহ'লে তাকিয়ে দেখবে একই হাওয়ায় কেমন পৎপৎ ক'রে উড়ছে চারটি পতাকা: তেরঙা ফরাশি নিশেন, ইউনিয়ন জ্যাক, তারা আর রেখা-আঁকা মার্কিন নিশেন, আর সবুজ ঝাণ্ডায় হলদে ক্রুশ—চিন সম্রাটের পতাকা।

শাংহাইয়ের জমি সমতল, গাছপালা বিশেষ নেই, সরু পাথুরে রাস্তা, সমকোণ ক'রে পায়ে-চলার পথগুলি একে অন্যকে কাটাকুটি ক'রে গেছে, মস্ত সব জলাধার—ধানখেতে জলসেচের আধার এরা, অসংখ্য খাল কেটে একেবারে মাঠ পর্যন্ত জল নিয়ে যাওয়া হয়েছে—অনেকটা হল্যাণ্ডে যে-রকম। আস্ত দৃশ্যটা দেখে মনে হবে ফ্রেমছাড়া একটা সবুজ ল্যাণ্ডস্কেপ বুঝি।

দুপুরবেলায় শাংহাইর পুবদিকের শহরতলিতে স্টিমার এসে জেটিতে

ভিড়ভেই কিন-কো আর ওয়াং নেমে পড়লো। চারদিকে প্রচণ্ড ভিড় আর হৈ-চৈ। নদীতে জাঙ্কের সংখ্যা হবে কয়েকশো, তাছাড়া আছে প্রমোদতরী, গণ্ডোলার মতো দেখতে শাম্পান, ভেলা—যেন একটা ভাসমান নগরী। নগরীই বটে, কারণ অন্তত ৩০,০০০ লোক বাস করে এ-সব ভিঙিতে আর শাম্পানে—এরা সবাই নিচুতলার মানুষ: এদের মধ্যে সবচেয়ে যে ধনী সেও কোনোদিন ভুলেও মান্দারিন হবার স্বপ্ন দ্যাখে না। জেটিতেও, নদীর মতোই, পিঁপড়ের সারির মতো লোকের বাস, কত ধরনের যে লোক কে জানে—সদাগর, কমলাওলা, ফিরিওলা, নানা দেশের মাঝি-মাল্লা, ভিস্তিওলা, ভাবীকথক আর জ্যোতিষী, বৌদ্ধ ভিক্ষু, ক্যাথলিক পাদ্রি, সেপাই-শান্ত্রী, কোতোয়ালির লোক, দোভাষি, ইওরোপীয় ব্যাবসাদারদের দালাল—কেই বা নেই!

আস্তে ভিড়ের মধ্য দিয়ে এগোতে লাগলো দুই বন্ধু। কিন-কোর হাতে শৌখিন হাত-পাখা, উদাসীন অবহেলার ভঙ্গি তার, চারপাশের মনুষ্যকুলের দিকে দৃকপাতও করছে না, তার সঙ্গে এই ভিড়ের যেন কোনো যোগই নেই। ওয়াং তার ছাতা খুলে মাথায় দিয়েছে, ছাতার হলদে কাপড়ে কালো-কালো দৈত্যদানোর মূর্তি-আঁকা; হেঁটে যেতে-যেতে সে কিন্তু তীক্ষ্ণ চোখে আশপাশের সব কিছু লক্ষ করতে ভুলছে না। পূর্ব তোরণ পেরিয়ে আসার পর হঠাৎ তার চোখে পড়লো দশবারোটা বাঁশের খাঁচা: আগের দিন যে-সব অপরাধীর মুণ্ডচ্ছেদ করা হয়েছে, তাদের ছিন্নশিরে খাঁচাগুলো ভর্তি।

'শিরচ্ছেদ না-ক'রে যদি তাদের মাথায় এককোঁটা জ্ঞান ঢুকিয়ে দিতো,' বিড়বিড় ক'রে বললো সে আপন মনে।

এ-কথা কিন-কোর কানে পৌঁছোয়নি, পৌঁছোলে হয়তো কোনো প্রাক্তন তাই-পিং-এর মুখে এ-কথা শুনে অবাক হ'য়ে যেতো।

জেটি ছেড়ে, প্রাচীরের পাশ দিয়ে ঘুরে, তারা ফরাশি বসতির কাছে এসে পড়লো। লম্বা নীল আলখাল্লা-পরা একটি লোক ফাঁপা একটা মোষের শিঙে ছড়ির ঘা দিয়ে লোক জড়ো করার চেষ্টা করছে—হঠাৎ তারা দেখতে পেলে।

'ভাখো-ভাখো,' ওয়াং চেঁচিয়ে উঠলো, 'একটা সিয়েন-চেং!'

'তো কী?' জিগেশ করলো কিন-কো।

'কেন, ভালোই তো হ'লো। তুমি বিয়ে করতে যাচ্ছো—লোকটা তোমার ভবিষ্যৎ ব'লে দেবে!' উত্তর দিলে দার্শনিক।

নিজের ভবিষ্যৎ জানার কোনো গরজ ছিলো না কিন-কোর। তবু ওয়াং-এর কথায় সে থেমে দাঁড়ালো।

'সিয়েন-চেং' বলে ভাবীকথক বা গণকদের, কয়েক সাপেকের বিনিময়ে তারা ব'লে দেয় ভবিষ্যতের গর্ভে কোন রহস্য লুকিয়ে আছে। চৌবস্থিটা তাসের একটা প্যাকেট থাকে তার কাছে, আর থাকে একটা ছোট্ট খাঁচায় একটি পাখির ছানা: হয়তো ফিতে বোতামের গর্তের সঙ্গে বাঁধা থাকে খাঁচাটা, আর তাসের প্যাকেটের মধ্যে থাকে দেবতা, মানুষ আর জন্তুজানোয়ারের ছবি। চিনেরা এমনিতেই বড্ড কুসংস্কারে ভোগে, কত যে অলক্ষণ-সুলক্ষণ দেখতে পায় তারা চারপাশে, তার কোনো ইয়ত্তা নেই, কিন্তু কোনো সিয়েন-চেংকে দেখলে তো আর কথাই নেই, একবারে পায়ের তলায় লুটিয়ে পড়বে।

ওয়াং-এর ইঙ্গিতে লোকটা মাটির উপর এক টুকরো কাপড় বিছিয়ে দিয়ে পাখির খাঁচাটা তার উপর রাখলে। তারপর তার তাসের প্যাকেট বার ক'রে ভালো ক'রে ফাটিয়ে নিলে, নানাভাবে শাফল করলে, তারপর ওই কাপড়ের উপর এক এক ক'রে তাসগুলো উলটো ক'রে বিছিয়ে দিলে। খাঁচার দরজাটা খুলে দিয়ে তারপর সে একটু স'রে গেলো, যাতে পাখিটা বেরিয়ে আসে। আস্তে তিড়িং একটা লাফ দিয়ে বেরোলো পাখির ছানা, একটা তাস তুলে ধরলো ঠোঁটের ডগায়, তারপর আবার লাফিয়ে খাঁচায় ঢুকে গেলো। দু-একটা ধানের দানা বখশিশ দেয়া হ'লো পাখিটাকে। তারপর চিৎ ক'রে ফেলা হ'লো তাসটা। তাসটায় দেখা গেলো একটি মনুষ্যমূর্তি আঁকা আর উত্তরের সরকারের ভাষা 'কুনান-কনা'য় ছোট্ট একটি নীতিবাক্য লেখা তার তলায়। 'কুনান-কনা' জানে কেবল শিক্ষিত লোকেরা, সাধারণ লোকের কাছে এ-ভাষা ক্লাসিকাল গ্রীক ভাষার মতোই কঠিন। তাসটি তুলে নিয়ে সিয়েন-চেং এবার দরকারিভাবে দেখালো তাদের, তারপর জগৎ-জোড়া ভাবীকথকরা যে-সব গল্প ফেঁদে মক্কেলকে তুষ্ট করার চেষ্টা করে, তারই অবতারণা করলে: ভীষণ একটা বিপদ ঘনাচ্ছে, বিপত্তি যাকে বলে—তারপর দশ হাজার বছর ধ'রে সুখ শান্তি সন্তোষ।

'তা খুব-একটা খারাপ নয়, কী বলো!' কিন কো অমায়িকভাবে মন্তব্য করলে, 'এক-আধটা বিপত্তি আর তেমন কী!' একটা তায়েল ছুঁড়ে দিলে সে সাদা কাপড়ের উপর। ক্ষুধার্ত কুকুর যেমন ক'রে হাড়ের টুকরোর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে, ভাবীকথকটি ঠিক যেন তেমনি ভাবে ওই রজত মুদ্রাটি আঁকড়ে ধরলো: কার মুখ দেখে সে উঠেছিলো কে জানে, আস্ত একটা রূপোর ঝিলিক তো আর রোজ চোখে পড়ে না।

আবার দু-বন্ধু নিজেদের গন্তব্যপথে অগ্রসর হ'লো। ফরাশি বসতির

কাছে এগিয়ে এলো তারা। ওয়াং তখন মনে-মনে ভাবছে, 'কী আশ্চর্য, আমি যা বলেছিলুম তার সঙ্গে এই ভাবীকথন কেমন অদ্ভুত মিলে গেলো।' এদিকে কিন-ফোর দৃঢ় বিশ্বাস যে সত্যিকার কোনো বিপত্তিতে সে পড়তেই পারে না। করাশি দূতাবাস পেরিয়ে গেলো তারা, পেরিয়ে এলো ইয়াং-কিং-পাঙের সরু কাঠের সাঁকোটা, ইংরেজ বসতিতে ঢুকে পড়লো তারপর, ইওরোপীয়দের প্রধান জাহাজঘাটা পর্যন্ত হেঁটে গেলো।

জাহাজঘাটায় পৌঁছুতেই বেলা বারোটার ঘণ্টা পড়লো—চিনেরা বারোটার পর আর লেনদেন করে না, সেদিনকার মতো ব্যাবসায় ইতি পড়ে সেখানেই। হঠাৎ যেন মন্ত্রবলে বিকিকিনির হৈ-চৈ আস্তে-আস্তে মিলিয়ে গেলো, যেন কোনো জাদুকাঠির ছোঁয়ায় ইংরেজ বসতির শোরগোল থেমে গিয়ে সব স্তব্ধ ও চুপচাপ হ'য়ে গেলো।

বন্দরে তখন সবেমাত্র কয়েকটা জাহাজ ঢুকেছে—বেশির ভাগ জাহাজেরই মাস্তুলে উড়ছে ইউনিয়ন জ্যাক। শতকরা নব্বুইটা জাহাজই বোধহয় আফিমে ভর্তি: শতকরা তিনশো টাকা লাভ ক'রে ইংল্যাণ্ড চিনকে এই ভীষণ নেশা সরবরাহ করে।—চৈনিক সরকার মিথ্যেই এই আফিম রপ্তানি বন্ধ করতে চেয়েছে, কিন্তু ইংরেজদের কিছুতেই হটাতে পারেনি, বরং ১৮৪১ সালের যুদ্ধ আর নানকিংয়ের চুক্তির ফলে ইংরেজরা অবাধ বাণিজ্যের অধিকার পেয়েছে; পিকিং-এর শাসনদপ্তর যদিও এটা ঘোষণা করেছে যে কোনো চিনেকে যদি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে আফিম রপ্তানির কাজে লিপ্ত দেখা যায় তাহ'লে তাকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হবে, তবু একটা-না-একটা আইনের ফাঁক বের ক'রে লোকে সহজেই শাস্তি এড়িয়ে যায়। জনরব যে শাংহাই-এর মান্দারিন রাজ্যপাল নাকি কোনো-কিছু লক্ষ না-ক'রে চোখ বুজে থাকেন ব'লে প্রতি বছরই তাঁর নামে নির্দিষ্ট বেতন ছাড়া আরো কয়েক হাজার পাউণ্ড ব্যাঙ্কে জমা পড়ে।

এটা অবশ্য এখানে বলা উচিত যে কিন-ফো বা ওয়াং দুজনের কেউই কোনোদিনও চণ্ডু টেনে ছাখেনি, আর ঘণ্টাখানেক পরে তারা দুজনে যে-চমৎকার বাড়িটিতে এসে পৌঁছোলো তার অন্দরমহলে এই ভীষণ বিষের একটি তোলাও কোনোদিন ঢোকেনি।

'ভয় না-দেখিয়ে দেশের লোককে বরং শেখানো উচিত।'

ওয়াং কেবলই এ-কথা বলে; আগেকার দিনের ত্রাই-পিং আদর্শকে ভুলে গিয়ে সে আরো বলে: 'জানি বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মী, কিন্তু দর্শনচর্চা তার চেয়ে ঢের ভালো।'

৪

কিন-ফোর আলয়

সমান্তর কতগুলো দালানের সারি পরস্পরকে সমকোণে ভেদ ক'রে গেছে: ইয়ামেন নামের বিলাসভবনগুলি দেখতে এ-রকম। এমনিতে অবশ্য সম্রাটই স্বয়ং সবগুলি ইয়ামেনের মালিক: ধনী মান্দারিন ছাড়া আর-কারু সেখানে থাকার অধিকার নেই, কিন্তু যাদের বিস্তর টাকাকড়ি আছে, তাদেরও অবশ্যি এখানে থাকতে বাধা নেই। কিন-ফো ঠিক এমনি একটি বিলাসভবনেই বাস করে।

ভবনটির চারপাশে, বাগান আর উঠোন ঘিরে মস্ত একটা দেয়ালতোলা: কিন-ফো আর ওয়াং তারই প্রধান ফটক পেরিয়ে ঢুকলো। কোনো মান্দারিন ম্যাজিস্ট্রেট ইয়ামেনে থাকলে, ছবি আঁকা সুসজ্জিত দেউড়িতে মস্ত একটা ঢাক থাকতো, দিনে-রাতে যে-কোনো সময়ে যে কোনো লোক তার নালিশ জানতে আসতে পারে এখানে, এসেই প্রথমে তাকে ঢাকে কাঠি দিয়ে তার আগমন-বার্তা ঘোষণা করতে হবে, কিন্তু যেহেতু এটা কোনো সরকারি চাকুরের ভবন নয়, সেই জন্য দেউড়িতে সেই ঢাকের বদলে এখন রয়েছে মস্ত সব পোর্সেলেনের জালা, পথচারীদের জন্য সর্দার খানসামা একটু পরে-পরে এসে তা ঠাণ্ডা চায়ে ভর্তি ক'রে দিয়ে যায় কিন-ফোর এই বদান্যতার জন্য পাড়া-পড়শিরা তাকে বরং বেশ পছন্দই করে!

প্রভুর আগমন-বার্তা শুনে বাড়িসুদ্ধ লোক এসে দেউড়িতে ভিড় ক'রে দাঁড়ালো পরিচারক, খানসামা, বাজার-সরকার, কোচোয়ান, ঘড়িবাবু, বাবুর্চি, মালি—সবাই প্রধান গোমস্তার নেতৃত্বে এসে দাঁড়ালো দেউড়িতে, তাদের পিছনে রইলো দশ-বারোটি কুলি, মাস-মাইনের কাজ করে তারা, অপেক্ষাকৃত কঠিন কাজই ক'রে থাকে তারা, কঠিন এবং পরিশ্রমসাধ্য, মাটি কোপায়, ঘর ঝাঁট দেয় বা ওই জাতীয় অন্য-সব কাজ করে।

প্রধান গোমস্তা ওয়েকে নামের প্রভুকে স্বাগত জানাতে এগিয়ে এলো, কিন্তু কিন-ফো তাচ্ছিল্যভরে হাত নেড়ে তাকে পাশ কাটিয়ে চ'লে যেতে-যেতে জিগেস করলো: 'সুনকে দেখছিনে তো? সে কোথায়?'

ওয়াং হেসে ফেললো। 'স্থনের কারবারই ওই রকম। ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় যদি ওকে দেখা যাবে তাহ'লে ও আর স্থন হবে কী ক'রে?'

কিন-কো আবার জিগেশ করলে, 'স্থন কোথায়?'

নায়েব কেবল জানালে যে তা বলা খুবই মুশকিল—শুধু সে-ই নয়, অন্ত-কেউই বোধহয় জানে না স্থনের কী হয়েছে, বা সে কোনখানে রয়েছে।

স্থন হ'লো কিন-কোর খাশ ভৃত্য, শুধু তারই বিশেষ তদারকির জন্মে নিযুক্ত—কিছুতেই তাকে ছেড়ে-থাকার কথা কিন-কো ভাবতে পারে না। তাই ব'লে ভৃত্য হিশেবে স্থন কিন্তু আদৌ সেরা জাতের নয়। বরং একটা কাজ করতে গিয়ে সে আরেকটা ক'রে আসে, একখানা দিলে তিনখানা ক'রে আনে, তিনখানা দিলে একখানা রাখে—বাকিগুলোর কোনো হদিশই জানে না, যেমন কাজে তেমনি কথায়—কিছুই তার ঠিক থাকে না, কখনো না। লোভীর একশেষ, ভিতুর হদ্দ, ভীষণ পেটুক: পরদায় কি চায়ের পেয়ালায় চিনেদের যেমন আঁকা হয়, হুবহু তারই এক জ্যান্ত সংস্করণ। এমনিতে অবশ্য তাকে বিশ্বাসীই বলতে হয়, আর তার বিশেষ-একটা মূল্যও আছে: শুধু সে ই তার প্রভুকে নানা কাজে-কর্মে উশকে দিতে পারে। দিনের মধ্যে অন্তত বারো বার কিন-কো স্থনের উপর রেগে চ্যাচামেচি শুরু ক'রে দেয়—স্থন অবিশ্যি সব গালাগাল এক কান দিয়ে শুনে আরেক কান দিয়ে বার ক'রে দেয়—কিন্তু তার ফলে অন্তত সাময়িকভাবেও যে কিন-কো তার অনীহা ও ঔদাসীন্য থেকে জেগে ওঠে, এটাই যা মস্ত লাভ।

মাঝে-মাঝে বিবেক যখন চাড়া-দিয়ে ওঠে, তখন চিনে ভৃত্যরা প্রভুর কাছে এসে মাথা পেতে দাঁড়ায় শাস্তি নিতে: আর দিনের মধ্যে কয়েকবার সাজা নিতে না-এলে স্থনের বোধহয় কোনো খাগুই হজম হ'তো না। প্রভুও এ-সব ক্ষেত্রে ভৃত্যকে যে ছেড়ে কথা কইতেন, তা নয়, ভৃত্যের পিঠে কয়েক ঘা চাবুক কশানো তো কয়েক ফোঁটা বৃষ্টিরই শামিল; কিন্তু যে-শাস্তিটাকে স্থন সবচেয়ে ভয় পেতো তা চাবুক নয়; বরং তার সাধের বেণীর এক-আধ ইঞ্চি খোয়া গেলেই সে একেবারে কেঁচো। অপরাধের মাত্রা প্রবল হ'লেই কিন-কো কাঁচি দিয়ে তার বেণী কেটে নিতো।

কোনো চিনের কাছে বেণীর চাইতে গৌরবের আর কিছুই নেই। বেণী খোয়াবার জ্বালা কি মরলেও কমে!

ছার এই জীবন, শতধিক একে—যদি বেণীই খোয়া গেলো! চার বছর আগে স্থন যখন প্রথম কিন-কোর কাছে এসে চাকরি নেয়, আহা, তখন তার

বেণী কী মতই না ছিলো—লম্বায় চার ফুট তো হবেই নিদেন, কিন্তু এক-বছরে এত বার সে গুরুতর অপরাধ ক'রে ফেলেছে যে এখন বেচারির বেণী কিছুতেই দু-ফুটের বড়ো নয়, যদি এই হারে তার বেণী ছোটো হ'তে শুরু করে—কী সর্বনাশ—তাহ'লে অল্প দিনেই তো তার মাথায় চকচকে ঝকঝকে টাক প'ড়ে যাবে!

গেটউড়ি পেরিয়ে বাড়ি ঢুকলো কিন কো, বাগানও পেরিয়ে এলো—পিছনে সসম্ভ্রমে ভৃত্যরা তাকে অনুসরণ করলে। টেরাকোটা-করা মাটির টব—তাতেই গাছ পোঁতা, সবগুলি গাছই কেটে-ছেঁটে কিম্ভুত মূর্তি বানানো হয়েছে—অদ্ভুত সব জন্তুজানোয়ারের চেহারা গাছগুলোর। বাগানের মাঝখানে ছোট্ট একটা ঝিল, তাতে লাল-নীল সোনালি মাছ খেলা ক'রে বেড়ায় শ্যাওলা আর লাল পদ্মের পাতায় জল দেখা যায় না, পাশেই একটা দেয়ালের গায়ে ঝকঝকে রঙে কিংবদন্তির কোনো ভীষণ প্রাণীর মূর্তি আঁকা, সেটা পেরিয়ে গেলে পর মূল বাড়ির দুয়ার চোখে পড়ে।

মূল বাড়িটা দোতলা মারবেল পাথরের সিঁড়ি ধাপে-ধাপে উঠে গেছে একতলায় উঁচু বারান্দার দিকে। বেতের তৈরি পরদা ঝোলে উপরে, দরজায় আর জানলায়—যাতে গরমে বেশি কষ্ট পেতে না-হয়। বাড়িটার ছাত সমতল—আশপাশের পলেস্তরা-খসা ইটকাঠের বাড়ির কার্নিশ আর আঁকাবাঁকা টালির সঙ্গে মোটেই খাপ খায় না।

যে-কটা ঘরে কিন কো আর ওয়াং থাকে, সেগুলো ছাড়া ভিতরের বাকি ঘরগুলো মস্ত হলঘরের মতো—ঘরগুলিতে মস্ত সব দেরাজ আর আর সিন্দুক, তাদের কবাটের উপর কত রকম যে ছবি আঁকা একটাতে হয়তো ফলে-ফুলে ভরা কোনো বাগানের ছবি, অন্যটায় হয়তো নানা প্রবচন আর আপ্তবাক্য খোদাই-করা—যা দেখে ধর্মভীরুরা তুষ্ট হয়। বসার ব্যবস্থা আছে যত্রতত্র—কোনোটা টেরাকোটা, কোনোটা পোর্সেলেনের—কাঠ বা মারবেলও বাদ যায়নি—কিন্তু তাই ব'লে প্রতীচীর মতো কুশান-দেয়া সোফা-সেটও কম নেই: নানা রকম লণ্ঠন ঝুলছে কড়িকাঠ থেকে, চিনে জাপানি, কোথাও রঙিন ঝালর পরানো—কোথাও-বা ইস্পাহানিদের ঝাড়লণ্ঠন থেকে রেশমি ঝাপ্পা নেমে এসেছে নিচে। এক ধরনের আসবাবের তো বোধকরি লেখাজোখা নেই—তা হ'লো 'চা-কি'—বা ছোট্ট চায়ের টেবিল—হাত বাড়ালেই যাতে একটা 'চা-কি' মেলে, সেইজন্যেই এই ব্যবস্থা।

যে-সব টুকিটাকি জিনিশ দিয়ে ঘর সাজানো, তা-ই দেখেই হয়তো

ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যাবে। হাতির দাঁত, মুক্তো, মিনে-করা ব্রনজ— কত-টুকিটাকি যে ছড়িয়ে আছে কে জানে। কতরকম ধূপদানি, পান্না-বসানো সোনার গন্ধদানি, হেকলা কাচের ফুলদানি; সব মিঙ আর ৎসিং রাজবংশের স্মৃতিভারে আচ্ছন্ন হ'য়ে আছে; আছে আরো দুর্লভ সামগ্রী—ইয়েন যুগের পোর্সেলেনের জিনিশ, হলদে-গোলাপি রঙের স্বচ্ছ এনামেলের শৌখিনতা—যা বানাবার কৌশল একালের লোকের কাছে অম্লান রহস্য ব'লে ঠেকে। চারপাশে চোখ চেয়ে দেখুন একবার, তাহ'লেই বুঝতে পারবেন বিলাস কাকে বলে: প্রাচীকে এ-বিষয়ে সাহায্য করতে এগিয়ে এসেছে প্রতীচীও—আরাম, সৌন্দর্য, জাঁকজমক, কিছুরই কোনো অভাব নেই এখানে।

মানুষটা কিন-ফো বেশ উদার ও প্রগতিশীল—যুগের সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে পারে; পশ্চিমের সভ্যতার দিকে সে নাক উঁচু ক'রে বাঁকা চোখে তাকায় না, নতুন-কোনো আবিষ্কারকে বাধা দিতে সে হচ্ছে শেষ ব্যক্তি। বিজ্ঞানের যে-কোনো প্রকাশকেই সে সমর্থন করে: বৈদ্যুতিক তার কেটে ফেলে দেয় যে-সব বর্বর, তাদের সঙ্গে তার কোনো সংস্রব নেই; সেই সব গোঁড়া প্রাচীনপন্থী মান্দারিন—যারা শাংহাই আর হংকং-এর মধ্যে জলের তলায় টেলিগ্রামের লাইন বসাতে দেয়নি—তাদের প্রতিও তার কোনো অনুরাগ নেই। বরং ফরাশি কারিগরদের পরিচালনায় ফু-চুতে ডক বানাতে যে-দল সরকারকে চাপ দিয়েছিলো, সরাসরি সমর্থন করেছিলো, কিন-ফো তাদেরই একজন। তিয়েন-ৎসিন আর শাংহাইয়ের মধ্যে যে-চীনা স্টিমশিপ কম্পানি জাহাজ চালায়, তার অনেক শেয়ার কিনেছে সে, সিঙ্গাপুর থেকে দ্রুতগামী জাহাজে ক'রে চারদিনে যারা পশ্চিমের সঙ্গে চিঠি দিয়ে যোগাযোগ করতে চায়, তাদের নতুন উদ্যমে সে প্রচুর টাকা ঢেলেছে।

এমন-কোনো আধুনিক বৈজ্ঞানিক অবদান নেই, যা সে নিজের বাড়িতে ব্যবহার করে না। টেলিফোন বসিয়েছে সে বাড়িতে, যাতে ইয়ামেনের সব অংশের সঙ্গেই সর্বদা যোগাযোগ রাখতে পারে, প্রত্যেক কোঠায় বসিয়েছে বৈদ্যুতিক ঘণ্টা, ঠাণ্ডার দিনে যখন তার চুল্লিতে গ্যাস জ্বলে, তখন তার দেশের অন্যলোকেরা লেপমুড়ি দিয়ে শুয়ে শীতে কাঁপে, আর আজকাল সে নিজের হাতে কিছু লেখার পরিশ্রম করতে চায় না—ব্যক্তিগত চিঠিপত্র লেখার দরকার হ'লে কেবল এডিসনের নতুন আবিষ্কার ফোনোগ্রাফের সাহায্য নেয়।

সব সত্ত্বেও কিন্তু কিন-ফো মোটেই সুখী নয়;—মর্ত্যলোকে কেউ ভোগ-বিলাসের জন্য যা-কিছু কামনা করে, সব সে জোগাড় করতে পারে সুখের

কথা বলালেই — এত তার ঐশ্বর্য — কিন্তু তবু ওয়াং তার ছাত্রকে সেই দর্শনশাস্ত্রে দীক্ষা দিতে পারেনি, যা মানুষকে সুখী করে। তার এই আভ্য, এই বিপুল নির্বোধ থেকে সুনের উদ্ভট ক্রিয়াকলাপ মাঝে-মাঝে তাকে জাগিয়ে তোলে, এটা সত্যি ; কিন্তু তবু কোথায় যেন মস্ত একটা ফাঁক থেকে গেছে, যার ফলে কোনোকিছুতেই তার মন ওঠে না, সব-কিছুতেই কেমন-একটা অরুচির ভাব লেগেই আছে।

মস্ত একটা হলঘরে এসে ঢুকলো সে, যে-কোনো ঘরে ঢোকা যায় এ-ঘর থেকে, কিন্তু সুনের কোনো দেখা নেই। কারণটা এবার স্পষ্ট অনুমান করা যায় : নিশ্চয়ই সুন কোনো গর্হিত কাজ ক'রে ফেলেছে, আর তাই লুকিয়ে আছে, কিছুতেই দেখা দিতে চাচ্ছে না, যাতে অন্তত আরো-কিছুক্ষণ সাধের বেণীটিকে প্রভুর হাত থেকে নিরাপদ রাখতে পারে!

অধীর হ'য়ে কিন-ফো হাঁক পাড়লে : 'সুন! সুন!'

ওয়াংও গলা মেলালো : 'সুন!'

এই হাঁকডাক সুনের কানে পৌঁছোলো কিনা কে জানে — তবে সে যে তার গোপন জায়গা থেকে একচুলও নড়লো না তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

'নাঃ, লোকটা সংশোধনের অতীত,' ওয়াং বললে, 'কোনো দর্শনই তাকে মানুষ করতে পারবে না!'

কিন-ফো রেগে মাটিতে পা ঠুকে নায়েবকে ডাক দিলে। 'যাও, সুনকে খুঁজে বার করো — এক্ষুনি আমার কাছে পাঠিয়ে দাও ওকে।'

বাড়িসুদ্ধ লোক চঞ্চল হ'য়ে উঠলো : নিরুদ্দেশ ভৃত্যটির সন্ধান চাই!

ওয়াং যখন দেখলো যে ঘরে সে আর কিন-ফো ছাড়া আর-কেউ নেই, তখন সুযোগ পেয়ে পাণ্ডিত্যিয়ানা জাহির করলে : 'এবার বিশ্রাম করা উচিত শ্রান্ত পথিকের : আক্কেল অন্তত তাই বলে।'

'হ্যাঁ, না-হ'লে হয়তো আক্কেলসেলামি দিতে হবে,' কিন-ফো উত্তর দিলে।

যে যার ঘরে গিয়ে ঢুকলো তখন।

একটা নরম কৌচের উপর হেলান দিয়ে শুয়ে কিন-ফো সাত-পাঁচ ভাবতে শুরু করলো। আর, স্বভাবতই, যাকে সে বিয়ে করবে ব'লে স্থির করেছে, সেই সুন্দরী ও অভিজাত তরুণীটির কথা ভাবতে শুরু করলো সে একটু পরেই। তরুণীটি থাকে পিকিং-এ। সেখানে গিয়েই মেয়েটির সঙ্গে মেলবার কথা কিন-ফোর। সে যে শিগগিরই পিকিং যাবে, এ-কথা মেয়েটিকে জানাবে কিনা, এবার তা-ই ভাবতে বসলো কিন-ফো। তার বিরহে সে ব্যাকুল হ'য়ে উঠেছে,

এমনি একটা ভঙ্গি করাই হয়তো ভালো; তাছাড়া সত্যি তো তার ভালোবাসা আন্তরিক ও অকৃত্রিম। অন্তত ওয়াং-এর বড়ো বুদ্ধিজীবদের তো এ-বিষয়ে কোনো সংশয় নেই। আর হয়তো তাকে বিয়ে ক'রেই সে জীবনে প্রথমবার সুখী হবে—এতদিনে হয়তো জানতে পারবে সুখ কাকে বলে, বেঁচে-থাকার আনন্দ কী।

আস্তে-আস্তে তার চোখের পাতা বুজে এলো; ঝাপশা ও অস্পষ্ট হ'য়ে উঠলো তার ভাবনা; বুঝি ঘুমেই ঢুলে পড়তো, কিন্তু এমন সময় তার ডান হাতের চেটোয় কে যেন আলতো শুড়শুড়ি দিলে; চট ক'রে হাত মুঠো ক'রেই বুঝতে পেলো যে, মুঠোর মধ্যে একটা ছড়ি চ'লে এসেছে। কী ব্যাপার বুঝতে তার মোটেই দেরি হ'লো না। তার প্রিয় ভৃত্যেরই কীর্তি এটা, পা টিপে-টিপে তার পাশে এসে দাঁড়িয়ে তার হাতে একটা ছড়ি গুঁজে দিয়েছে; এবার সুনের মোলায়েম গলা শোনা গেলো: 'হুজুর যখন ইচ্ছে করবেন—'

ধড়মড় ক'রে উঠে বসলো কিন-ফো, ছড়ি তুলে মারতে গেলো সুনকে। অমনি সুন ঘরের দামি পারস্য গালিচায় উপুড় হ'য়ে পড়লো। বাঁ হাত দিয়ে মাটিতে ভর রেখে ডান হাতে একটা চিঠি বাড়িয়ে ধরলো: 'আপনার চিঠি—আপনার নামেই এসেছে!'

'রাস্কেল! কোথায় ছিলি তুই এতক্ষণ!'

'আই-আই-ইয়া!' সুন আর্তনাদ ক'রে উঠলো, 'বিকেলের আগে আপনি ফিরবেন ব'লে ভাবিনি! মারুন আমাকে, ক'ষে পিট্টি দিন—মাথা পেতে নেবো আমি সব—হুজুর যখন ইচ্ছে করবেন—'

কিন-ফো রেগে ছড়িটা ছুঁড়ে ফেলে দিতেই সুনের মুখ একেবারে ফ্যাকাশে হ'য়ে গেলো।

'বল, কেন তুই পিট্টি খেতে চাচ্ছিস? কী করেছিস তুই—এক্ষুনি বল—'

সুনের যেন দম ফুরিয়ে গেছে। 'এই চিঠিটা—'

'চিঠি তো বুঝলাম, কিন্তু হয়েছে কী,'—ব'লে কিন-ফো তার হাত থেকে চিঠিটা ছিনিয়ে নিলো।

'মনেই ছিলো না এটার কথা। কোয়াংতুং যাবার আগে আপনাকে এটা দেবার কথা ভুলে গিয়েছিলুম।'

'এক সপ্তাহ আগে এসেছে। তবে রে বেআক্কেলে—আয়, এদিকে আয়!'

সুন প্রায় কেঁদেই ফ্যালে। 'আমি তো একটা কাঁকড়া মাত্র—তায় আবার একটাও দাঁড়া নেই!'

'আর বলছি!' কিন-কো প্রচণ্ড ধমক দেয়।

'আই-আই-ইয়া!' সুন কেঁদে ক্যালে।

এই 'আই-আই-ইয়া' হ'লো চরম হতাশার অভিব্যক্তি! কিন-কো ততক্ষণে বেচারি সুনের বেণী টেনে ধরেছে, এবার পাশ থে.ক একটা ছোট্ট কাঁচি তুলে নিয়ে কচ ক'রে বেণীর ডগা কেটে ফেললো।

কাঁকড়াটি অবশ্যি পরক্ষণেই তার দাঁড়া দিয়ে গালিচার উপর থেকে চুলের গোছা তুলে নিয়ে ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। তেইশ ইঞ্চি ছিলো বেণীটা এ-ঘরে ঢোকবার আগে—হায়রে, আর মাত্র বাইশ ইঞ্চি রইলো!

আবার কৌচে এলিয়ে পড়লো কিন কো। সুন চ'লে যেতেই তার সব উত্তেজনা কেটে গেছে। সুনের দায়িত্বহীনতায় বড্ড চ'টে গিয়েছিলো সে, চিঠিটা সম্বন্ধে এমনিতে তার কোনো কৌতূহলই ছিলো না। কোনো চিঠি নিয়ে বিচলিত হবার আবার কী আছে?

আবার ঢুলুনি এলো তার, চেষ্টা ক'রে চোখ খুলে আনমনাভাবে সে হাতের লেফাফাটার দিকে তাকালো একবার। বড্ড পুরু ঠেকছে খামটা, টিকিটের রঙ লাল আর বাদামি দুই আর ছয় সেণ্ট ক'রে দাম, মার্কিন চিঠি, বোঝা যাচ্ছে।

'লিখেছে নিশ্চয়ই আমার সান ফ্রান্সিসকোর সংবাদদাতা!' খামটা সে ছুঁড়ে ফেলে দিলে সোফার ওপাশে! 'হয়তো ক্যালিফরনিয়ার সেনট্রাল ব্যাঙ্কের শেয়ারের দর চড়েছে—লাভের অঙ্কটা হয়তো মোটা হয়েছে, তা-ই সে জানিয়েছে! তা হোক গে এতে আমার কিছু এসে-যায় না!' কিন্তু মনে-মনে এ-কথা ভাবলেও আপনা থেকেই একটু পরে হাতটা গিয়ে পড়লো আবার চিঠির উপর। খামটা খুলে নিয়ে প্রথমে সে নিচের দস্তখৎটা দেখে নিলে।

'যা ভেবেছিলুম!' আপন মনেই বললে সে, 'আমেরিকার এজেণ্টেরই চিঠি দেখছি! তা এ-চিঠি কাল পড়লেও চলবে।'

চিঠিটা আবার সে সরিয়ে রাখতে যাচ্ছিলো, কিন্তু এমন সময় হঠাৎ 'দারিদ্র্য' কথাটায় তার চোখ আটকে গেলো। দ্বিতীয় পাতার উপরে বড়ো-বড়ো ক'রে কথাটা লেখা—তলায় দাগ দিয়ে আরো জোর দেয়া হয়েছে কথাটায়, দেখে তার কৌতূহল অস্বাভাবিক রকম উশকে উঠলো: পুরো চিঠিটাই সে প'ড়ে ফেললে এবার। পড়তে-পড়তে একবার কেবল মুহূর্তের জন্য তার ভুরু কুঁচকে গিয়েছিলো, কিন্তু চিঠিটা শেষ করার আগেই তার ঠোঁটের ভাঁজে তাচ্ছিল্যের হাসি ফুটে উঠলো আবার।

সোফা থেকে উঠে সে গিয়ে টেলিফোনের সামনে দাঁড়ালো, ওয়াংকে টেলিফোনে ডাকবে ভেবে রীসিভার তুললো মুখের সামনে, কিন্তু পরক্ষণেই কী ভেবে আবার রীসিভার নামিয়ে রেখে ফিরে এসে শুয়ে পড়লো সোফায়। তারপর অত্যন্ত তাচ্ছিল্যের ভাবে নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে ব'লে উঠলো: 'ফুঃ!' পরক্ষণেই আবার বিড়বিড় ক'রে নিজের মনে বললে, 'আমার কাছে না-হয় এর কোনো দাম নেই – কিন্তু ওর কাছে? ওর কাছে তো এটা হেলাফেলার কিছু নয়।'

আবার সে উঠে পড়লো সোফা থেকে; ছোট্ট একটা গালার টেবিলের উপর চৌকোনো একটা বাক্স ছিলো কারুকাজ-করা – কাছে গিয়ে বাক্সটা খুলতে গিয়ে ও থেমে গেলো সে, নিজের মনেই বললো, 'শেষ চিঠিতে ও কী লিখেছিলো আমাকে?'

বাক্সের ডালা না-খুলে সে বরং তার পাশের একটা স্প্রিঙে চাপ দিলে, অমনি নারীকণ্ঠের মৃদু মর্মর শোনা গেলো ঘরের মধ্যে: 'ভাই আমার! কেমন লাগে তোমার আমাকে? প্রথমার চাঁদের মাইহোয়া ফুলের চেয়েও সুন্দর? দ্বিতীয়ার চাঁদের আলোয় ফুলে-ওঠা খুবানির চেয়েও মিষ্টি? তৃতীয়ার চাঁদের জ্যোৎস্নায় ঝলমল-করা পীচ ফলের চেয়েও মধুর? লাগে না কি? তোমার জন্যে দশ হাজার ভালোবাসা রইলো।'

'বেচারা!' দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললে কিন-ফো। বাক্সের ডালা খুলে কতগুলো ফুটকি-বসানো টিনের পাতটা তুলে ফেলে নতুন আরেকটা টিনের চাক্তি বসালে সে। এই বাণীমাধুরী বহন ক'রে এনেছে ফোনোগ্রাফ, যা কি না এডিসন সবেমাত্র এই সেদিন আবিষ্কার করেছেন।

এবার কিন-ফো নিজে এই রহস্যময় ছোট্ট কলটির উপর ঝুঁকে পড়লো। কথা বলতে গিয়ে সে যেন তখনো কিছুক্ষণ ধ'রে সেই স্বচ্ছ, নরম নারীকণ্ঠের মৃদু মর্মর শুনতে পাচ্ছিলো – কিন্তু তার চোখে-মুখে কোনো ভাবই ফুটলো না – না দুঃখের, না আনন্দের। কথা তার অল্পই ছিলো। কথা শেষ হ'তেই সে কলটা থামিয়ে দিলে; তারপর তুলে নিলে সেই সেই টিনের চাক্তি, যার উপর ছোট্ট একটা সূঁচ তার কথা গেঁথে রেখে গেছে; চাক্তিটা একটা খামে পুরে সে ডানদিক থেকে বামে ঠিকানা লিখলো:

মাদাম লা-ও

চা-কোআ অ্যাভিনিউ

পিকিং

বৈদ্যুতিক ঘণ্টায় চাপ দিতে-না-দিতেই একটি ভৃত্য এসে ঘরে ঢুকলো ; তক্ষুনি কিন-কো তার চিঠি ডাকঘরে পাঠিয়ে দিলে !

ঘণ্টাখানেক কেটে গেলো। আবার গিয়ে শুয়ে পড়লো কিন-কো ; বেতের তৈরি চু-ফু-দজন বা ঠাণ্ডা বালিশে হাত রেখে শুয়ে পড়তেই চট ক'রে ঘুমিয়ে পড়লো সে।

৫

দুঃসংবাদ

'এখনো আমার কোনো চিঠি আসেনি, বুড়ি-মা ?'

'না, মাদাম, এখনো তো এলো না।'

পিকিং-এর চা-কোআ অ্যাভিনিউতে নিজের ঘরে ব'সে সেদিন অন্তত দশবার এই প্রশ্ন করেছে সুন্দরী লা-ও, আর তার বুড়ি দাসী নান তাকে প্রতিবারই এই উত্তর দিয়েছে. নান তার দাসী হ'লে কী হয়, লা-ও তাকে চিনে প্রথা অনুযায়ী 'বুড়ি-মা' ব'লে ডাকে।

লা-ওর বয়স যখন ছিলো আঠারো, তখন ডবল বয়সী এক পণ্ডিতের সঙ্গে তার বিয়ে হয়েছিলো, সে-কো-ৎসোয়ান-চো নামে এক কোষগ্রন্থ সংকলন করছিলেন তিনি, বিয়ের তিন বছর পরেই তাঁর যখন মৃত্যু হ'লো, লা-ও একেবারে একা হ'য়ে পড়লো।

তার কিছুদিন পরেই কী-জন্য যেন কিন-কো এসেছিলো পিকিংএ ; ওয়াং-এর সঙ্গে তরুণী লা-ওর আলাপ ছিলো আগেই, এবার তার বন্ধু ও ছাত্রের সঙ্গে লা-ওর পরিচয় করিয়ে দিলে সে ; ভালো লাগলে তাকে বিয়েও করতে পারে, এই কথাও বললে সে তার ছাত্রকে। কিন-কোর তাতে কোনো দ্বিরুক্তি বা অসম্মতি দেখা গেলো না ; তরুণীটিরও যে এতে বিশেষ অনীহা ছিলো, তাও নয় ; ফলে অচিরেই, দার্শনিকের ঘটকালির দরুন, ঠিক হ'লো যে পিকিং থেকে ফিরে কিন-কো শাংহাইতে যথোচিত ব্যবস্থা করলে পর ধুমধাম ক'রে বিয়েটা হ'য়ে যাবে।

চিন সাম্রাজ্যে বিধবাবিবাহ খুব-একটা হয় না ; এমন নয় যে বিধবাদের বিয়ে-করার ইচ্ছে থাকে না, বরং লোকেই সহজে বিধবাবিবাহে রাজি রাজি হয় না। কিন-কো অবশ্য সেই গড্ডলিকাপ্রবাহের অন্তর্ভুক্ত নয়—তাই

এই সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটাতে তার একটুও দ্বিধা দেখা গেলো না। লা-ও শুধু বুদ্ধিমতীই নয়, উচ্চশিক্ষিতাও; এই-যে যুবকটি তার স্বামী হ'তে চলেছে, কোনো-কিছুতেই যার আগ্রহ নেই, বা রুচি নেই, তাকে কী ক'রে সুখী করবে এটাই তার এখন একমাত্র ভাবনা।

পুনর্বিবাহের ফলে অবশ্য সাধ্বীদের সম্মতি তার হবে না: স্বামীর মৃত্যুর পরে যারা মৃতস্বামীর স্মৃতি বুকে ক'রে দুঃখে-কষ্টে সারা জীবন কাটিয়ে দেয়, সম্রাটেরা মাঝে-মাঝে চিনদেশে তার নামে 'পাই-লু' বা স্মৃতিস্তম্ভ রচনা ক'রে দেন। স্বামীর মৃত্যুর পর সুং তার স্বামীর সমাধি ছেড়ে মুহূর্তের জন্যও নড়েনি ব'লে তার নামে এ-রকম এক স্মৃতিফলক রচনা করা হয়েছিলো; কুং-কিয়াং নামে আরেকজন স্ত্রীলোক তাঁর দুঃখের প্রতীক হিশেবে হাত কেটে ফেলে ছিলো; ইয়েন-ৎচিয়াং নামে আরেকজন আরো গভীরভাবে ক্ষতবিক্ষত করেছিলো নিজেকে—তাদেরও সম্রাটের বদান্যতা কখনো ভোলেনি। লা-ও অবশ্য এই স্মৃতিস্তম্ভের লোভ ত্যাগ ক'রেই পুনর্বিবাহে সম্মতি দিয়েছে। পণ্ডিত স্বামীর মৃত্যুর পর তার যে খুব স্বচ্ছল দিন চলে তা নয়—তবে কোনো কষ্ট হয় না, অনায়াসেই দিন কেটে যায়। চা-কোআ অ্যাভিনিউর বাড়িটা তেমন জমকালো নয়, বুড়ি নান ছাড়া আর-কোনো দাস-দাসীও নেই। এই তরুণী বিধবার প্রিয় ঘর হ'লো যে-ঘরে ব'সে সে সাজগোজ করে। দু মাস আগেও এ-ঘরের আশবাবপত্র ছিলো নিতান্তই সাদাসিদে—কিন্তু গত দু মাস ধ'রে শাংহাই থেকে রোজ দামি-দামি উপহার আসছে। সম্প্রতি এসেছে প্রাচীন চৈনিক চিত্রকলার কতকগুলি ঝলমলে নিদর্শন, দেয়ালে টাঙিয়েছে লা-ও সে-সব, তাদের মধ্যে একটা ছবি হ'লো ওয়ান-ৎসে-নেন-এর—চিত্রশিল্পের যে-কোনো সমঝদারই এই প্রাচীন শিল্পীর তুলির টান ও রঙের পোঁচ দেখে মুগ্ধ না-হ'য়ে পারবে না। আধুনিক চৈনিক চিত্রকলায় যে সবুজ ঘোড়া, বেগনি কুকুর, উজ্জ্বল নীল গাছের বিশ্রী ছড়াছড়ি, ওয়ান-ৎসে নেন-এর যাবতীয় চিত্রকর্মেই তার সুস্নিগ্ধ বিরোধিতা। পাশেই গালার টেবিলে মস্ত প্রজাপতির পাখার মতো প'ড়ে আছে সোয়াটোর শিল্পবিদ্যালয়ের শৌখিন হাতপাখা। পোর্সেলেনের ফুলদানি ভরা আরব্য কাগজের ফুল: কাছে থেকে খুঁটিয়ে দেখলেই বোঝা যায় যে এ-সব জাপানি লিলি বা চন্দ্রমল্লিকা নয়; জানলায় ঝুলছে বেতের পরদা যার ফলে ঘরের মধ্যে বেশি গরম ঢুকতে পায় না; এমনি আরো-কত ছোটোখাটো শৌখিন জিনিশের মধ্যে যে প্রবাসী প্রেমিকের ভালোবাসার ছাপ লুকিয়ে আছে, তার কোনো ইয়ত্তা নেই।

লা-ও কেবল লাবণ্যময়ীই নয়, সুন্দরীও—তার রূপের প্রতিভাস এমনকি ইওরোপীয়দেরও মুগ্ধ করবে। গাত্রবর্ণ স্নিগ্ধ গৌর, মোঙ্গোলদের মতো পীতবর্ণ নয়, কালো তার চোখের পাতা, দীর্ঘ, ঘন, কালো তার চুল, সবুজ পাথর বসানো চুলের কাঁটা দিয়ে পীচ-ফুল গোঁজা খোঁপায়, মুক্তোর মতো শাদা ছোটো ছোটো দাঁত, তুলির সূক্ষ্ম টানে চাইনিজ ইঙ্ক দিয়ে আঁকা যেন তার ভুরু। কোনো প্রসাধন সে ব্যবহার করে না—এমনকি মধু-মেশানো এস্পানি পাউডার পর্যন্ত না, রঙ মেখে আরক্ত করে না অধর, চোখে সুর্মা দিয়ে দীঘল করে না কখনো, গালে-চিবুকে কোথাও ব্যবহার করে না রুজ, চিনদেশে যার জন্য কি না বছরে দশ মিলিয়ন দাপেক খরচ হয়। লা-ওর কোনো সম্বন্ধই নেই প্রসাধনের সঙ্গে। কচিৎ যখন বাড়ি থেকে বেড়াতে বেরোয়, তখন প্রসাধনের কথা সে ভাবেই না একেবারে, কারণ সে জানে যে এতে তার কিছু এসে যায় না - চিনে মহিলারা যেমন লোকসমক্ষে বেরোবার সময় নিজেদের নানাভাবে জাহির করতে চান, লা-ও কখনোই সেই গড্ডলিকা প্রবাহে ভাসতে চায়নি।

পোশাকও তার খুব সাদাসিধে—কিন্তু রুচি ও আভিজাত্যের ছাপ থেকে যায় যেন কোথায়। কুচি-দেয়া ঘাঘরার উপরে লম্বা জামা পরে সে, চারপাশে লেসের কাজ করা, কোমরে জড়ায় জরির ফিতে, খাটো পাজামার নিচে পরে নানকিং রেশমের পাৎলা মোজা, দামি পাথর আর মুক্তো বসানো স্যাণ্ডাল থাকে পায়ে। নরম স্পর্শভীরু তার হাত দুটি, গোলাপি নখের উপর থাকে রুপোর ছোট্ট অঙ্গুলিত্রাণ।

পা দুটি তার স্বভাবতই ছোটো। চিনদেশে অবশ্য সাত শতাব্দী ধ'রে মেয়েদের পায়ের আকার সুন্দর ক'রে তোলবার জন্য একটা বর্বর প্রথা চ'লে আসছে: কোনো রাজকন্যা হয়তো একদা খুঁড়িয়ে হাঁটতো আর তার অসুখ সারাবার জন্য হয়তো প্রথম এই উপায় প্রয়োগ করা হয়—কিন্তু পরে বোধহয় কতিপয় অত্যুৎসাহী পতিদেবতার জন্য এটা একটা প্রথায় দাঁড়িয়ে যায়, পদ্ধতিটা খুবই সহজ: পায়ের পাতা ভাঁজ ক'রে পট্টি বেঁধে রাখতে হয়, যাতে গোড়ালিতে কখনো চাপ পড়ে না, কিন্তু এর ফল হয় বিষম ক্ষতিকর, কারণ শেষটায় এমনকি হাঁটা-চলার ক্ষমতাও চ'লে যায়; এই প্রথা অবিশ্যি ক্রমেই উঠে যাচ্ছে. আজকাল হয়তো প্রতি দশজনে মাত্র তিনজন চিনেরমণী দেখা যাবে, ছেলেবেলায় যাদের এই ভীষণ সৌন্দর্যচর্চার বলি হ'তে হয়েছিলো।

'যাও না, বুড়ি-মা, আবার গিয়ে দেখে এসো,' আরেকবার বললে লা-ও।

নান বললে, 'কী হবে গিয়ে?'

'সে-কথা তোমায় ভাবতে হবে না। তোমাকে যা বলছি তা-ই করো। গিয়ে খোঁজ ক'রে এসো একবার: আমি ঠিক জানি আজ আমার নামে একটা চিঠি আসবে।'

বুড়ি নান গজ-গজ করতে করতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

সময় কাটাবার জন্ত লা-ও একটা সেলাই তুলে নিলে হাতে: কিন-সোর জন্ত সম্প্রতি একটা কাজ-করা চটি বানাচ্ছে সে। চিনদেশে সবাই সেলাই জানে, কাপড়ের উপর সুন্দর কাজ তুলতে পারে। কিন্তু একটু পরেই আবার সে কাজটা নামিয়ে রাখলো। উঠে গিয়ে ছোট্ট একটা বনবনের বাক্স থেকে কয়েকটা তরমুজের বিচি বের ক'রে নিয়ে তার ছোটো দাঁতে খুঁটতে লাগলো। তাও যখন ভালো লাগলো না, হাতে তুলে নিয়ে একটি বই, বিবাহেচ্ছু তরুণীদের প্রতি নানা নির্দেশ আছে বইটিতে, নাম 'গুঞ্জন'। অগ্রমনস্কভাবে উপদেশগুলোর উপর চোখ বুলিয়ে গেলো সে: 'বসন্তের মতো উষাকালই হচ্ছে কাজ করার সেরা সময়। রাত থাকতেই উঠবে ঘুম থেকে, শুয়ে কাটালে চলবে না।... তুঁতগাছ, শনখেত – সব কিছুরই যত্ন নেবে।...নিজের কাপড় বুনতে ভুলবে না – তা সে সুতিই হোক আর রেশমেরই হোক।...স্ত্রীলোকের প্রধান গুণ হ'লো পরিশ্রম ও মিতব্যয়িতা।'

কিন্তু পড়তেও আর ভালো লাগলো না, কতগুলো হরফই কেবল চোখে পড়ছে তার – মন প'ড়ে আছে অন্তখানে, বইটা ছুঁড়ে ফেলে দিলো সে।

'কোথায় আছে ও এখন?' নিজের সঙ্গেই সে বলাবলি করতে লাগলো, 'নিশ্চয়ই কোয়াংতুং থেকে ফিরে এসেছে এতক্ষণে, কবে আসবে ও এখানে? কোয়ানাইন, কোয়ানাইন – তুমি ওর চলাফেরায় দৃষ্টি রেখো – দেখো, যেন ও কোনো বিপদে না-পড়ে।'

কলের পুতুলের মতো তার চোখ গিয়ে পড়লো একটা টেবিলঢাকার উপর; মোজেইক-এর মতো টুকরো-টুকরো কাপড়ের টুকরো দিয়ে তৈরি টেবিল-ঢাকাটা, আর তার উপরে এক বাচ্চাকাচ্চা-সমেত রাজহাঁস আঁকা: পাতিব্রত্যের প্রতীক এই ছবি।

একটা ফুলদানির কাছে গিয়ে দাঁড়ালো সে – চোখ বুজে ফুলদানি থেকে একটা তোড়া তুলে নিলো।

'হায়রে!' ভাঙা গলায় সে ব'লে উঠলো, 'ভাগ্য দেখছি বিরূপ আমার প্রতি! উইলোর ফুল তোলা উচিত ছিলো আমার; বসন্তের প্রতীক; তার

বললে কিনা হাতে উঠে এলো হলদে চন্দ্রমল্লিকা : হেমন্তের ইঙ্গিত — বিদায়ের, অবসানের প্রতীক !'

এই অনুক্ষণে ইঙ্গিতটা সে ভুলে যেতে চাইলো ব'লেই তার ছোট্ট সারেঙিটা তুলে নিয়ে 'পাণিগ্রহণের গান' বাজাতে শুরু করলে, কিন্তু গানের বাণী গলায় এলো না ঠিক মতো : আর চেষ্টা না-ক'রে সারেঙিটা সে নামিয়ে রাখলে।

আবার বললে আপন মনে, 'এমন তো কখনো হয় না — কোনো দিনই তো ওর চিঠি আসতে এত দেরি হয় না। কী সুন্দর ওর চিঠিগুলো — কী মিষ্টি, ও যা লিখে পাঠায় শুধু যে তাই, তা নয়, ওর কথাগুলোও কী মিষ্টি, আর বারে-বারে শোনা যায় সেই গলা,' - আপনা থেকেই তার চোখ গিয়ে পড়লো কিন-কোর গ্রামোফোনের উপর। পাশের টেবিলে বসানো চৌকো বাক্সটাই লা-ওর গ্রামোফোন, শাংহাইতে কিন-কো যা ব্যবহার করেছিলো ঠিক তারই মতো দেখতে। এর ফলে বারে বারে পরস্পরের গলা শুনতে পারে তারা। কিন্তু কয়েকদিন ধ'রে হায়রে লা-ওর গ্রামোফোন কোনো কথা বলছে না — চুপ ক'রে প'ড়ে আছে।

বুড়ি নান এসে ঢুকলো ঘরে।

'এই নাও তোমার চিঠি,' ব'লে সে যেমন দুমদাম ক'রে এসেছিলো, তেমনি দুমদাম ক'রে চ'লে গেলো।

খামটার উপর শাংহাই-র ডাকঘরের ছাপ, কিন্তু বাইরেটা তাকিয়ে দেখার তর সইছে না তখন লা-ওর, ঝলমলে মুখে স্মিত হেসে সে খামের মুখটা ছিঁড়ে নিলে, সাধারণ কোনো চিঠি বেরোলো না খাম থেকে, ফুটকি বসানো গোল একটা টিনের চাকতি বেরিয়ে এলো শুধু - গ্রামোফোনে চাপিয়ে না-দিলে এই ফুটকিগুলো এইভাবেই বোবা আর স্তব্ধ হ'য়েই থাকবে, আর ততক্ষণ সেই আশ্চর্যসুন্দর ঈষৎবিষণ্ণ স্নিগ্ধ কণ্ঠস্বর শোনা যাবে না কিছুতেই।

'চিঠি তো নয়, চিঠির চেয়েও বেশি!' লা-ও প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো যেন, 'ওকে কথা বলতে শুনতে পাবো আমি —'

অসীম যত্নের সঙ্গে সন্তর্পণে ওই চাকতিটা বসিয়ে দিলো গ্রামোফোনের চাকতিতে, তারপর যেই ওটা ঘুরতে শোনা গেলো, অমনি ঘরের মধ্যে ঝমঝম ক'রে উঠলো তার প্রেমিকের কণ্ঠস্বর :

'লা-ও, বোন আমার! আমার শেষ কপর্দকটুকু পর্যন্ত হারিয়ে গেছে চিরকালের মতো, একেবারে নিঃস্ব হ'য়ে পড়েছি আমি এখন : হেমন্তের হাওয়ায় যেমন ক'রে ঝরা পাতা উড়ে যায়, তেমনি আজ আমার সর্বস্ব হারিয়ে

গিয়েছে। আবার দুঃখের, আবার রুক্ষতার সাথী আমি করতে পারি না তোমাকে। ভুলে যাও তুমি, চিরতরে ভুলে যাও যে হতভাগ্য আর হতাশ একজনকে তুমি জানতে, যার নাম ছিলো : কিন-কো।'

হায়রে, তার সব প্রত্যাশায় এ কী মর্মান্তিক আঘাত এসে লাগলো! আকুল হ'য়ে কেঁদে উঠলো তার হৃদয় : তীব্র-এক বেদনায় ভ'রে গেলো তার পেয়ালা, কী তিক্ত ও বিষাক্ত এই বেদনা! তবে কি কিন-কো তাকে ত্যাগ করলো? তবে কি সে ভেবেছিলো যে শুধু ঐশ্বর্যেই মুগ্ধ হবে লা-ও—ঐশ্বর্যেই সুখী হবে, তৃপ্তি পাবে! সুতো-ছিঁড়ে-যাওয়া ঘুড়ির মতো আস্তে ঘুরে-ঘুরে মাটিতে নেমে এলো লা-ও!

নানকে ডাকা হ'লো তক্ষুনি। কিন্তু নান এলো ধীরে-সুস্থে হেলেদুলে। এসে, তার দশা দেখে, বিরক্তি ও হতাশা ভরে কাঁধ ঝাঁকালো শুধু একবার, তার পর বাড়ির কর্ত্রীকে ধরাধরি ক'রে তার 'হাং'-এ শুইয়ে দিলো। কৃত্রিম উপায়ে গরম-করা বিছানাকেই 'হাং' বলে চিনেরা। কিন্তু লা-ওর কাছে সেই উষ্ণ কোমল শয্যা ঠেকলো কনকনে পাষাণশয্যার মতো—সেই রাত্রির দীর্ঘ পাঁচটি প্রহর কাটালো বিধুর, করুণ ও তন্দ্রাহীন।

৬

বীমা-কম্পানি সেন্টেনারিয়ান

পরেরদিন সকালবেলায় কিন-কো একাই বাড়ি থেকে বেরিয়ে পড়লো। জীবন সম্বন্ধে তার আগ্রহহীনতার কিন্তু মোটেই কোনো ব্যত্যয় হয়নি। তার বাড়ি থেকে বেরিয়ে নদীর ডান তীর ধ'রে খানিকটা গেলেই পড়ে একটা কাঠের সাঁকো—মার্কিন আর ইংরেজ বসতির মধ্যে এই সাঁকোটাই যোগাযোগ রক্ষা ক'রে আছে। সাঁকো পেরিয়ে গিয়ে মিশন চার্চ, আর তার খানিক পরেই মার্কিন দূতাবাস; কিন-কো মিশন চার্চ পেরিয়ে গিয়ে একটা সুন্দর বাড়িতে ঢুকে পড়লো—মার্কিন দূতাবাস অবধি আর গেলো না।

বাড়িটির ফটকেই মস্ত পিতল ফলকে লেখা :

দি সেন্টেনারিয়ান
কাম্বার অ্যাণ্ড লাইফ ইন্সিওরেন্স কম্পানি
মূলধন : ২০,০০০,০০০ ডলার
প্রধান প্রতিনিধি : উইলিয়ম. জে. বিডুল্‌ফ

কোথাও না-থেমে কিন-কো সোজা বারান্দা পেরিয়ে একটা হলঘরে গিয়ে ঢুকলো, তারপর সেখান থেকে ভিতরের আরেকটা ঘরের স্প্রিং দরজা খুলে সোজা একটা আপিশঘরে ঢুকে পড়লো ; ছোটো গিয়ে-বসানো পাড়া একটা বুক সমান উঁচু রেলিং দিয়ে আপিশটা দুটো ঘরে ভাগ করা। কতগুলো বাক্স, মোটা ধাতুনির্মিত আংটা লাগানো কতগুলো মস্ত সিন্দুকের বাক্স, একটা মার্কিন সিন্দুক, দুটো-তিনটে টেবিলে কর্মরত কয়েকজন কেরানি, আর স্বয়ং উইলিঅম জে. বিডুল্ফের জন্ম অজস্র খুপরি আর দেরাজওলা একটা টেবিল— এইসব আসবাব দিয়েই ঘরটা সাজানো, দেখে ঠিক দূর প্রাচ্যের কোনো প্রতিষ্ঠান ব'লে মনে হয় না, বরং নিউ ইয়র্কের ব্রডওয়ে হ'লে বোধহয় আরো মানাতো।

উইলিঅম জে. বিডুল্ফ একটা নামজাদা আগুন ও জীবনবীমা কম্পানির সমগ্র চিনদেশের প্রধান প্রতিনিধি - কম্পানির হেড অপিশ হচ্ছে শিকাগোয়। সেন্টেনারিয়ান-শতবর্ষ যাদের পরমায়ু কম্পানির নামটা এমন লাগসই হয়েছে যে জনপ্রিয়তার বুঝি সেটাই সবচেয়ে বড়ো কারণ। জগতের সব দেশেই এই কম্পানির প্রতিনিধি ও শাখা রয়েছে—আর কম্পানির বিধিসংহিতা অত্যন্ত উদার ও উদ্দীপক ব'লে ব্যাবসা ক্রমশ ফেঁপেই উঠছে। এমনকি চিনেম্যানরা অবধি এই আধুনিক ব্যাবস্থায় বিশ্বাসী হ'য়ে উঠেছে, যার ফলে এই ধরনের বহু কম্পানি আজকাল ক'রে খাচ্ছে। আগুনের হাত থেকে বাঁচাবার জন্ম অনেকেই বাড়ি-বীমা ক'রে ফেলেছে এর মধ্যে, জীবনবীমাও আজকাল নেহাৎ কম হচ্ছে না সেন্টেনারিয়ানের প্রতীকচিহ্ন যে-টালটি, হরদম আজকাল আশপাশের বাড়ির গায়ে তা চোখে পড়ে—এমনকি কিন-কোর মতো বড়োলোকের পাড়ার ইয়ামেনগুলোতেও প্রায়ই ওই ছোট্ট প্রতীকচিহ্নটি দেখা যায়। অগ্নিবীমা সংক্রান্ত যাবতীয় কর্ম বহু আগেই সম্পন্ন করেছিলো কিন-কো, কাজেই আজ নিশ্চই সে যে আপিশে এসে উইলিঅম জে. বিডুল্ফের খোঁজ করছে, তা নিশ্চয়ই ওজন্তে নয়।

বিডুল্ফ ভিতরেই ছিলেন এখানে দিন-রাত্রি ফোটো তোলা হয়, এই বিজ্ঞপ্তি আঁটা দোকানের ফোটোগ্রাফারের মতো চব্বিশ ঘণ্টাই তিনি লোকের সাহায্য করার জন্ত প্রস্তুত হ'য়ে আছেন। বয়েস বোধহয় পঞ্চাশ হবে তাঁর, মার্কিন কেতার দাড়ি-গোঁফমণ্ডিত মুখমণ্ডল ; পরনে নিখুঁত মিশকালো পোশাক, গলায় ধবধবে শাদা গলবন্ধ। বিনীতভাবে তিনি জিগেশ করলেন, 'জানতে পারি কি কার সঙ্গে কথা বলার সৌভাগ্য অর্জন করলাম?'

উত্তরে হ'লো, 'একেবারে অচেনা বোধ করি নই। আমি শাংহাই-র কিন-কো।'

'আরে! তাই তো! সত্যি তো! শাংহাইর মিস্টার কিন-কো— আমাদেরই তো মক্কেল। পলিসি নাম্বার ২৭,২০০। যদি আপনার আরো-কোনো কাজে লাগতে পারি তো নিজেকে ধন্য মনে করবো—'

'ধন্যবাদ,' কিন-কো বললো, 'আপনার সঙ্গে গোপনে দু-একটি কথা আছে।'

'গোপনে? নিশ্চয়ই, আসুন—'

তক্ষুনি মক্কেলকে ভারি দরজাওলা পরদাঢাকা একটা ঘরে নিয়ে যাওয়া হ'লো: এখানে ব'সে কেউ যদি রাজদ্রোহের শলাপরামর্শও করে তবু কারু সে-কথা শোনবার উপায় নেই, এমনকি সবচেয়ে ধূর্ত 'ড-পাও'কেও এখানে আড়ি পাততে গিয়ে ব্যর্থ হ'তে হবে। কিন কো ইংরেজি জানে, বিড়ুলফের চিনে ভাষা রপ্ত আছে: ফলে কথা বলতে গিয়ে কোনো অসুবিধেতেই পড়তে হ'লো না তাদের।

বিড়ুলফের ইঙ্গিতে গ্যাসচুল্লির ধারে পাতা মস্ত একটা দোলনা চেয়ারে গিয়ে বসলো কিন-কো—আর তক্ষুনি কাজের কথা পাড়লো।

'এক্ষুনি আমি সেন্টেনারিয়ানে একটি জীবনবীমা করতে চাই।'

'আপনার কাজে লাগতে পেরে খুবই খুশি হলুম। যৎসামান্য যা প্রাথমিক কাজ আছে তা এক্ষুনি চুকে যাবে—তারপর কেবল পলিসিতে আমাদের দুজনকে দস্তখৎ করতে হবে। আশা করি আপনি অনেক দিন বেঁচে থাকতে চান।'

'অনেক দিন বেঁচে থাকতে চাই? তার মানে?' কিন-কো বাধা দিয়ে ব'লে উঠলো, 'আমার ধারণা ছিলো লোকে হঠাৎ একদিন অল্প বয়েসে ম'রে যেতে পারে এই ভয়েই জীবনবীমা ক'রে থাকে।'

'না, না, ঠিক তার উলটো, আমাদের কম্পানিতে জীবনবীমা করার মানে হ'লো নতুন পরমায়ু পাওয়া: আমাদের মক্কেলরা একশো বছর বাঁচতে বাধ্য। শতবর্ষ পরমায়ু পাওয়ার সবচেয়ে বড়ো গ্যারান্টিই হ'লো সেন্টেনারিয়ানে জীবন-বীমা করা।'

বিড়ুলফের কথাগুলো ঠাট্টা কিনা বোঝবার জন্য কিন-কো মুখ তুলে তাকালো তার দিকে: কিন্তু না, জজসাহেবের মতোই গম্ভীর আর গাম্ভীর্যময় বিড়ুলফ। তার মুখ-চোখের ভঙ্গি দেখে প্রচুর সন্তোষ লাভ ক'রে কিন-কো

আবার কাজের কথায় এলো: 'আমি দু লক্ষ ডলারের জীবনবীমা করতে চাই।'

এত বড়ো অঙ্কের জীবনবীমা এর আগে কেউ করেনি, কিন্তু এ-কথা শুনে বিভুলকের মুখের ভাবে বিন্দুমাত্র চাঞ্চল্য বা পরিবর্তন দেখা গেলো না। একটুও অবাক না-হ'য়ে বিভুলক 'দু-লক্ষ ডলার' কথাটা পুনরাবৃত্তি ক'রে নির্বিকারভাবে তাঁর নোটবইতে টুকে নিলেন।

'কত ক'রে প্রিমিয়াম দিতে হবে এই জন্য?' কিন-কো জিগেশ করলো।

বিভুলক একটু ভাবলেন, একটু ইতস্তত ক'রে শেষে ব'লেই ফেললেন তিনি: 'এটা জানেন নিশ্চয়ই যে আপনি যাদের এই বীমায় ওয়ারিশান ক'রে যাবেন, তাদের হাতে আপনার মৃত্যু হ'লে তারা এই প্রিমিয়াম থেকে এক কানাকড়িও ফিরে পাবে না।'

'হ্যাঁ, তা আমার জানা আছে।'

বিভুলক আবারও জিগেশ করলেন, 'জানতে পারি কি কী ধরনের বিপদের হাত থেকে বাঁচবার জন্য আপনি বীমা করতে চাচ্ছেন?'

'সব রকম বিপদের হাত থেকেই, বলা বাহুল্য,' তক্ষুনি জানালো কিন-কো।

'বেশ,' এবার বিভুলক ধীরে-ধীরে স্পষ্ট করলেন, 'চীন সাম্রাজ্যের বাইরে কি ভিতরে, জলে কিংবা স্থলে, দ্বন্দ্বযুদ্ধে কি আদালতের বিচারে কি রণক্ষেত্রে—যেখানেই মৃত্যুর সম্ভাবনা দেখা দিক না কেন, সবত্র সবাকছুর বিরুদ্ধে আমরা ইনশিওর ক'রে থাকি। কিন্তু আপনি তো বুঝতেই পারছেন এক্ষেত্রে প্রিমিয়ামের হার অত্যন্ত বেশি হ'য়ে থাকে—কারণ সব বিপদ তো আর সমান নয়—কোনো-কোনো ক্ষেত্রে বেশ চড়া প্রিমিয়াম দিতে হয়।'

'যা লাগবে তা-ই দেবো,' কিন-কো বললে, 'একটা আশঙ্কার কথা আপনার ওই ফর্দতে নেই, সেন্টেনারিয়ান আত্মহত্যার বিরুদ্ধেও ইনশিওর করে কিনা, তা আপনি বলেননি।'

'করে বৈকি, নিশ্চয়ই করে,' অত্যন্ত পরিতোষের সঙ্গে হাত কচলাতে-কচলাতে বিভুলক বললেন, 'আমাদের সবচেয়ে বেশি লাভ হয় ওতেই। আমাদের মক্কেলদের মধ্যে যাঁরা আত্মহত্যার বিরুদ্ধে ইনশিওর করেন, তারাই কিন্তু জগতে সবচেয়ে বেশি দিন বাঁচেন। তবু, আপনি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে এ-ক্ষেত্রে প্রিমিয়ামের হার অসম্ভব চড়া হ'য়ে থাকে।'

'প্রিমিয়ামের হার কোনো বাধাই নয়। জীবনবীমা করার বিশেষ কারণ আছে আমার। যা লাগবে তা-ই আমাকে দিতে হবে বৈকি।'

'বেশ, তাহ'লে তো ভালোই,' ব'লে বিভুলক তাঁর নোটবইতে আরো কতগুলি তথ্য টুকে নিলেন। 'আমার ভুল হ'লে শুধরে দেবেন: আপনি জলে-ডুবে-মরা, আত্মহত্যা, দ্বন্দ্বযুদ্ধে মৃত্যু—এ-সবের বিরুদ্ধে বীমা করতে চান—'

স্বভাববিরুদ্ধ অসহিষ্ণু ভঙ্গিতে কিন-কো বাধা দিলে, 'সব-কিছুর বিরুদ্ধে বীমা করতে চাই, সব-কিছুর বিরুদ্ধে!'

বিভুলক আবারও তার এই মহৎ উদ্দেশ্যের কথা শুনে সাধুবাদ জানালেন: 'বেশ। তাহ'লে তো কথাই নেই—'

'কত প্রিমিয়াম দিতে হবে, এটাই এবার বলুন।'

'আমাদের প্রিমিয়ামের হার একেবারে অঙ্ক ক'ষে নির্ভুলভাবে বের করা আছে। আমাদের কম্পানির গর্বই এটা যে হিশেবে আমাদের কোনো ভুল হয় না—কম্পানির শক্ত খুঁটিই এটা। আগের মতো গুপারসিয়োর তালিকার উপর আর নির্ভর করতে হয় না আমাদের।'

'গুপারসিয়ো? তা আবার কী?' কিন-কো কিঞ্চিৎ অধীর হ'লো।

'আপনি জানেন না?' বিভুলকের মুখে বিস্ময় ফুটে উঠলো, 'গুপারসিয়ো ছিলেন একজন নামজাদা নিবন্ধক—বীমার কিস্তির হার সম্বন্ধে মস্ত বিশেষজ্ঞ—অবশ্য অনেকদিন আগে জন্মেছিলেন তিনি—সত্যি বলতে, এখন আর বেঁচে নেই। তৎকালে বীমার কিস্তির হার সম্বন্ধে যে সুবিপুল সারণী বা নির্ঘণ্ট তিনি তৈরি করেছিলেন, ইওরোপের বিভিন্ন কম্পানিতে এখনো সেটাই ব্যবহৃত হয়। তখন লোকের পরমায়ু এখনকার চেয়ে অনেক কম ছিলো। আমরা কিন্তু এখন লোকের আয়ুর হার বেড়ে গেছে ধ'রে নিয়েই নতুন সারণী তৈরি করেছি—তার ফলে আমাদের মক্কেলরা অনেক বেশি সুবিধে পান, তাঁরা যে শুধু অনেক দিন বেঁচেই থাকেন তা নয়, তাঁদের প্রিমিয়ামও দিতে হয় অনেক কম।'

'আমাকে কী হারে প্রিমিয়াম দিতে হবে, সেটা বলতে বললে আপনাকে কি মুশকিলে ফেলা হবে?' সেন্টেনারিয়ানের তারিফ শুনতে-শুনতে কিন-কো বিরক্ত হ'য়ে উঠেছিলো: বিভুলক যে প্রশংসার পুনরাবৃত্তি না-ক'রেই তাকে সহজে মুক্তি দেবেন, এটা তার মনে হচ্ছিলো না।

'বীমার কিস্তির হার বলবার আগে আপনাকে একটু বিরক্ত করবো। আপনার এখন বয়স কত, সেটা একটু জানা দরকার।'

'একত্রিশ।' কিন-কো জানালে।

'একত্রিশ ?' বিভূলক্ তক্ষুণি জানালেন, 'একত্রিশ বছর বয়সে অন্য কম্পানিতে আপনাকে শতকরা ২'৮৩ হিসেবে প্রিমিয়াম দিতে হবে—কিন্তু সেন্টেনারিয়ানে লাগবে মাত্র ২'৭২ হিসেবে। দেখলেন তো, আমাদের কাছে এসে আপনার কত লাভ হ'লো। আচ্ছা দেখি: দু-লক্ষ ডলারের জন্য আপনাকে বার্ষিক ৫৪৪০ ডলার প্রিমিয়াম দিতে হবে।'

'কিন্তু তা নিশ্চয়ই ও-সব সাধারণ আশঙ্কার জন্য,'—কিন-ফো বাধা দিয়ে জিগেশ করলে।

'হ্যাঁ,' বিভূলক্ সায় দিলেন।

'কিন্তু সমস্ত আশঙ্কার বিরুদ্ধে, প্রতিটি বিপদের সম্ভাবনার বিরুদ্ধে, আত্মহত্যার আশঙ্কার বিরুদ্ধে, বীমা করলে কত পড়বে ?' কিন-ফো জানতে চাইলো।

'তা ঠিক—সেক্ষেত্রে প্রিমিয়ামের হার অন্য ' ব'লে বিভূলক্ তাঁর নোট-বইয়ের পাতা উলটে একেবারে শেষ পাতায় চ'লে গিয়ে এক ছাপা তালিকা বার করলেন। এক নজর চোখ বুলিয়ে নিয়ে তিনি মুখ তুলে আস্তে-আস্তে বললেন, 'এ-ক্ষেত্রে আমরা বোধহয় শতকরা পঁচিশ—এই হারের কমে পারবো না।'

'তার মানে বার্ষিক পঞ্চাশ হাজার ডলার প্রিমিয়াম দিতে হবে,' কিন-ফো বিশদ করতে চাইলো।

'ঠিক তাই।'

'কীভাবে দিতে হবে টাকাটা ?' মক্কেল জানতে চাইলো।

'বছরে একবারে থোক টাকাটাও দিতে পারেন, আবার ইচ্ছে করলে মাসিক কিস্তিতেও দিতে পারেন।'

'তাহ'লে প্রথম দু-মাসের প্রিমিয়াম হিসেবে কত টাকা দিতে হবে ?'

'আগাম দিলে দু-মাসের জন্য দিতে হবে ৮৩৩৩ ডলার। এখন—অর্থাৎ এপ্রিলের শেষে দিলে—৩০শে জুন তার মেয়াদ ফুরোবে।'

পকেট থেকে নোটের তাড়া বের ক'রে কিন-ফো তক্ষুনি সব চুকিয়ে দিতে চাইলো।

'একটু ক্ষমা করতে হবে,' বিভূলক্ বললেন 'পলিসি চালু করার আগে আরেকটা ছোট্ট ব্যাপারে একটু নিয়মরক্ষা ক'রে নিতে হবে।'

'তাই নাকি ? তা সেটা কী, শুনি।' কিন-ফো জিগেশ করলো।

'আমাদের ডাক্তার গিয়ে আপনাকে একবার পরীক্ষা ক'রে দেখবেন।

আপনার এমন-কোনো অসুখ আছে কি না যার ফলে হঠাৎ একদিন আপনি তুম ক'রে ম'রে যেতে পারেন, এ-বিষয়ে একটি বিস্তৃত প্রতিবেদন দিতে হবে তাঁকে।'

'কিন্তু,' কিন-ফো বাধা দিলো, 'আমি যখন যাবতীয়, অসুখবিসুখ, বিপদ-আপদ, দুর্ঘটনা, আত্মহত্যার বিরুদ্ধেই বীমা করছি, তখন এই ডাক্তারি পরীক্ষার প্রহসন আর কেন?'

বিডুল্‌ফ আকর্ণ হাসলেন। 'এমনও তো হ'তে পারে যে এখুনি আপনার হয়তো এমন-কোনো অসুখ রয়েছে যার ফলে দু-মাসেই আপনাকে অক্কা পেতে হ'লো—তখন তো আমাদের দু-লক্ষ ডলার ভাহা লোকশান দিতে হবে!'

'কিন্তু আত্মহত্যার সম্ভাবনাই যখন র'য়ে গেছে তখন অসুখ-বিসুখে আর বেশি কী ক্ষতি হবে,' কিন-ফো একেবারে নাছোড়বান্দা।

মক্কেলের হাতটি নিজের করতলে গ্রহণ ক'রে আস্তে চাপ দিয়ে বিডুল্‌ফ বললেন, 'আপনাকে কি আগেই বলিনি যে আমাদের কাছে যাঁরা আত্মহত্যার বিরুদ্ধে বীমা করেন, তাঁরাই সবচেয়ে বেশি দিন বাঁচেন? অবশ্য এই সঙ্গে আরেকটা তথ্যও আপনাকে জানাই: আমাদের এখানে বীমা করলে সেণ্টেনারিয়ান সবসময় গোপনে আপনার সব-কিছুতেই কড়া নজর রাখবে। তাছাড়া কিন-ফোর মতো মস্ত ধনী যে কোনোকালে আত্মহত্যার কথা ভাবতে পারেন, সেই সম্ভাবনা কি সুদূরপরাহত নয়?'

'কিংবা এমনও তো হ'তে পারে যে এ-কথাটা অত্যন্ত বেশি ক'রে ভাবছে ব'লেই জীবন-বীমা করার কথা উদিত হয়েছে তার মনে।' কিন ফো উত্তর দিলে।

'উঁহু, মোটেই তা নয়,' বিডুল্‌ফও পালটা জবাব দিলেন, 'সেণ্টেনারিয়ানে বীমা করার অর্থই হ'লো দীর্ঘজীবী হওয়া—শেষকালটা সুখে কাটানো।'

যুক্তিতর্কে বিডুল্‌ফকে যে কাৎ করা যাবে না, কিন-ফো তা স্পষ্ট বুঝতে পারলে।

বিডুল্‌ফ জিগেস করলেন, 'এই দু-লক্ষ ডলারের ওয়ারিশান কাকে ক'রে যাবেন আপনি?

'এ-কথাটাই আমি বলতে চাচ্ছিলুম,' কিন-ফো উত্তর দিলে, 'আমি চাই যে আমার মৃত্যুর পর আমার প্রিয় বন্ধু ওয়াং পাক পঞ্চাশ হাজার ডলার, বাকি দেড় লক্ষ ডলার পান পিকিং-এর মাদাম লা-ও।'

বিডুলফ তাঁর নোটবইতে নির্দেশগুলো টুকে নিলেন, তারপর জানতে চাইলেন মাদাম লা-ওর সঠিক বয়স এখন কত।

'মাদাম লা-ওর বয়স একুশ।' কিন-ফো জানালো।

বিডুলফের চোখের তারায় কৌতুক ঝলমল ক'রে উঠলো, 'এ-টাকা পেতে-পেতে তিনি থুরথুরে বুড়ি হ'য়ে যাবেন। আর আপনার বন্ধু ওয়াং—তাঁর বয়েস—'

'পঞ্চাশ—'

'আপনার দার্শনিক বন্ধুর হাতে এ টাকা পড়ার কোনো সম্ভাবনাই তো দেখছি না।'

'দেখাই যাবে,' কিন-ফো দীর্ঘশ্বাস ফেললো।

'আপনি যদি একশো বছর বাঁচেন, তাহ'লে এখন যার বয়েস পঞ্চাশ, সে আপনার মৃত্যুর পর টাকা পাবে ব'লে আশা ক'রে থাকলে বোকামি করবে।'

কিন-ফো কোনো কথা না-ব'লে ভদ্রতার যাবতীয় অভিব্যক্তি সমেত মাথা নুইয়ে তাঁকে অভিবাদন ক'রে আপিস থেকে বেরিয়ে এলো।

পরদিন সেন্টেনারিয়ানের ডাক্তার তাঁর বাড়ি এলেন। তিনি যে-প্রতিবেদন পাঠালেন কম্পানিকে, তার ভাষা ছিলো এই রকম 'শরীরের গঠন লোহার, পেশিগুলো যেন ইস্পাত, আর ফুশফুশ যেন অর্গানের হাপর।'

কাজেই কিন-ফোর বীমার আবেদনপত্র অগ্রাহ্য করার কোনো কারণই উঠলো না। যথাকালে পলিসিতে নামসই করলো তারা। লা-ও আর ওয়াং অবশ্য—বলাই বাহুল্য—এ সম্বন্ধে বিন্দুবিসর্গও জানতে পেলো না। পলিসিতে যে তাদেরই ওয়ারিশান করা হয়েছে, এ-কথা জানবার কোনো উপায় তাদের ছিলো না: কেবল যদি নানারকম জটিল ও অভাবিত পরিস্থিতি দেখা দেয়, তাহ'লেই হয়তো পরে কোনোদিন এ-সম্বন্ধে তারা জানতে পারবে।

৭

মৃত্যুর উদ্যোগ

ভবিষ্যৎকে গোলাপি দেখে জে. উইলিয়ম বিডুলফ যতই কেন না খুশি হ'য়ে উঠুন, সেন্টেনারিয়ানের সামনে যে অচিরেই দু-লক্ষ ডলার হারাবার বিষম ভয় খাঁড়ার মতো ঝুলছে তাতে কোনো সন্দেহই নেই। কিন-ফো যে

অবশেষে নিজের নিরুৎসুক জীবনে পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিতে চাচ্ছে, এ-বিষয়ে আর-কোনো ভুল নেই। এত ঐশ্বর্য থাকা সত্ত্বেও এতকাল যখন বেঁচে-থাকা সম্বন্ধে তার কোনো উৎসাহ বা মোহ ছিলো না, তখন এই ভীষণ দারিদ্র্যের মধ্যে জীবনকে টেনে লম্বা করার ইচ্ছে যে তার থাকবে না, অন্তত তা যে নেই, এটা তো অত্যন্ত স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে।

যে-চিঠিটা মন-এর জন্ত অনেক দেরি ক'রে তার হাতে এসে পড়েছিলো, তাতে এই সংবাদ ছিলো যে ক্যালিফরনিয়ার সেনট্রাল ব্যাঙ্ক হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই সমস্ত লেনদেন বন্ধ ক'রে দিয়েছে। অথচ কিন-ফো'র সব টাকাই ছিলো এই ব্যাঙ্কে; একেবারে খবি মহল থেকে সংগৃহীত এই সংবাদ: অচিরেই খবরের কাগজে এই নিয়ে তুমুল শোরগোল উত্থিত হবে। কিন-ফো যে নিঃস্ব ও সর্বস্বান্ত, এ-কথা তখন আর কারুই জানতে বাকি থাকবে না। ওই ব্যাঙ্কের বাইরে আর-কোথাও তার কোনো এক কপর্দকও নেই; শাংহাইর বাড়িটা অবশ্য বেচে দেয়া যায়, কিন্তু তাতে এমন টাকা পাওয়া যাবে না, যাতে তার পোশাতে পারে, যাতে তার কোনোক্রমে দিন গুজরান হয়। হাতে যৎসামান্ত যে-টাকা ছিলো, তাই দিয়েই বীমার কিস্তি দিয়েছে সে, অবশ্য তিয়েনৎসিন জাহাজ কম্পানিতে তার কিছু শেয়ার আছে—কিন্তু তাতে তার সমস্ত দায়-দায়িত্ব আদৌ মিটবে না।

এ-রকম পরিস্থিতি উত্থিত হ'লে কোনো ইংরেজ বা ফরাশি হয়তো চাকার-বাকরি করার কথা ভাবতো: পেটে খাবে না-হয়, তাতে আর কী! কিন্তু এ-সব ব্যাপারে ধনাঢ্য চিনেদের মতামত ভিন্ন: বরং, চাকরি-বাকরি করার চেয়ে, আত্মহত্যা করা ভালো; পরিত্রাণের এটাই সেরা উপায় ব'লে তাদের মনে হয়। অন্তত এক্ষেত্রে কিন-ফো যে সত্যিকার চিনেম্যান, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

এমনিতে চিনেদের সাহস বা বীরত্বের পরিচয় পাবার জো নেই; চাই-চাপা থাকে যেন তা; কিন্তু গোপনে তার বিকাশ হয় অদ্ভুতভাবে। মৃত্যুকে তারা যেন ধর্তব্যেই আনে না; এ-সম্বন্ধে তারা সম্পূর্ণ উদাসীন। অসুখ-বিসুখে তারা কখনো কাতর হয় না; মাথার উপর মৃত্যু ঝোলুল্যমান জেনেও কোনো শাবও ভয় পায় না—নির্ভীকভাবে জল্লাদের সম্মুখীন হয়। মৃত্যুদণ্ড দেখে-দেখে, অপরাধীদের অসহ্য নিগ্রহ ও নির্যাতন দেখে-দেখে, সব চিনেম্যানই যেন কোনো খেদ ছাড়াই মৃত্যুর মুখোমুখি হ'তে পারে।

কাজেই তাদের আলাপ-আলোচনায় কথায়-বার্তায় প্রায়ই যে মৃত্যুর কথা

ওঠে, তাতে অস্বাভাবিক কিছু নেই। এ-দেশে সবাই পূর্বপুরুষদের পুজো করে, সার্বজন ন প্রথা এটা, কুঁড়েঘর থেকে রাজপ্রাসাদ—সবখানেই অন্তত একটা ঠাকুরঘর থাকবেই—সেখানে বাড়ির মৃত পরিজনদের নানা স্মৃতিচিহ্ন জমানো থাকে, আর মৃতদের সম্মানে প্রতি বছর দ্বিতীয় মাসে একটা ক'রে উৎসবও হয়। নবজাতকের জন্য দোলনা আর বিয়ের পোশাক-আশাক যে-দোকানে বেচে, সেখানেই আবার পাওয়া যায় মৃতের জন্য কফিন: 'জন্ম মৃত্যু বিবাহ'—এক দোকানেই সব চাহিদা মিটে যায়। সত্যি বলতে আগে থেকেই কফিন কিনে রেখে দেয়া আধুনিক চিনে বেশ আভিজাত্যের লক্ষণ, কফিন না-থাকলে বাড়িঘর যেন ফাঁকা ঠেকে চিনেদের কাছে এমনকি কখনো আবার ছেলে তার বাবাকে শ্রদ্ধাভক্তির নিদর্শন রূপে কফিন কিনে উপহার দেয়, বাড়ির ঠাকুরঘরে রাখা হয় কফিনটা—বছর-বছর রং করা হয় কফিনটাকে, নানা রকম কারুকাজ করা হয় ওই মেহগিনির কাঠের গায়ে, আর কখনো আবার এমনও হয় যে নশ্বর দেহের জীর্ণাবশেষ সমেত আস্ত কফিনটাই গোর না দিয়ে ওই ঠাকুরঘরে সযত্নে রক্ষা করা হ'লো। এক কথায়, চিনেদের ধর্মভাবনার মূল ভিত্তিই হ'লো মৃতের প্রতি যথোচিত সম্মান প্রদর্শন: এটা বলতেই হয় যে তার ফলেই তাদের কুলগৌরবের ধারা ও সংগতি অব্যাহত থাকে।

কিন-ফো এমনিতে খুব ঠাণ্ডা, কিছুতেই উত্তেজিত হয় না, তাই একটুও কাতর না হ'য়েই সে অনায়াসে মৃত্যুর কথা ভাবতে পারে। কেবল যে-দুজনের প্রতি তার একটু স্নেহ ছিলো, তাদের জন্য তো টাকাকড়ির ব্যবস্থা ক'রেই দিলো এবার আর মরতে বাধা কোথায়? আত্মহত্যা করার কথা ভাবছে সে মনে-মনে, কিন্তু একবারও তার এটা মনে হচ্ছে না যে আত্মহত্যা করাটা অন্যায় বা অপরাধ ব'লে গণ্য হ'তে পারে—এই বোধই তার ছিলো না—বরং তার দৃঢ় বিশ্বাসই ছিলো এই-যে সে সম্পূর্ণ আইনসংগত কাজই করতে যাচ্ছে। এখন আর-কোনো দ্বিধা নেই তার মনে, সম্পূর্ণ মনস্থির ক'রে ফেলেছে সে: এখন আর কারু ক্ষমতা নেই—এমনকি ওয়াং-এরও না—তাকে এই সংকল্প থেকে টলায়। ওয়াং অবশ্য কোনো সন্দেহই করেনি যে কিন-ফোর মনে এই আছে—সুনও তার হুজুরের হাবভাবে এমন-কিছু লক্ষ করেনি যাতে প্রভুর পরিকল্পনা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আঁচ পেতে পারে—কেবল একটা বিষয়ে তার একটু খটকা লেগেছিলো: তার ঝুলচুলের জন্য কিন-ফো আজকাল আর তাকে মোটেই বকা-ঝকা করে না: মাঝে-মাঝে তার যে

বঙ্গুলি বা মারটার প্রাপ্য হয়নি তা নয়—তবু সব দোষ সত্বেও তার সাধের বরাহপুচ্ছ বা বেণীটি যে দিব্য বেঁচে যাচ্ছে—এতেই সে খুশি।

* একটা কথা চিনে ভাষায় খুব শোনা যায়: 'বাঁচতে চাও তো কোয়াংতুঙে, আর মরতে হ'লে লাই-চু।' এর অর্থ অবশ্য খুবই সরল: ফুর্তি আর ভোগবিলাসের জন্য যা একটা লোকের লাগতে পারে, কোয়াংতুঙে তার সবই মেলে—আর লাই চু হ'লো কফিনের ব্যাবসার রাজধানী। অনেক দিন আগেই কিন-ফো লাই-চু থেকে একটা চমৎকার কফিন এনে রেখেছিলো। কফিনটা শাংহাইতে পৌঁছোলো কেউই তা দেখে মোটেই অবাক হয়নি: সযত্নে একটা ঘরে রেখে দেয়া হয়েছিলো ওটা: মাঝে-মাঝে মোম মাখিয়ে তার যত্নও নেয়া হ'তো বেশ। কিন-ফোর কবে মৃত্যু হবে, কবে সেটা কাজে লাগবে—সেইজন্যে অ্যাদ্দিন আগে থেকেই প্রস্তুতি। কফিন-কেনার সময় কিন-ফো অবশ্য একটা শ্বেত মোরোগও কিনেছিলো। ভূতপ্রেত যাতে কিন-ফোকে না-পেয়ে এই মোরোগটার আত্মাতেই ভর করতে পারে।

কেবল কফিন কিনেই অবশ্য তুষ্ট হয়নি কিন-ফো। তার অন্ত্যেষ্টির সময় কী-কী করা হবে না-হবে, সে-সম্বন্ধে সে বিশদ নির্দেশ দিয়ে রেখেছিলো ইহলোকের কোনো ব্যাপারেই তার কোনো রুচি না-থাকলে কী হবে, পরলোক সম্বন্ধে সে কিন্তু মোটেই উদাসীন ছিলো না। পাৎলা, খড় থেকে বানানো এক রকম দামি কাগজে সে তার যাবতীয় নির্দেশ লিখে রেখেছিলো. শা'হাই-র ইয়ামেনটা ওই তরুণী বিধবাকে দেবার পর ওয়াংকে যেন তাই-পিং সম্রাটের বিখ্যাত তৈলচিত্রটি দেয়া হয়—সেণ্টেনারিয়ানের টাকাকড়ি ছাড়াও এ-সব তারা পাবে, কীভাবে তাকে কবর দেয়া হবে, সে-বিষয়ে সমস্ত কথা সে লিখে গিয়েছিলো তারপর। যেহেতু তার কোনো আত্মীয় নেই, সেইজন্য তার শবযাত্রার মিছিলের পুরোভাগে যেন থাকে তার বন্ধুরা—সবাইকেই অবশ্য ধবধবে শাদা চৈনিক শোকবস্ত্র প'রে আসতে হবে। গোরস্থান অবধি রাস্তার দু-পাশে—শহরতলি দিয়ে যখন মিছিল যাবে—দুইসারে থাকবে দাসদাসীরা—তাদের হাতে থাকবে টাঙি, নীল ছাতা বা রেশমি পর্দা—কারু-বা হাতে থাকবে অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার কর্মসূচি-লেখা মস্ত সব প্ল্যাকার্ড; তাদের পরনে নাকি থাকবে কালো আলখাল্লা, শাদা কামান, আর লাল টুপি। পুরোবর্তী বন্ধুবর্গের পরে কাঁসর বাজাতে-বাজাতে যাবে আপাদমস্তক রক্তিমবসন পরা এক কুলজিরক্ষক—তার পরে থাকবে কিন-ফোর একটি প্রমাণমাপের ছবি—তার চারপাশে কলমলে কাজ করা থাকবে।

তারপরে থাকবে আরেকদল বন্ধু — তাদের কাজ হবে একটু পরে-পরে মূর্ছিত হ'য়ে-পড়া, আর সেই জন্যেই একদল লোক কয়েকটা কুশন নিয়ে যাবে সঙ্গে — সংজ্ঞা হারালে যাতে শোয়ানো যায় তাদের। তারপরে যাবে আরেকদল তরুণ, সোনালি-নীল চাঁদোয়া থাকবে রোদবৃষ্টির হাত থেকে তাদের বাঁচাবার জন্য আর তাদের কাজ হবে টুকরো-টুকরো শাদা কাগজ ছড়িয়ে দেয়া — কাগজগুলোর মধ্যে ছোট্ট ফুটো থাকবে একটা ক'রে — যাতে ওই ফুটো দিয়ে ভূতপ্রেত অপদেবতা সব চ'লে যায় — না-হ'লে তারাও তো সেই মিছিলে যোগ দিয়ে বসবে কিনা।

এর পরে আসবে অত্যন্ত সুন্দর ক'রে সাজানো কফিন-বওয়া গাড়ি। আসলে অবশ্য গাড়ি নয় মস্ত একটা পাল্কিতেই বসানো থাকবে কফিনটা — চারপাশে থাকবে সোনালি ড্র্যাগন আঁকা বেগনি রঙের রেশমি পরদা, পঞ্চাশজন বেয়ারা ব'য়ে নিয়ে যাবে সেই পাল্কি। আর তার দু-পাশে থাকবে দুইসারে পুরোহিত ধূসর, লাল, আর হলদে রঙের আস্তিনছাড়া কামিজ থাকবে তাদের পরনে। সমস্বরে সুর ক'রে মন্ত্র আওড়াবে তারা, আর একেকটা মন্ত্র শেষ হ'লে তুমুলভাবে বেজে উঠবে কাঁসর-ঘণ্টা, শিঙা ও ক্ল্যারিয়োনেট। সব শেষে যাবে শোকাকুল ঘোড়ার গাড়ির সারি কোচোয়ান ও জিনশুদ্ধ শাদা রঙের হবে - যাতে শোকের প্রকাশ সম্বন্ধে কোনো সংশয় না-থাকে।

কিন-ফো এটা ভালো ক'রেই জানতো যে তার অন্ত্যেষ্টির জন্য এই যে নির্দেশ সে দিয়ে যাচ্ছে, তা যথাযথ পালন করতেই তার অবশিষ্ট সম্পত্তি নিঃশেষ হ'য়ে যাবে - কিন্তু তবু এটা ভাবলে ভুল করা হবে যে সে খুব-একটা অদ্ভুত কাজ করেছে - চিনেরা একে মোটেই কোনো অসাধারণ বাতিক ব'লে ভাববে না। কোয়াংতুং বা ক্যান্টন, শাংহাই কি পিকিং — সর্বত্রই প্রায় রোজই এমনি শবযাত্রার মিছিল বেরোয়: মৃতকে সম্মান দেখাবার জন্য এটুকুই যদি না-করা গেলো তবে আর চৈনিকজন্ম সার্থক হবে কী ক'রে?

কিন-ফো ঠিক করেছিলো পয়লা মে তারিখে সে ইহলোক থেকে চিরতরে বিদায় গ্রহণ করবে। এই সব স্থির করতে-করতে বেলা প'ড়ে গেলো, বিকেলবেলায় অবশেষে লা-ওর কাছ থেকে একটি চিঠি এসে হাজির। বিগতপতি এই তরুণী তার যথাসর্বস্ব — তার পরিমাণ অবশ্য খুব বেশি নয় — দিয়ে দিচ্ছে তাকে; প্রতিবাদ ক'রে সে জানিয়েছে যে কিন-ফোর সম্পত্তির প্রতি তার একটুও লোভ ছিলো না কখনও, এখনো নেই; তার ভালোবাসা অপরিবর্তিতই আছে — আর তা-ই থেকে যাবে চিরকাল; অন্য আর তো

হয়েছে কী—তাতেই তাদের তুষ্ট ও সুখী হ'তে বাধা কোথায় ?

কিন্তু কিন-কো তার সংকল্প থেকে নড়বার পাত্র নয়। 'আমার মৃত্যুর যাবতীয় ফসল সে ভোগ করুক, এটাই আমি চাই,' আপন মনেই সে ঠিক করলো।

কাভাবে যে আত্মহত্যা করবে, সেটাই এখনো ঠিক করা বাকি র'য়ে গেছে। এই বিষয়েই মনোনিবেশ করলে সে এবার। আশা করলো হয়তো শেষকালে ভাবকল্পনায় কোনো আবেগ বা আকুলতার স্বাদ না-জুটলেও মৃত্যুর মুহূর্তে চরম কোনো উত্তেজনা ভোগ ক'রে যেতে পারবে।

ইয়ামেনের চৌহদ্দির মধ্যে ছিলো চারটে ছোটো কিন্তু আশ্চর্যসুন্দর পটমণ্ডপ: এত সুন্দর চন্দ্রাতপ-সংবলিত মণ্ডপ বানাতে কেবল চৈনিক শিল্পীরাই পারে। মণ্ডপগুলির নাম কিন্তু খুব অর্থময়: সুখসন্তোষের মণ্ডপ বলা হ'তো একটাকে—কিন-কো পারতপক্ষে কোনো দিন সেখানে যেতে চাইতো না, আরেকটার নাম ছিলো সৌভাগ্যের প্রেক্ষাগৃহ—কিন-কোর সেটাকে চিরকাল অসহ্য ঠেকতো—বমি পেতো যেন ওখানে যাবার কথা ভাবলেই; আরেকটির নাম ছিলো প্রমোদবিতান—যার সম্বন্ধে তার মনে কোনো আকর্ষণই ছিলো না; চতুর্থটির নাম ছিলো দীর্ঘপ্রাণের বনভবন!

কিন-কো কেবল এটুকুই ঠিক করেছিলো যে সে-রাতে সে দীর্ঘপ্রাণের বনভবনেই রাত্রিবাস করবে, পরদিন প্রাতঃকালে সবাই আবিষ্কার করবে যে চিরানদ্রার অসীম সুখে আচ্ছন্ন হ'য়ে আছে সে। তবু আরেকটা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার বাকি থেকে গেলো তার - মরবে কী ক'রে ? জাপানিদের মতো পেট চিরে ফেলবে, হারাকিরি করবে ? মান্দারিনদের মতো রেশমি সুতো দিয়ে ফাঁস দেবে নাকি নিজেকে ? না কি সুগন্ধি হামামের জলে শুয়ে থাকবে হাতের ধমনী কেটে ফেলে—অতীতের রোমক নাগরিকরা যেমন করতো; নানাভাবে আলোচনা করার পর কোনোটাকেই তার গ্রহণযোগ্য মনে হ'লো না; সবগুলোই কেমন অমানুষিক ও নৃশংস ঠেকলো তার কাছে; দাস-দাসীদের কাছে প্রতিটি পদ্ধতিই হয়তো অরুচিকর ঠেকবে। আফিং-এর কয়েকটি দানা আর তার সঙ্গে আরো নিশ্চিত ও সূক্ষ্ম কোনো বিষ মিশিয়ে নেয়াই বোধহয় সবচেয়ে ভালো: কোনো ব্যথা নেই, কষ্ট নেই—মুহূর্তে চ'লে যাবে সে ইহলোকের সব বন্ধনের বাইরে। হ্যাঁ, বিষ-মেশানো আফিংই সবচেয়ে ভালো। এবার মারণাস্ত্র নির্বাচন করতে তার আর দেরি হ'লো না।

সূর্য যত পশ্চিমে ঢ'লে পড়লো, তত সে অনুভব করলো যে আর কয়েক

ঘণ্টা মাত্র তার পরমায়ু—আর তক্ষই শেষবার সাংহাইয়ের রাস্তায় বেড়াতে বেরুবার ইচ্ছে করতে লাগলো তার—ওয়াং-পো নদীর তীর ধ'রে এতকাল সে তার উদাসীন দিনগুলোয় অর্থহীনভাবে ঘুরে বেড়িয়েছে—আজ শেষবার ছলোছলো জলকল্লোল শোনবার ভারি ইচ্ছে করলো তার। সারা দিনে আজ একবারো ওয়াং-এর সঙ্গে দেখা হয়নি—ইয়াংফেনের কোথাও তার দার্শনিক বন্ধু ও উপদেষ্টাকে দেখতে পায়নি কিন-ফো।

আস্তে-আস্তে সে ছাড়িয়ে এলো ইংরেজ বসতি, প্রণালীর উপরকার সাঁকো পেরিয়ে ঢুকে পড়লো ফরাশি অঞ্চলে, যতক্ষণ-না চৈনিক বন্দরে এসে পৌঁছোলো, ততক্ষণ ধ'রে জেটি ধ'রে সে এগিয়েই চললো, তারপর শহরের দক্ষিণ শহরতলির রোমান ক্যাথলিক গির্জে পর্যন্ত এসে ডান দিকে মোড় বেঁকে সে লউঙ-হো প্যাগোডার রাস্তা ধরলো।

এখানে কোনো বসতি নেই, সামনে খোলা প্রান্তর, মস্ত এক জলাভূমি চ'লে গেছে সামনে, অনেক দূরে—মিন উপত্যকার অরণ্যদেশ পর্যন্ত। আসলে এটা ধানখেতই—কেবল মাঝে-মাঝে খাল কেটে সেচের জল নিয়ে-আসা হয়েছে সমুদ্র থেকে, আর দূরে-দূরে আছে কিছু জীর্ণ খোড়োবাড়ি, হলুদ মাটি-লেপা মেঝে সে-সব বাড়ির—আশপাশে জলের তলা থেকে ধানের চারা মুখ তুলে তাকিয়ে আছে আকাশের দিকে। এই সরু গলি দিয়ে লোক আসতে দেখে চারপাশের পশুপাখিরা চট ক'রে পালিয়ে যাচ্ছে: কতগুলো কুকুর ডেকে উঠলো ঘেউ-ঘেউ, পাল ছাগলগুলো হুড়মুড় ক'রে স'রে গেলো দূরে—হাঁস-মুরগিগুলিও কোলাহল ক'রে ছিটকে চ'লে যেতে দেরি করলো না।

ধানখেত হ'লে কী হবে, কোনো আগন্তুকের কাছে এই জলা জায়গাটা বিশ্রী ঠেকবে। চিনদেশের সব শহরের বাইরেই যে-মস্ত প্রান্তরগুলো প'ড়ে থাকে সব কেমন যেন গোরস্থানের মতো ফাঁকা দেখায়। আর এখানে তো আশপাশে সত্যিই কত যে কফিন এলোমেলো প'ড়ে আছে তার ঠিক নেই। কোথাও মাটির ঢিবি দেখে বোঝা যায় যে গোর দেবার জন্য মাটি কাটা হয়েছে—পিরামিডের মতো ওই মাটির ঢিবিগুলো উঠে গেছে উপরে—একটার চেয়ে আরেকটা বেশি উঁচু—যেন কোনো জাহাজ মেরামতের কারখানায় উঁচু মাচান। শোনা যায় যে তাতার শাসকরা নাকি কাউকে গোর দেয়া নিষিদ্ধ ক'রে দিয়েছে—সত্যি-মিথ্যে কে জানে, কিন্তু এটা ঠিক যে একটার গায়ে আরেকটা কফিন ঠেশ দিয়ে-দিয়ে মাচার মতো ক'রে ফেলে রাখা হয়েছে এখানে: কোনো কফিনের গায়ে চিনে দারুশিল্পীর চমৎকার কাজের নমুনা

দেখা যায়—কোনো কফিনের গায়ে আবার কোনো কারুকাজই নেই। কোনো-কোনো কফিন ঝকঝকে ও আনকোরা, কতগুলো কফিনের কাঠ আবার প'চে গিয়েছে : যেন ঘুণাক্ষরে তাদের ধ্বংসের কাহিনী লেখা; কালক্রমে হয়তো সত্যিই এদের একদিন গোর দেয়া হবে—এখানে প'ড়ে-প'ড়ে সেই অনাগত দিনেরই প্রতীক্ষা করছে তারা।

এই অদ্ভুত দৃশ্য অবশ্য কিন-ফোর আদৌ অচেনা নয় ; সে এ-সবের দিকে তাকিয়েও দেখলো না একবারও ; তাকালে ইওরোপীয় পোশাকপরা লোক দুটি কিছুতেই তার নজর এড়িয়ে যেতো না। ইয়ামেন থেকে বেরোবার পর থেকেই এরা তাকে অনুসরণ ক'রে আসছে। তাকে কেবল চোখে-চোখে রাখা ছাড়া আর-কোনো উদ্দেশ্য বোধহয় তাদের নেই : কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে পুরো রাস্তা তারা তারই মতো কখনো দ্রুত কখনো আস্তে হেঁটে চ'লে এসেছে। মাঝে-মাঝে নিজেদের মধ্যে কী-সব বলাবলি করেছে তারা কে জানে : স্পষ্ট বোঝা যায় তার উপর নজর রাখার জন্যই গোয়েন্দা হিশেবে তারা নিযুক্ত হয়েছে। দুজনেরই বয়েস ত্রিশের নিচে, দুজনেই স্বাস্থ্যবান ও ক্ষিপ্র, তীক্ষ্ণদৃষ্টি, বেশ শক্তসমর্থ, কিছুতেই যাতে কিন-ফো তাদের চোখের আড়াল না হয়, সে-সম্বন্ধে অত্যন্ত সতর্ক রয়েছে সব সময়। প্রায় মাইল তিনেক যাবার পর কিন-ফো যখন পিছন ফিরলো, তখন গন্ধ-পাওয়া ডালকুত্তোর মতো তারাও তক্ষুনি ফিরে দাঁড়ালো।

রাস্তায় কয়েকটি জীর্ণ-শীর্ণ হতশ্রী ভিখিরকে দেখে কিন-ফো তাদের কিছু-কিছু ভিক্ষে দিতে ভোলেনি, এবার একটু এগিয়ে সে রাস্তায় কয়েকটি খ্রীস্টান চিনে রমণীকে দেখতে পেলো : ফরাশি মিশনারি রমণীদের কাছ থেকে শিক্ষা পেয়েছে তারা, পিঠে তাদের বাস্কেট রাস্তায় কোনো অনাথ শিশু দেখতে পেলে তাদের তুলে নিয়ে অনাথআশ্রমে পৌঁছে দেয়াই তাদের কাজ। লোকে কিন্তু তাদের 'ন্যাকড়া-কুড়ুনি' ব'লে ডাকে : আর সত্যি-বলতে রাস্তা থেকে তারা যা কুড়িয়ে নেয় তা কেবল ন্যাকড়ার ফালি ছাড়া বোধহয় আর-কিছু নয়। কিন-ফো তাদের হাতে মনিব্যাগ উপুড় ক'রে দিলে। পাছু-নেয়া গোয়েন্দা দুটি অবাক হ'য়ে একটু মুখ চাওয়াচায়ি করলে : চিনেদের স্বভাবে তো এত বদান্যতা নেই ! মাথা খারাপ না-হ'লে তো কোনো চিনেম্যান কিছুতেই এমন কাজ করবে না !

কিন-ফো যখন জেটির কাছে ফিরে এলো, তখন অন্ধকার ক'রে এসেছে ; কিন্তু জলে যাদের বাস, যারা শাম্পানে কি বজরায় কি নৌকোয় থাকে, তাদের

কর্মচাঞ্চল্যের কিন্তু অবসান হয়নি তখনো। চারপাশে শোরগোল শোনা যাচ্ছে, তারই মধ্যে হাওয়ায় ভেসে আসছে গানের কলি; কেউ গান গাইছে বোধ-হয়। কিন-কো একটু থমকে দাঁড়ালো। পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নেবার আগে শেষ গানটা শুনে গেলে মন্দ হয় না!

ওয়াং পো নদীর কালো জলের মধ্যে দিয়ে সাম্পান বাইতে-বাইতে একটি তরুণ ভবঘুরি গান ধরেছে একা গলায়:

'ফুরালো সারাটি আনমনা ছোট্টো বেলা,
ধীরে প'ড়ে আসে বেলা।
আজ ক'রে বাল দীপ দেবতাকে,
এখনো 'ক ঘরে ফেরা'বে না তাকে —
ব্যাকুল হৃদয় খুঁজে ফেরে যাকে?
কবে সে আসবে? কাল?'

'কাল?' কিন-কো মনে-মনে ভাবলো, 'কাল এমন সময়ে আমি কোথায় থাকবো?'

'জানি না সে কোন বন বনান্তরে সে যে
গেছে কোনকালে সেজে।
চিনের দেয়াল পেরিয়ে কোথায়
গেছে সে, কে জানে! গোপন ব্যথায়
তবে কেঁদে মরি: বোঝে না কি তাও?
আসবে না তবে কাল?

কতকাল হ'লো কোন দূরে চ'লে গেছে —
জানি না আছে কি বেঁচে?
কেন লোক চেয়ে দূরে আছো প'ড়ে?
বসন্ত যায়, দুই পাখি* ওড়ে,
গোধূলিলগন অকুলান ক'রে
প'ড়ে যায়। — এসো কাল!'

ক্রমে দূরে মিলিয়ে গেলো গানের সুর। কিন-কোর মনে অদ্ভুত সব ভাবনা জেগে উঠলো। টাকাকড়িই যে পৃথিবীর সব-কিছু নয় তা সে মানে — কিন্তু টাকাকড়ি ছাড়া পৃথিবীতে বেঁচে-থাকারও কোনো মানে হয় না, তার এই মত তবু পালটালো না।

আধ ঘণ্টার মধ্যেই বাড়ি ফিরে এলো সে। সেই পাংশুবর্ণ গোয়েন্দা দুটি

* দুই পাখি — কিংবদন্তির দুই পাখি — চিনদেশে প্রণয়ের প্রতীক।

অবশেষে তার উপর আর নজর রাখতে অক্ষম হ'লো। কিন-কো নীরবে, সকলের অলক্ষিতে, দীর্ঘপ্রাণের বনভবনের দিকে এগিয়ে গেলো; দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে প'ড়েই চট ক'রে আবার দরজা বন্ধ ক'রে দিলো সে। অন্ধকারে ঢাকা ছোট্ট ঘর, কোথাও আলোর লেশমাত্র নেই, দেশলাই জ্বালিয়ে ঝুঁকে প'ড়ে মেঝের উপরকার কাচের লণ্ঠনটা জ্বেলে দিলো সে। হাতের কাছেই নিরেট সবুজ পাথরের একটা টেবিল প'ড়ে আছে, তার উপর রয়েছে এক বাক্স আফিং আর মারাত্মক কয়েক জাতের বিষ।

কয়েকদানা আফিং তুলে নিয়ে একটা লাল রঙের মাটির পাইপে ভ'রে নিয়ে সে ধূমপানের জন্য প্রস্তুত হ'লো। 'আর-কোনোদিন জাগবো না এই ঘুম থেকে,' বললো সে।

কিন্তু হঠাৎ সে পাইপটা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে দিলো। 'গোল্লায় যাক সব,' চেঁচিয়ে উঠলো সে, 'কোনো অনুভূতিই হচ্ছে না আমার—কোনো তীব্র স্বাদ ছাড়া মরা চলবে না—সেই স্বাদ মৃত্যুভয়েরই হোক কি অন্যকিছুরই হোক। এভাবে কোনো কিছু বোধ না ক'রেই নিঃসাড়ে ম'রে যাবো? তা হ'তেই পারে না!' দীর্ঘপ্রাণের বনভবনের দরজা খুলে বেরিয়ে এলো সে বাইরে। দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেলো ওয়াং-এর ঘরের দিকে।

৮

যে-চুক্তিটা ইয়ার্কি নয়

ওয়াং তখনো অবশ্য শুয়ে পড়েনি, একটা সোফায় হেলান দিয়ে ব'সে 'পিকিং হরকারা'র শেষ সংখ্যাটা পড়ছিলো, তাহার মুলতানের স্তুতি পড়তে-পড়তে বারে-বারে ভুরু কুঁচকে যাচ্ছিলো তার।

কিন-কো যেন ফেটে পড়লো ঘরের মধ্যে, নিজেকে একটা আরাম-কেদারায় ছুঁড়ে দিয়ে সে ব'লে উঠলো, 'ওয়াং, আমার একটা উপকার করতে হবে তোমায়!'

আস্তে-আস্তে কাগজটা নামিয়ে রাখলো দার্শনিকপ্রবর। 'তুমি বললে, একটা কেন, হাজারটা উপকার করার চেষ্টা করবো।'

'না না, অত দরকার নেই—আপাতত একটা হ'লেই যথেষ্ট। আমি যা বলি, দয়া ক'রে—তা-ই করো; বাকি নশো নিরানব্বুইটা উপঢৌকিবা থেকে

তোমায় আমি মুক্তি দেবো। এটা অবশ্য আগেই ব'লে রাখছি যে তার পরে কিন্তু তুমি আমার কাছে থেকে ধন্যবাদ বা কৃতজ্ঞতা কিছুই পাবে না।'

'তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছি না, কিন-ফো,' ওয়াং বললো, 'একটু বিশদ ক'রে বোঝাবে?'

'প্রথমে তোমাকে জানাই যে,' গম্ভীর গলায় বললো কিন-ফো, 'আমি আমার শেষ কপর্দকটুকুও হারিয়ে বসেছি—একেবারে শেষ হ'য়ে গেছি আমি, নিঃস্ব ও সর্বস্বান্ত!'

'সত্যি?' ওয়াং এমনভাবে কথাটা বললো যে এ-কথা শুনে সে যে আদৌ বিচলিত হয়েছে তা মোটেই বোধ হ'লো না—বরং তার গলার স্বর শুনে উলটো ধারণাটাই হ'তে পারে।

'হ্যাঁ, সত্যি। সুন যে চিঠিটা দিতে ভুলে গিয়েছিলো, তার কথা মনে আছে তোমার? ওই চিঠিতেই এ-খবর ছিলো যে ক্যালিফর্নিয়ার ব্যাঙ্ক লাল বাতি জ্বেলেছে। আমার কাছে তার অর্থ কী, বুঝতে পারছো তো—একেবারে শেষ কপর্দকটি পর্যন্ত হারিয়ে বসা! এই ইয়ামেন, আর খুচরো হাজার খানেক ডলার কেবল আছে এই মুহূর্তে—ধারদেনা শোধ করতেই তা চ'লে যাবে। মাস দুই চালাবার মতো সংগতিও আমার নেই।'

'তাহ'লে,' ওয়াং বললে, 'ধনকুবের কিন-ফোর সঙ্গে আমার কথা হচ্ছে না এখন?'

'না—এখন কিন-ফো একটি পথের ভিখিরি মাত্র। কিন্তু ধনী-নির্ধন—এ-সব বিশেষণে এখন আর কিছু এসে যায় না। দারিদ্র্যকে আমি মোটেই ভয় করিনি।'

'ঠিক বলেছো,' সোফা ছেড়ে উঠলো ওয়াং, 'যোগ্য কথা শুনতে পেলাম তোমার কাছে। আমার শিক্ষায় তাহ'লে উৎফুল্ল হবার মতো কিছু ফল হয়েছে। এতদিন কেবল একটা গাছ-পাথরের সঙ্গে তোমার তুলনা চলতো—এবার তুমি বাঁচতে শিখবে। কনফুসিয়াস কী বলেছেন মনে ক'রে দ্যাখো। যত দুঃখ আমরা চাই, তত আমরা কোনোদিনই পাই না। নিশ্চয়ই চুন-সুন-এর সেই কথাগুলো তোমার মনে আছে—সেই-যে: "জীবনে উত্থান-পতন থাকবেই, ভাগ্যের চাকা বিরাম জানে না, অবিশ্রাম তার ঘূর্ণন, দখিন হাওয়া থাকে অল্প দিনই, কিন্তু ধনী বা নির্ধন যা-ই হও না কেন, তুমি তোমার কর্তব্য ক'রে যাও।" বৎস কিন-ফো, আমাদের এক্ষুনি পথে বেরিয়ে পড়তে হয় তবে: রুটি রোজগারের ধান্দায় বেরোতে হয় এবার তাহ'লে—'

দার্শনিকের ভাব-ভঙ্গি দেখে মনে হ'লো সে বুঝি সেই মুহূর্তেই এই বিলাস-ভবন থেকে বেরিয়ে যাবে।

'ধীরে, বন্ধু, ধীরে — এতে তাড়াহুড়ো করার কিছু নেই,' বললে কিন-ফো। 'দারিদ্র্যকে আমি ভয় করি না — এ-কথার অর্থ এই নয় যে আমি দারিদ্র্যকে সহ্য করতে যাচ্ছি — আমার উদ্দেশ্য মোটেই তা নয়।'

'তার মানে? তোমার উদ্দেশ্য কী তাহ'লে?'

'ম'রে-যাওয়া —'

'ম'রে-যাওয়া!' দার্শনিকের কণ্ঠস্বর ঘৃণায় তীব্র হ'য়ে উঠলো। 'এটা তুমি নিশ্চয়ই ভালো ক'রেই জানো যে যারা সত্যি-সত্যি আত্মহত্যা করতে চায়, তারা আগে থেকে ঢাক পিটিয়ে বেড়ায় না বরং সবসময় তাদের ইচ্ছেটাকে গোপন রাখার চেষ্টাই তারা করে।'

কিন-ফো অত্যন্ত শান্ত গলায় বললে, 'আমি যে এখনো বেঁচে আছি, এ নেহাৎই দৈবের দয়া!'

'কী বলতে চাচ্ছো তুমি?'

'মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও যখন দেখলুম সেই মুহূর্তেও কোনো তীব্র অনুভূতি হচ্ছে না,' ওয়াং-এর কথা গ্রাহ্য না-ক'রেই কিন-ফো ব'লে চললো, 'ঠিক তখনই আমি যে-বিষ খেতে যাচ্ছিলুম, তা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে তোমার কাছে এসেছি!'

'হুম, বুঝলুম। তখন বুঝি ভাবলে দুজনে একসঙ্গে মরাই ভালো,' হেসে বললো ওয়াং।

'মোটেই তা নয়। তুমি বেঁচে থাকো, আমি তা-ই চাই, ওয়াং।'

'কেন? আমার বাঁচা উচিত কেন?' দার্শনিক জিগেশ করলো।

'আমাকে খুন করার জন্য,' বললো কিন-ফো, 'তোমার কাছ থেকে এই অনুগ্রহটা ভিক্ষে করতেই আমি এসেছি।'

একেবারে আঁৎকে দেয়ার মতো প্রস্তাব, কিন্তু ওয়াং যে এ-কথা শুনে বিন্দুমাত্র অবাক হয়েছে, তা কিন্তু মোটেই মনে হ'লো না।

কিন-ফো সাগ্রহে অধীরভাবে তার মুখের দিকে তাকিয়েছিলো — হঠাৎ তার মনে হ'লো ওয়াং-এর চোখের তারা যেন মুহূর্তের জন্য ঝিকিয়ে উঠলো। অতীতের সেই তাই-পিং তবে জেগে উঠলো নাকি তার রক্তে? এই দীর্ঘ আঠারো বছরের ব্যবধানও অতীতের সেই রক্ততৃষাকে নিবৃত্ত করতে পারেনি? সেই ভুলে-যাওয়া আদিম আগুনের একটা স্ফুলিঙ্গ কি নতুন ক'রে আবার

জানিয়ে দিলো তাকে—রক্তে রাঙাবার জন্ত জন্ত হাতদুটি তার আবার নিশপিশ ক'রে উঠেছে কি—তার আশ্রয়দাতার সন্তানের রক্তেই কি সে নতুন ক'রে তার পিপাসা মেটাতে চায়?

কিন্তু মুহূর্তের মধ্যেই তার চোখ থেকে সেই স্ফুলিঙ্গ নিভে গেলো। আরো গম্ভীর, আরো প্রশান্ত হ'য়ে এলো তার চোখমুখ। আস্তে গিয়ে আবার সে সোফাটিতে ব'সে প'ড়ে চিন্তিত স্বরে বললে, 'এই উপকারটিই তবে প্রার্থনা করতে এসেছিলে তুমি?'

'হ্যাঁ, তাই। বধ করো তুমি আমাকে—তার আগে তোমাকে জানিয়ে যাই যে তুমি আমাদের ঋণ বহুগুণে শোধ করেছো, ওয়াং—তোমাকে কোনো পাপ স্পর্শ করবে না!'

'এ-কথা তুমি ভেবে বলছো, কিন-ফো? জানো, এ-কথার অর্থ কী?' জানতে চাইলো ওয়াং।

'খুব ভালো ক'রেই তা জানি।' বললে কিন-ফো, 'তুমি তো জানো যে ষষ্ঠ মাসের আঠাশ তারিখে অর্থাৎ পঁচিশে জুন আমার একত্রিশ বছর পূর্ণ হবে। তার আগেই আমি মরতে চাই—আর তোমার হাতেই আমার মৃত্যু হবে—এই মর্মে একটা চুক্তি ক'রে নিতে চাই আমি।'

'আমার হাতে? কবে? কোথায়? কীভাবে?' ওয়াং জিগেস করলো তাকে।

'কবে, কোথায়, কীভাবে—এ-সব বিষয়ে আমার কোনো আগ্রহ নেই। এ-সব আমি জানতেই চাই না। ব'সে কি দাঁড়িয়ে, ঘুমিয়ে কি জেগে, দিনে বা রাতে, প্রকাশ্যে বা গোপনে, ছোরা ব'সিয়ে কি বিষ খ'ইয়ে—এ-সব প্রশ্নের উত্তর তুমি খুঁজো, এ-সব জিজ্ঞাসার সমাধান তুমি কোরো। আমি শুধু বলতে চাই যে ওই তারিখের মধ্যেই যেন আমি তোমার হাতে ম'রি। কেবল একটা শর্ত আমি দিতে চাই—আমি যেন তা আগে থেকে টের না-পাই। এইভাবেই তাহ'লে পরবর্তী পঞ্চাশ দিন আমি কোনো-কিছুর প্রত্যাশায় কাটাতে পারবো—প্রতি মুহূর্তে ভাববো তবে—ওই বুঝি আমার মৃত্যু এলো—ওই বুঝি সব শেষ হ'য়ে যায়!'

কিন-ফো আগাগোড়া এমন উত্তেজিতভাবে কথা ব'লে যাচ্ছিলো, যে তা তার স্বভাবের সঙ্গে মোটেই মেলে না। কিন্তু তা সত্ত্বেও এই অস্বাভাবিক আবেগ তার সমস্ত কাণ্ডজ্ঞান ভাসিয়ে নিয়ে যায়নি। তার জীবনবীমার মেয়াদ উত্তীর্ণ হবার পাঁচ দিন আগেই সে নিজের আয়ুর সীমা টেনে দিতে চেয়েছে।

৬

কারণ এটা সে এই হঠাৎ-আসা বাঁধভাঙা আবেগ সত্ত্বেও জানে যে ওই বীমার দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দেবার মতো সংগতি তার যোটেই নেই।

দার্শনিক ব'সে-ব'সে চুপটি ক'রে তার সব কথা শুনলো, মাঝে-মাঝে তাকিয়ে দেখলো তাকে—আর অন্যমনস্কভাবে তাকিয়ে রইলো ঘরের দেয়ালে ঝুলে থাকা তাই-পিং সম্রাটের ছবিটার দিকে, এটা সে স্বপ্নেও জানে না যে কিন-ফো তার ইষ্টিপত্রে তাকেই এই ছবিটা দিয়ে গেছে।

'আমার বক্তব্য শুনলে তো,' এক্ষণ চুপ ক'রে থেকে বললে কিন-ফো, 'তোমার কোনো আপত্তি নেই নিশ্চয়ই এই শর্তে—আমার ইচ্ছের বিরুদ্ধে তোমার নিশ্চয়ই কিছু বলার নেই? আমাকে হত্যা করতে রাজি আছো আশা করি?'

ব্যস্ত হ'য়ে সম্মতির ইঙ্গিত করলে ওয়াং। বিদ্রোহের সেই রক্তরাঙা দিনগুলোতেও এর চেয়েও কত ভীষণ কাজ তাকে যে করতে হয়েছে, হয়তো সে-সব কথাই এখন তার মনে প'ড়ে যাচ্ছে হঠাৎ। কিন্তু কিন-ফোর প্রশ্নের কোনো সুনির্দিষ্ট জবাব না দিয়ে সে উলটে আরেকটা প্রশ্ন করলো, 'তুমি ঠিক জানো যে বুড়ো বয়েস পর্যন্ত নির্বিবাদে বেঁচে থাকার ইচ্ছে তোমার আর নেই।'

'তোমাকে ব'লি, ওয়াং, আমার সংকল্প আর বদলাবে না। থুরথুরে বুড়ো বড়োলোক হওয়াটাই মন্দের একশেষ—গরিব বুড়োমানুষ তো আরো অসহ্য!'

'আর 'শিকি'-এর সেই সুন্দরীটি? তার কথা কিছু ভেবেছো? না কি তাকে একেবারে ভুলে গিয়েছো তুমি? এই প্রবাদটা জানো না—"উইলোর সঙ্গে উইলোর, ফুলের সঙ্গে ফুলের, আর হৃদয়ের সঙ্গে হৃদয়ের যোগ হ'লে শত বসন্তের হাওয়া দেয়"?'

কিন-ফো একটু তাচ্ছিল্যভরে কাঁধ ঝাঁকালো। 'সেই শত বসন্তের হাওয়ার আগে যে একপোটা শীতকালের কনকনে হাওয়া ব'য়ে যাবে!' চুপ ক'রে কী যেন ভাবলো সে তারপর, বললো, 'না, লা-ও আমাকে বিয়ে ক'রে ভীষণ হতাশ হ'য়ে পড়বে। আশাভঙ্গের বেদনা ছাড়াও দুঃখে বিষাদে ভ'রে যাবে সে। আমার মৃত্যুতে বরং সে কিছু টাকাকড়ি পাবে। আর তুমিও পাবে, ওয়াং—তোমার কথাও আমি ভুলিনি। তোমার জন্যে পঞ্চাশ হাজার ডলার রেখে গেছি আমি।'

'কোনো-কিছুই যে আর বাকি রাখোনি, সব-কিছুই যে ভেবে ঠিক ক'রে রেখেছো দেখছি,' দার্শনিক বললো, 'আমাকে তো কোনো আপত্তিই তুলতে দিচ্ছো না!'

'উঁহু, এখনো একটা বাধা থেকে গেছে,' কিন-ফো উত্তর দিলে, 'তুমি সে-কথা একেবারেই ভুললে না দেখে আমি খুব অবাক হচ্ছি। আমাকে খুন করবে ব'লে যে রাজি হ'লে, তারপরে যে পুলিশ তোমায় খুনী ব'লে খুঁজে বেড়াবে—'

'বোকা আর ভরপোকেরাই শুধু পুলিশের হাতে ধরা পড়ে,' ওয়াং অর্থপূর্ণ মন্তব্য করলে, 'আমি ওই ঝুঁকি নিতে রাজি আছি।'

'তবু আমি আগে থেকেই তোমাকে রক্ষাকবচ দিয়ে যাই,' কিন-ফো বললে, 'আমার মৃত্যুর জন্য কেউ দায়ী নয়—এই মর্মে একটা চিরকুট লিখে দিয়ে যাবো তোমাকে। সেটা দিয়ে তুমি নিজেকে বাঁচাতে পারবে।'

শান্তভাবে টেবিলের কাছে গিয়ে একটা কাগজে বড়ো-বড়ো হরফে স্পষ্ট ক'রে লিখে দিলে সে

'বেঁচে-থাকাটা এতই বিরক্তি আর অরুচি লাগছিলো যে আমি নিজে থেকেই মৃত্যু প্রার্থনা ক'রে নিয়েছি।—কিন ফো'

৯

উৎকণ্ঠা

নতুন মক্কেলের উপর নজর রাখবার জন্যে উইলিয়াম জে বিডুল্ফ যে দুজন গোয়েন্দা নিয়োগ করেছিলেন, সেন্টেনারিয়ানের আপিসে ব'সে পরদিন সকালে তাদের সঙ্গেই তাঁর কথা হচ্ছিলো।

ক্রেগ বলছিলো, 'কাল সন্ধেবেলা তাকে অনেকক্ষণ অনুসরণ করেছিলুম—বেড়াতে বেড়াতে শহর থেকে অনেক দূরে গিয়েছিলো সে।'

ফ্রাই বললে, 'আর, তাকে দেখে কখনোই এটা মনে হয়নি যে সে আত্মহত্যা করতে চাচ্ছে—'

'তার পিছন-পিছন আবার তার ইয়ামেনেই ফিরে এসেছিলাম আমরা,' ক্রেগ জানালো।

'কিন্তু,' ফ্রাই সেই সঙ্গে যোগ ক'রে দিলো, 'বাড়ির ভিতরে যাবার কোনো সুযোগ ছিলো না আমাদের।'

'আজ সকালবেলা সে কেমন আছে?' বিডুল্ফ জিগেস করলেন।

'পাকিকাও-র পাঁকোটার মতোই দিব্যি শক্তসমর্থ,' একযোগে ব'লে উঠলো দুজনে।

আসলে জের আর ক্রাই ভুহো ভাই। সত্যিকার আমেরিকান বলতে যা বোঝায়, দুজনেই তার সেরা নজির। জাযদেশীয় যমজ হ'লেও বুঝি তাদের স্বভাব-চরিত্রের এত মিল দেখা যেতো না। তাদের চিন্তাধারা এক, যেখা অভিন্ন, অভিপ্রায়েও কোনো অমিল নেই – মনে হয় তাদের উদরও বুঝি একটাই। পরস্পরের হাতে-পায়েও বুঝি দুজনেরই সমান অধিকার রয়েছে। কথা বলার সময় একজনে কোনো বাক্য শুরু করলে, আরেকজনে সেটা শেষ করে।

'না, বাড়ির ভিতরে ঢোকার কোনো সুযোগ সত্যি তোমাদের ছিলো না,' বিডুলফ মন্তব্য করলেন।

গোয়েন্দা দুজন ঘোষণা করলো যে সেটা কখনোই তাদের পক্ষে সম্ভব হবে ব'লে মনে হয় না।

'কিন্তু তবু বাড়ির ভিতরে ঢুকতেই হবে তোমাদের – যে ক'রেই হোক এ-কাণ্ডটা হাশিল করতে হবে,' বিডুলফ বলতে লাগলেন, 'কম্পানি কিছুতেই দু-লাখ ডলার হারানোর ক্ষতি সহ্য করতে পারবে না। এই দু-মাস কিন-ফোর উপর কড়া নজর রাখতে হবে তোমাদের – যদি আরেক কিস্তির টাকাটা দেয়, তাহ'লে তো আরো বেশি দিন তাকে চোখে চোখে রাখতে হবে।'

'বাড়িতে একটা চাকর আছে,' ক্রাই শুরু করলো।

জেগ শেষ করলো, 'বোধকরি বাড়ির ভিতর কী হয় না-হয় তার হদিশ সে বাৎলাতে পারবে।'

'বেশ, তাহ'লে তাকেই পাকড়াও করো,' বিডুলফ উত্তর করলেন, 'চিনে মানুষরা যে-সব জিনিশ ভালোবাসে, সেই সব ভেট দিয়ে চুটিয়ে আড্ডা দাও তার সঙ্গে : সুরা, টাকা, চণ্ডু – দরকার হ'লে সব-কিছু উৎকোচ দিতে হবে, তাহ'লেই দেখবে চটপট তোমাদের কাজ হাশিল হ'য়ে যাবে।'

পরিকল্পনা অনুযায়ী গোয়েন্দা দুজন যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সুনের সঙ্গে খাতির জমিয়ে ফেললো : এক গ্লাশ মার্কিন সুরা বা যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চনমুদ্রা – কোনোটাতেই সুনের আদৌ কোনো অনীহা ছিলো না।

জেরা ক'রে ক'রে তার তার পেট থেকে অনেক কথাই বের ক'রে নেয়া গেলো। তার প্রভুর হাব-ভাবে ইদানিং কোনো পরিবর্তন চোখে পড়েছে কি? না, তেমন-কোনো পরিবর্তন ঠিক দেখা যায়নি, তবে আজকাল সুনকে তিনি একটু বেশি লাই দিচ্ছেন। মারাত্মক অস্ত্র-টস্ত্র থাকে কি তাঁর কাছে? না, অস্ত্রশস্ত্র কিছুই তাঁর কাছে থাকে না। বেঁচে থাকেন কেমন ক'রে? অত্যন্ত শাদাশিধে খাদ্য গ্রহণ ক'রে। ঘুম থেকে ওঠেন ক-টার সময়? ভোর পাঁচটায়।

সুন তাঁর কাছে যোগ দেবার পর থেকেই দেখেছে যে রাতে নটা-দশটার বেশি তিনি কখনোই জেগে থাকেন না। সব সময়েই কি গোমড়া মুখে ব'সে-ব'সে ভাবেন? দেখে কি মনে হয় যে বেঁচে থাকতে আর ভালো লাগছে না? না কি হতাশ অবসাদে আচ্ছন্ন থাকেন সব সময়? না, যদিও কোনোকালেই খুব ধুম-ধাম হৈচৈ আমোদ-আহ্লাদ খুব-একটা পছন্দ করতেন না, তাই ব'লে মুখ কালো ক'রে ব'সেও থাকতেন না, সত্যি বলতে, দু-তিন দিন ধ'রে তাঁকে বরং আগের চেয়ে ঢের বেশি প্রফুল্লই দেখা যাচ্ছে। তাঁর কাছে কি কোনো বিষের পুরিয়া আছে? হঠাৎ একদিন বিষ খেয়ে বসবেন ব'লে কি মনে হয়? উঁহু, অন্তত সুনের তো তা সম্ভব ঠেকছে না, সত্যি-বলতে আজই সকালে সুন গিয়ে কিন-ফোর কথায় ওয়াং-পো নদীর জলে একগাদা আফিং-এর গুলি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে এসেছে — কিন-ফোর নাকি মনে হয় তা থেকে আচমকা কোনো বিপদ-আপদ হ'তে পারে।

বিচক্ষণের আশঙ্কা জাগাতে পারে, এমন-কোনো কথাই পাওয়া গেলো না এই জেরা থেকে। ধনীর দুলাল কিন-ফোকে এমন পরিতৃপ্ত ও প্রফুল্ল দেখা যায়নি কোনো দিন। তবু ক্রেগ আর ফ্রাই তাদের কর্তব্যকর্মে ঢিলে দেবার কথা ভাবতে পারলে না, একটুও আলস্য করলো না তারা পাহারায় — তাদের গোয়েন্দাগিরির সব মান-সম্ভ্রম তো আর ধুলোয় লুটোবার ঝুঁকি নেয়া যায় না — আগের চেয়েও তীক্ষ্ণ চোখে ও দৃঢ়তর অধ্যবসায়ের সঙ্গে তারা কিন-ফোর উপর নজর রাখতে লাগলো, একটা মাছিও যাতে তাদের নজর এড়িয়ে গ'লে যেতে না পারে সে-বিষয়ে সাবধানতার কোনো কমতি ছিলো না তাদের। সব শুনে-টুনে এটা তারা ধ'রেই নিয়েছিলো যে নিজের বাড়িতে আত্মহত্যা করার মতলব কিন-ফোর নেই, তাই কিন-ফো বাড়ি থেকে বেরোলেই তারা অসীম ধৈর্যের সঙ্গে তার পিছু নেয়, তাছাড়া সুনের সঙ্গে আরো চুটিয়ে বন্ধুতা করলে তারা, আর এমন হাতখোলা ও দরাজদিল বন্ধু পেয়ে সুনের মুখের কুলুপ খুলে গেলো।

আর কিন-ফো নিজে? যেই সে ঠিক করছে যে আর বেশিদিন বেঁচে থাকবে না, অমনি যেন জীবনের জন্য মমতা গজাতে আরম্ভ করেছে তার মধ্যে। কী হয় কী-হয় এই উৎকণ্ঠা, প্রতি মুহূর্তে মৃত্যুর জন্য রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষা, অনিশ্চিতি আর সন্দেহ — সব মিলিয়ে তার মধ্যে এমন রোমাঞ্চ আর এমন উত্তেজনার সৃষ্টি হ'তে লাগলো, যার স্বাদ সে আগে কোনো দিনই পায়নি। মাথার উপর সে নিজেই ঝুলিয়ে দিয়েছে ডামোক্লেসের খড়্গ — সেই অনিবার্য ছুরির যে কখন বিদ্যুৎগতিতে নেমে আসে তার কোনো স্থিরতা নেই ব'লেই

প্রতিটি মুহূর্ত এখন তার পরম উত্তেজনায় কেটে যায়।

সে-রাতে ওই চুক্তি ক'রে নেবার পর থেকে কিন-কো আর ওয়াং-এর মধ্যে আর কোনো কথা হয়নি; বস্তুত তাদের মধ্যে আর দেখাই হয়নি; হয়তো দার্শনিক ওয়াং আজকাল বেশির ভাগ সময়ই বাড়ি থাকে না, আর নয়তো নিজের ঘরে দরজা বন্ধ ক'রে ব'সে-ব'সে সে ভাবে কেমন ক'রে কিন-কোকে বধ করা যায় — হয়তো তাই-পিং বিদ্রোহীদের দলে থাকার সময় নরহত্যায় যে-সব পদ্ধতি সে জেনেছিলো তা-ই মনে-মনে বিচার ক'রে দেখছে কিন-কোর বেলায় তার কোনটা প্রয়োগ করা যায়। ওয়াং কী ক'রে সময় কাটাচ্ছে আজকাল, এ-সম্বন্ধে অনেকে রকম অনুমানই শুধু করতে পারে কিন-কো, কিন্তু ওই অনুমান করতে গিয়েই নতুন আরেকটি চেতনার সঙ্গে পরিচয় হ'লো কিন-কোর, তার নাম কৌতূহল, কিন্তু এখন কৌতূহল তাকে আর এক মুহূর্তেরও স্বস্তি দিচ্ছে না।

এখন কেবল খাবারটেবিলেই দেখা হয় দুজনের — কিন্তু কথাবার্তা হয় খুবই সাধারণ বিষয়ে। তাছাড়া ওয়াংকে আজকাল কেমন চাপা আর বিষণ্ণ ঠেকে, কথাবার্তা খুব কম বলে, চোখ কেমন যেন উদাস ও শূন্য থাকে — তার চশমার মস্ত কাচগুলোও তা গোপন রাখতে পারে না, আগে বেশ খেতে পারতো সে; এখন যেন কিছুই আর মুখে রোচে না, কোনো সুখাদ্য বা মূল্যবান মদ্য তার আহারে রুচি দিতে পারে না। ওদিকে কিন-কো আজকাল প্রতিটি খাবারই তারিয়ে-তারিয়ে খায়। অসম্ভব খিদে পায় তার আজকাল, রোজ সে যে কেবল প্রচুর খাচ্ছে তা-ই নয়, হজমও ক'রে ফেলছে অনায়াসে। এটা অন্তত বোঝা যাচ্ছে ওয়াং আর যা-ই করুক তার খাবারে বিষ মিশিয়ে দিয়ে তাকে মারতে চায় না।

যে-অদ্ভুত কর্মের ভার পড়েছে ওয়াং-এর উপর, তা সম্পন্ন করার সব সুযোগই তার আছে: কিন-কোর শোবার ঘরের দরজা আজকাল হাট করা থাকে, দিন-রাতে যখন খুশি অনায়াসে সে-ঘরে ঢুকতে পারে ওয়াং, ঘুমন্ত বা জাগ্রত — যে-কোনো মুহূর্তেই সে ছোরা বসাতে পারে তাকে। এভাবে যদি ওয়াং তাকে আক্রমণ করে, তাহ'লে যা-যা হ'তে পারে, সব ভেবে দেখেছে কিন-কো: ভগবান করুন ওয়াং-এর হাত যেন ফশকায় না, ছোরাটা যেন সোজা তার বুকে ব'সে যায়। কিন্তু এই ভাবনাটায় কিন-কো দু-এক দিনেই এত অভ্যস্ত হ'য়ে গেলো যে শেষকালে কয়েকদিন পরেই সে দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমোতে লাগলো: রাত্তের বেলা শোবামাত্র গাঢ় ঘুমে ঢ'লে পড়ে, সকালে যখন ওঠে তখন বেশ ঝরঝরে আর হালকা লাগে নিজেকে।

মৃত্যুর মুখ থেকে বেঁচে এই বাড়িতে আশ্রয় পেয়েছিলো ওয়াং, এতকাল কত স্বস্তি-শান্তি পেয়েছে সে এখানে, হয়তো সেই জন্যেই এই বাড়ির ভিতর রক্তপাত করতে তার হাত উঠছে না—অন্তত এই রকমই মনে হ'লো কিন-ফো'র কিছুদিন পরে। ফলে এই মুশকিল আসান করার জন্য, আর তাকে সব দিক দিয়ে সুযোগ ক'রে-দেবার জন্য কিন-ফো রোজ একা শহর ছাড়িয়ে ঘুরে-ঘুরে বেড়াতে যেতে লাগলো—যে-সব রাস্তায় লোক চলাচল কম, সে রাস্তাগুলোই বেছে নেয় সে সব সময়। গভীর রাত অবধি শহরের সবচেয়ে কুখ্যাত পাড়াতে সে সময় কাটায়। রোজ-রোজ সে-সব পাড়ায় রক্তপাত হয়, ছুরি-ছোরা চলে কিন্তু ওয়াংকে সব রকম সুযোগ দেয়া চাই তো! অন্ধকারে সরু গলি দিয়ে ঘুরে বেড়ায় সে শেষরাত অবধি—মাতাল আর নেশাখোরেরা টলতে-টলতে চ'লে যায় তার আশপাশ দিয়ে, ধাক্কা দেয় কখনো, নেশার ঘোরে প্রলাপ বকে—শেষে ভোর হ'য়ে আসে, দূরে ভিখিরিদের খুশি আর হাঁক শোনা যায়—'মান-তো মান-তো'! কিন্তু সব ফিয়াস্কো শেষ থেকেই গিবো বহাল তবিয়তে ফিরে আসে সে, এটা সে এখনো টের পায়নি যে যতই উচ্চ-চর্চিত তার চলাফেরা হোক না কেন, ক্রেগ আর ফ্রাই এই দুই মাসতুতো ভাইয়ের কড়া নজর সে মুহূর্তের জন্য এড়িয়ে যেতে পারে না।

এই ভাবেই ক'দিন কাটতে থাকে, তাহলে—কিন-ফো মনে-মনে চিন্তিত হ'য়ে উঠলো—শেষকালে তার সেই নিস্পৃহ ও নিঃসাড় দিনগুলো না আবার ফিরে আসে! এখন তো ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যাচ্ছে অথচ একবারও সেই আসন্ন মৃত্যুর কথা মনে পড়ছে না।

যে মাসের বারো তারিখে অবশ্যি এমন-একটা ঘটনা ঘটলো, যা তার কল্পনাকে আবার উশকে দিয়ে গেলো। ওয়াং-এর ঘরের দরজার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলো কিন-ফো। হঠাৎ ভিতরে চোখ পড়ে যায় তার, তাকিয়ে ছাখে একটা মস্ত ধারালো ছুরি হাতে নিয়ে ওয়াং আঙুল বুলিয়ে তার ধারটা কেমন আছে পরীক্ষা ক'রে দেখছে, দেখেই মন্ত্রমুগ্ধের মতো থমকে গেলো কিন-ফো: তাকিয়ে দেখলো একটা গাঢ় বেগুনি রঙের অত্যন্ত সন্দেহজনক বোতলে ছুরিটা চুবিয়ে দিলো, ওয়াং তারপর টেনে তুলে শূন্যে সেটাকে উঁচিয়ে ধরলো—আর তার মুখের ভাব বদলে গিয়ে কেমন যেন ভয়ংকর হ'য়ে উঠলো, যেন তার শরীরের সব রক্ত চোখে উঠে এসেছে।

ওয়াং যাতে টের না পায় যে সে সবই দেখতে পেয়েছে, এই ভেবে কিন-ফো তাড়াতাড়ি পা টিপে-টিপে চ'লে গেলো। 'হুম্! এই ব্যাপার তাহ'লে! তা

'ভালোই হ'লো! চমৎকার!'

সারা দিন আর কিন-ফো ঘর ছেড়ে একবারও বেরোলো না, কিন্তু ওয়াং আর কিছুতেই আবির্ভূত হ'লো না। রাত এলো, কিন-ফো শুয়ে পড়লো চটপট; সকাল হ'য়ে এলো—কিন্তু তখনও দিব্য বহালতবিয়তে বেঁচে আছে সে। কিঞ্চিৎ রুষ্টই হ'লো কিন-ফো। ব্যাপারটা বড্ড বিরক্তিকর হ'য়ে উঠছে না? খামকাই এতটা উত্তেজিত হয়েছিলো সে—এখন তার সব অনুভূতিই নষ্ট হ'য়ে যেতে বসেছে! আস্ত একটি লেটলতিফ এই ওয়াং, গড়িমসি ক'রেই দশটা দিন কাটিয়ে দিলে! হচ্ছে হবে ক'রে সময় কাটাতে পারছে সে কী ক'রে? নিশ্চয়ই সাংহাইয়ের ভোগ-বিলাস তাকে একেবারে দুর্বল ক'রে দিয়ে গেছে—বুকের পাটা ব'লে কিছুই আর নেই তার।

ওয়াং এদিকে আরো শুকিয়ে যেতে লাগলো। সব সময়েই মুখ কালো হ'য়ে আছে তার, কেমন যেন বিষণ্ণ আর করুণ হ'য়ে আছে—কেবল ছটফট করে, এক মুহূর্তও যেন স্বস্তি পায় না। অস্থিরভাবে ঘুরে বেড়ায় সে ইয়ামেনে, লাই-চু থেকে দামি কফিনটা এনে যে ঘরে রাখা হয়েছে, বারে-বারে সেই ঘরটায় গিয়ে ঢুকে পড়ে। ইতিমধ্যেই সুনের কাছ থেকে কিন-ফো জেনে গিয়েছে যে ওয়াং নাকি সেই কফিনটার ধুলো ঝেড়ে সাফসুফ ক'রে রেডি করার হুকুম দিয়েছে। ফিশফিশ ক'রে সুন জানালো, 'আপনার আরামের জন্য সব সাফসুফ ক'রে রাখছেন তিনি। আপনার যাতে কোনো কষ্ট না হয়, সেদিকে তাঁর কড়া নজর!'

আরো তিনটে দিন কেটে গেলো, কিন্তু কোনো কিছুই ঘটলো না। তাহ'লে কি ওয়াং একেবারে শেষ দিনে বুকে ছুরি বসাবার কথা ভাবছে? যতক্ষণ না পুরো সময় উৎরোচ্ছে, ততক্ষণ কিছু করার মতলব তাহ'লে তার নেই? আর তা-ই যদি হয়, তাহ'লে তো এই মুহূর্তে মোটেই কোনো বিস্ময় রইবে না।

পনেরো তারিখে আরেকটা অর্থপূর্ণ খবর কানে এলো কিন-ফোর। ১৫ রাতটা তার অদ্ভুত ছটফটানির মধ্যে কেটেছে, সকালে, ছটার সময়, একটা ভারি বিশ্রী মন-খারাপ-করা স্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে গেছে তার: স্বপ্নে দেখে যে নরকের অধীশ্বর যুবরাজ ইয়েন তাকে ডেকে ভীষণ গলায় হুকুম দিচ্ছেন যে তিনি সাম্রাজ্যের আকাশে দ্বাদশ সহস্রতম চাঁদ না-ওঠা পর্যন্ত সে যেন যুবরাজের ধারে-কাছে না-ঘেঁষে। তার মানে আরো একশো বছর বেঁচে থাকতে হবে তাকে, আরো এ ক শো টি ব ছ র! নাঃ, তার সংকল্পে বাধা দেবার জন্যেই যেন সবাই এখন একযোগে ষড়যন্ত্র করছে। ফলে সকালে যখন ঘুম থেকে উঠলো, মেজাজ

তখন হেবিয়া হ'য়ে আছে। সুন যখন সকালে তাকে পোশাক-আশাক পরাতে এলো, তখন তো সে জগতের উপর রেগে টং হ'য়ে আছে!

'বেরিয়ে যা ঘর থেকে — মেরে তাড়াবার আগে বেরিয়ে যা, রাস্কেল!'

এ-ক'দিন সদয় ব্যবহার পেয়ে অভ্যস্ত হ'য়ে গিয়েছিলো সুন; হঠাৎ এই সম্ভাষণ শুনে সে একেবারে আঁৎকে উঠলো। কিন্তু একটা জরুরি খবর পৌঁছে দিতে হবে ব'লে তার আর পশ্চাদপসরণ করা হ'লো না।

'বেরিয়ে যা বলছি,' হুংকার দিয়ে উঠলো কিন-ফো।

'আমি কেবল বলতে চাচ্ছিলুম যে —' সুন শুরু করলো।

'বেরো, বাউণ্ডুলে কোথাকার!' কিন-ফোর গর্জন।

'যে ওয়াং —' সুন তবু বলবার চেষ্টা করলো।

'ওয়াং! হুঁ, তা ওয়াং কী করেছে?' কিন-ফো তার বেণী ধ'রে টান দিলো সজোরে।

বেণীটা উদ্ধার করার জন্য কত রকম কায়দা করলো সুন। যত চোট বুঝি তার বেণীর উপর দিয়েই যায়, এই ভয়ে অস্থির হ'য়ে উঠলো সে। কিন্তু কিন-ফোর বারংবার প্রশ্নের উত্তরে শেষকালে তাকে বলতেই হ'লো, 'আপনার কফিনটা দীপগ্রামের বনভবনে নিয়ে যেতে বলেছেন তিনি।'

হঠাৎ আলোর ঝলকানিতে কিন-ফোর সারা মুখ ভ'রে গেলো। 'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ, সেই হুকুমই তো দিয়েছেন।'

'নে, এই দশটা তায়েল নে। যা, দেখে আয় — ওর হুকুম যেন চটপট পালন করা হয়।'

সুনের আর বিস্ময়ের সীমা রইলো না, তায়েল দশটা কুড়িয়ে নিয়ে সে হুড়মুড় ক'রে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো। কর্তার যে মাথা খারাপ হ'য়ে গেছে, এ-বিষয়ে তার একটুও সন্দেহ নেই। ভাগ্যিস, পাগলামিটা এমন বদান্যতাতেই সীমাবদ্ধ।

এবার কিন-ফো একেবারে নিঃসন্দেহ হ'লো। অবশেষে যে দীর্ঘপ্রতীক্ষিত সংকটকাল আসন্ন, ওয়াং এর এই হুকুমই তার স্পষ্ট প্রমাণ! কিন-ফো নিজে যেখানটায় আত্মহত্যা করতে চাচ্ছিলো, ওয়াং যে তাকে সেখানেই বধ করার সংকল্প করেছে, এ-সম্বন্ধে তার কোনো সংশয় রইলো না। উফ! কী আস্তে যে কাটলো দিনটা — এত বড়ো দিন বোধহয় কোনোদিন আর আসেনি। ঘড়ির কাঁটাগুলো অবধি যেন কুঁড়ের বাদশা হ'য়ে গেছে — নড়তেই চায় না

ঘোটে। কিন্তু তবু এক সময় ছায়া দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হ'লো, রাত নেমে এলো ইয়াঙেনের উপর।

দীর্ঘপ্রাণের বনভবনেই রাত কাটাবার সংকল্প করেছিলো কিন-ফো। ঢোকবার সময় সে স্থির জানতো যে আর সে প্রাণ নিয়ে বেরিয়ে আসতে পারবে না ভিতর থেকে। একটা নরম সোফায় শুয়ে-শুয়ে সে অপেক্ষা করতে লাগলো। আশপাশে কেউ কোথাও নেই, সব কেবল স্তব্ধ, চুপচাপ ও থমথমে, সাত-পাঁচ, কত এলোমেলো কথা মনে প'ড়ে যেতে লাগলো তার, অতীতকে এখন কোন দূর স্বপ্নের মতো মনে হ'লো তার—তেমনি অবাস্তব ও তেমনি ফিনকো পলকা, মনে প'ড়ে গেলো কী ভীষণ নির্বেদ আর নিস্পৃহা তাকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিলো এতকাল, সম্পদের চেয়ে দারিদ্র্যই বা ভালো হ'লো কোথায়? মনে প'ড়ে গেলো লা-ওকে, তার স্মৃতির ভিতর সেই শুধু ধ্রুবতারার মতো উজ্জ্বল, এখনও তার ভালোবাসার কথা মনে প'ড়ে বুকটা কেমন ক'রে উঠলো, নিশ্বাস দ্রুত হ'য়ে এলো, কিন্তু না—তার দুর্দশায় ওই মেয়েকে সে টেনে আনতে চায় না।

রাত নিশুত হ'য়ে এসেছে, সমস্ত প্রকৃতি যেন ঘুমিয়ে পড়েছে কি চেতন কি অচেতন—কেউ কোথাও জেগে নেই। কিন-ফো উৎকর্ণ হ'য়ে শোনবার চেষ্টা করলো। তার চোখ দুটো যেন অন্ধকার ভেদ ক'রে তন্নতন্ন ক'রে কাকে খুঁজতে চাচ্ছে। কতবার যে মনে হ'লো কেউ বুঝি দরজার কুলুপ খোলবার চেষ্টা করছে। আতঙ্ক আর কামনায় মেশানো সে-এক ভীষণ অনুভূতি! ঘুমিয়ে পড়ছে না কেন সে? তার সুপ্তির মধ্যেই না হয় ভাই-লিং-এর সর্বনেশে আবির্ভাব হোক!

কিন্তু আস্তে-আস্তে সকাল হ'য়ে এলো। তখন সূর্য ওঠেনি, কেবল পুব-দিকটায় একটু লাল ছোপ দিয়েছে, এমন সময় হঠাৎ সশব্দে বনভবনের দরজা খুলে গেলো। 'সময় হ'লো তবে এতক্ষণে!' ধড়মড় ক'রে উঠে বসলো কিন-ফো! যেন একটা ছিন্নপ্রায় মুহূর্তের বৃন্তে থরথর করছে তার সমস্ত জীবন।

কিন্তু এ তো ওয়াং নয়! এ যে সুন! তার হাতে একটা চিঠি, আর চিঠির গায়ে বড়ো-বড়ো ক'রে লেখা: 'জরুরি!' 'এক ফোঁটা দেরি না-ক'রে নিয়ে এসেছি,' প্রভুকে জানালো সুন।

কিন-ফো চিঠিটা একরকম ছিনিয়েই নিলে তার হাত থেকে। শান ক্যান্সিকোর ডাকঘরের ছাপ খামের উপর। খাম খুলে চিঠিটায় একবার চোখ

বুলিয়ে নিতেই সব জলের মতো পরিষ্কার হয়ে গেলো তার কাছে। ক্ষিপ্তের মতো ছুটে বেরোলো কিন-ফো ঘর থেকে, ডাক দিলো: 'ওয়াং, ওয়াং!'

তীরের মতো ছুটে গেলো সে দার্শনিকের কোঠায়, পরমুহূর্তেই আবার বেরিয়ে এলো তেমনি সবেগে, তখনো সে গলা ফাটিয়ে ডাক দিচ্ছে: 'ওয়াং, ওয়াং, ওয়াং!'

কিন্তু ওয়াংকে কোথাও পাওয়া গেলো না। তার বিছানা দেখে বোঝা গেলো রাত্তে কেউ তাতে শোয়নি। ডেকে তোলা হ'লো সব লোকজনকে। তন্নতন্ন ক'রে খোঁজা হ'লো গোটা ইয়ামেন—ওয়াং-এর কোনো চিহ্নই পাওয়া গেলো না—অত বড়ো মানুষটা যেন হাওয়ায় উবে গিয়েছে—ঠিক কর্পূরের মতো যেন। ওয়াং যে এখান থেকে পিঠটান দিয়েছে, তাতে আর কোনো সন্দেহই নেই এখন।

১০

কড়া পাহারা

'খুব খাসা,' জানালেন বিড়ুলফ, 'দিলখুশ খাস্‌বাত।' সান ফ্রান্সিসকোর চিঠিটা পাবার পরেই যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেন্টেনারিয়ান-এর প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করতে এসেছে কিন-ফো, স্বাভাবিকভাবে হাত-পা নেড়ে সে আবার বললে, 'মার্কিন ব্যাবসাদারির একটা কারসাজি ছাড়া আর কিছুই নয় এই ব্যাপারটা।'

'তা যা-ই বলুন, তারা যে খুবই চালাক, এটা তো মানবেন,' অত্যন্ত মোলায়েমভাবে জানালেন বিড়ুলফ, 'সবাই বিশ্বাস করে বসেছিলো তো—তাদের চাল তো সফল হয়েছে!'

'অন্তত আমার লোক যে বিশ্বাস করেছিলো, তাতে কোনো সন্দেহ নেই,' বললে কিন-ফো, 'কিন্তু এই চিঠিতে সে জানাচ্ছে হঠাৎ সব লেনদেন বন্ধ ক'রে দেয়াটা ছিলো নাকি ব্যাবসারই একটা চাল।—হুড়মুড় ক'রে শেয়ারের দর শতকরা আশি টাকা প'ড়ে যায়—কিন্তু এক সপ্তাহের মধ্যেই আবার সব কাজকারবার শুরু হয়েছে। ব্যাংক নিজেই সব কমদামে শেয়ার কিনে নিয়েছে—এ-সম্বন্ধে তদন্ত হ'তেই দেখা গেলো যে সব উত্তর তাদের মুখাগ্রে। বাকি অংশীদারদের এবার তারা শতকরা পৌনে দুশো ক'রে মুনাফা দেবে।

এই চিঠি না-পেলে আমি তো ধ'রে ব'সে রইতুম যে একেবারে দেউলে হ'য়ে গেছি।'

'হুম,' বিভুল্ক বললেন, 'আর দেউলে হ'য়ে গেছেন ভেবেই বুঝি আত্মহত্যার সংকল্প নিয়েছিলেন ?'

'অনেকটা তাই—তবে, না, ব্যাপারটা ঠিক তা ছিলো না। যে-কোনো মুহূর্তে খুন হ'য়ে যাবো ব'লেই প্রত্যাশা করেছিলুম আমি।'

'তা আত্মহত্যাই করুন, আর খুনই হোন—মোদ্দা ব্যাপারটা আমাদের কাছে সমান. কড়কড়ে দু-লাখ ডলার লোকশান দিতে হ'তো আমাদের। আপনি যে এখনো বেঁচে আছেন, এইজন্য আপনাকে অভিনন্দন জানাই,' ব'লে খাঁটি মার্কিন কেতায় বিভুল্ক কিন-কোর করমর্দন করলেন।

ম্যানেজারের কাছে এ-বার সব কথাই খুলে বললো মক্কেলটি। একটি নির্ধারিত তারিখের মধ্যে তাকে হত্যা করার জন্য সে যে এক বন্ধুর সঙ্গে চুক্তি করেছে, খুনের জন্য বন্ধুটি যাতে কোনো শাস্তি না-পায় এইজন্য সে যে একটি অভয়পত্র লিখে দিয়েছে—এ-সব কোনো কথাই কিন-কো আর গোপন করলো না।

'কিন্তু বিষম ব্যাপারটা এই-যে,' কিন-কো জানালো,'চুক্তিটা বাহালই আছে এখনো। চুক্তি অনুযায়ী আমাকে খুন করতেই হবে তাকে—আর সে যে মোটেই তার কথার কোনো খেলাপ করবে না, নির্দিষ্ট দিনের মধ্যেই সে যে আমাকে খুন করবে—তাতে আমার কোনো সন্দেহই নেই।'

'তা এই ভাড়াটে আততায়ীটি কি সত্যি আপনার বন্ধু ?' বিভুল্ক জানতে চাইলেন।

'হ্যাঁ। শুধু তাই নয়, আমার মৃত্যুর পর সে পঞ্চাশ হাজার ডলার পাবে।'

'হুম! হ্যাঁ, এবার বুঝলাম। বন্ধুটি নিশ্চয়ই দার্শনিক ওয়াং—আপনার বীমায় যাঁর নাম আছে। কিন্তু তিনি নিশ্চয়ই এমন বিষম কাজ করার মতো লোক নন ?'

কিন-কো আরেকটু হ'লে ব'লেই ফেলতো যে—'আপনি ভুল ভেবেছেন, বিভুল্ক ; আসলে সে একজন তাই-পিং—এর আগে সে এমন-সব দুষ্কর্ম করেছে যে তার শিকাররা সবাই যদি সেণ্টেনারিয়ানের মক্কেল হ'তো, তবে কোনকালেই কম্পানিকে লাল বাতি জেলে পাততাড়ি গুটোতে হ'তো—' কিন্তু অনেক কষ্টে নিজেকে সামলালো কিন-কো—না, ওয়াংকে সে কিছুতেই মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে পারবে না। ওই তাই-পিং বিদ্রোহের রক্তমাখা দিনগুলোর

পর আঠারো বছর কেটে গেছে—কিন্তু তবু এখনো কেউ যদি ঘুণাক্ষরেও জানতে পায় যে ওয়াং ওই তাই-পিংদের একজন ছিলো, তাহ'লে শাসকগোষ্ঠীর রোষ থেকে তার আর নিষ্কৃতি নেই। সে যে ওয়াংএর কৃতকর্মের নজির থেকে জানে ওয়াং যেমন ক'রেই হোক চুক্তির সব নির্দেশ পালন করবে, এ-কথা সে সেইজন্যেই জোর দিয়ে বলতে চাচ্ছিলো না।

একটু ভেবে বিড়ুল্ফ আবার বললেন, 'তাহ'লে আর কি, একটা খুব সোজা রাস্তা খোলা আছে আপনার কাছে—ওয়াংএর্ সঙ্গে গিয়ে দেখা করুন, গিয়ে বলুন যে চুক্তিটা আপনি বাতিল ক'রে দিতে চাচ্ছেন এখন : সব বুঝিয়ে-শুঝিয়ে তার কাছ থেকে ওই অভয়পত্রটা ফেরৎ নিয়ে নিন।'

'ও-কথা বলাই খুব সহজ,' কিন-ফো উত্তর দিলে, 'মুশকিল হচ্ছে এই-যে ওয়াং নিরুদ্দেশ হ'য়ে গেছে, ওর কোনো খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না—কোথায় গেছে কেউ জানে না।'

'হায়-হায়!' বিড়ুল্ফ আর্তনাদ ক'রে উঠলেন, 'তাহ'লে তো বিষম ব্যাপার!' এতক্ষণে তাঁকে কিংকর্তব্যবিমূঢ় দেখালো।

কেউই কোনো কথা বললো না কিছুক্ষণ।

'ধ'রে নিচ্ছি যে এখন আর আপনি খুন হ'তে চান না,' নিস্তব্ধতা ভেঙে বিড়ুল্ফ বললেন।

'ঠিক তার উলটো—কেন চাইবো মরতে? এই সাময়িক ব্যাঙ্কবিপর্যয়ের ফলে আমার সম্পত্তি প্রায় ডবোল হ'য়ে গেছে—আমার বাঁচার ইচ্ছেও তেমনি দ্বিগুণ হয়েছে এখন। শিগগিরি বিয়ে করতে চাই।'

'বটেই তো!' অমায়িকভাবে হাসলেন বিড়ুল্ফ।

'কিন্তু বুঝতেই তো পারছেন ওয়াং-এর কোনো খোঁজ না-পাওয়া অবধি আমি মোটেই নিরাপদ নই। অন্তত যতদিন আমার জীবনবীমার মেয়াদ না-ফুরোয়, ততদিন তো বটেই।'

মৃদু গলায় মন্তব্য করলেন বিড়ুল্ফ, 'ততদিন আমাদের আপিশও মোটেই নিরাপদ নয়।'

'পঁচিশে জুন অবধি আমার জীবন মারাত্মক বিপদের মধ্যে প'ড়ে থাকবে,' কিন-ফো জানালো।

'হ্যাঁ, পঁচিশে জুন পর্যন্ত যত ঝক্কি যত ঝামেলা সব সেন্টেনারিয়ানকেই ভোগ করতে হবে,' দুই হাত মুঠো ক'রে পিছনে নিয়ে আস্তে-আস্তে পায়চারি শুরু করলেন বিড়ুল্ফ।

'বলুন, কী করতে হবে আমাদের,' একটু ভেবে তিনি বললেন, 'যে-ক'রেই হোক আপনার ওই দার্শনিক বন্ধুকে আমাদের খুঁজে বের করতেই হবে—এমনকি যদি তিনি মাটির তলায় গিয়ে লুকিয়ে থাকেন, তবু—'

'যেন খুঁজে বার করতে পারেন, এই কামনা করি,' কিন-ফো উত্তর দিলে।

'আর ইতোমধ্যে আপনাকে রক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে আমাদের—আপনাকে আত্মহত্যার হাত থেকে যেভাবে বাঁচিয়েছি, সেইরকম একটা-কিছু—'

কিন-ফো চমকে উঠলো, 'তার মানে? আপনি কী বলছেন, আমি তো তা কিছুই বুঝতে পারছি না!'

'কেন, যেদিন থেকে আপনি জীবনবীমা করলেন, সেদিন থেকেই তো আমার দুটি লোক আপনাকে সব সময় নজরবন্দী ক'রে রেখেছে। ছায়ার মতো আপনার পিছন-পিছন গেছে তারা সব সময়, কী করেন না-করেন—সব লক্ষ করেছে!'

'আর আমি তা একবারও টের পাইনি!'

'আপনারও যদি গোয়েন্দাগিরিতে ওদের মতো দক্ষতা থাকতো, তাহ'লেই হয়তো টের পেতেন—কিন্তু ওরা খুব সাবধানি লোক। ওরা যে এখন এই আপিশ অবধি আপনাকে অনুসরণ ক'রে এসেছে, সে-বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ নেই। আপনাকে ভিতরে ঢুকতে দেখেছে ওরা—কখন বেরোন এখান থেকে, বেরিয়ে কোথায় যান, সব খোঁজখবর নেবার জন্য নিশ্চয়ই এখন বাইরে দাঁড়িয়ে আছে ওরা।'

'এও কি সম্ভব?' যেন নিজেকেই জিগেশ করলে কিন-ফো।

'ক্রেগ! ফ্রাই!' কণ্ঠস্বর একটুও না-চড়িয়েই বিডুল্‌ফ হাঁক পাড়লেন।

ঘরে এসে ঢুকলো দুজনে।

'আপনার অনুমতি পেলে এদের হাতে আমি এখন একটা নতুন কাজের ভার দিতে চাই। এতক্ষণ এরা আপনাকে আপনার নিজের হাত থেকেই রক্ষা ক'রে আসছিলো—আপনি যাতে আত্মহত্যা ক'রে না-বসেন, সেদিকে কড়া নজর রেখেছিলো এরা; এবার থেকে এরা আপনাকে বহিঃশত্রুর হাত থেকে রক্ষা করবে—এমনভাবে এরা আপনাকে পাহারা দেবে যে ওরাং আপনার গায়ে আঁচড়টিও কাটতে পারবে না।'

এই ব্যবস্থা মেনে না-নিয়ে কোনো উপায় ছিলো না কিন-ফোর, কোনো বিকল্প না। কোনো দ্বিরুক্তি না-ক'রেই গোয়েন্দা দুজন নতুন কাজের ভার নিয়ে নিলো।

এখন তাদের সামনে আশু কর্তব্য কী, এবার তা-ই ঠিক করতে হবে। বিডুল্‌ফের মতে সামনে এখন নাকি দুটো রাস্তাই কেবল খোলা আছে: এক হয় কিন-ফো এখন থেকে রোজ চব্বিশ ঘণ্টা তার বাড়িতেই থাকবে ক্রেগ আর ফ্রাইয়ের পাহারায়—খেয়াল রাখবে যাতে কারু অলক্ষিতে ওয়াং বাড়িতে ঢুকতে না-পারে: আর নয়তো ওয়াংকে তারা তন্নতন্ন ক'রে খুঁজে বার করবার চেষ্টা করবে—ওই ভয়ংকর দলিলটা ওয়াংএর কাছ থেকে উদ্ধার না-করা পর্যন্ত আর-কোনো দিকেই নজর দেবে না।

'তাহ'লে ওয়াংকেই খুঁজে বার করার ব্যবস্থা করুন,' কিন-ফো বললে, 'কনফুসিয়সের এই চেলাটির কাছে ইয়ামেনের সব অন্ধিসন্ধি ফাঁকফোকর জানা—ইচ্ছে করলেই সে অনায়াসে সকলের অগোচরে ভিতরে ঢুকে পড়তে পারবে।'

'হ্যাঁ, সম্ভব হ'লে ওয়াংকে তো খুঁজে বার করবো বটেই,' বিডুল্‌ফ সম্মতি দিলেন, 'কিন্তু আপনাকেও মোটেই চোখের আড়াল করা চলবে না।'

'ওয়া'-এর কোনো অনিষ্ট করবেন না তো আপনারা,' কিন-ফো আবেদন করলো।

'জীবিত বা মৃত—হিড়হিড় ক'রে টেনে আনতে হবে তাকে,' বললে ক্রেগ।

'জ্যান্ত বা মড়া—তাকে খুঁজে বার করতেই হবে,' ফ্রাই প্রতিধ্বনি তুললো।

'মৃতদেহ এনে আর কী লাভ—হয় জীবিত—নয়তো নয়,' কিন-ফো আবার আবেদন করলো।

কর্মসূচি স্থির হ'য়ে গেলে বিডুল্‌ফের কাছ থেকে বিদায় নিলো কিন-ফো; বাড়ি ফেরবার সময় তাকে ইচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছাতেই হোক দেহরক্ষী দুজনকেই সঙ্গে নিতে হ'লো।

সুন যখন আবিষ্কার করলে যে ক্রেগ আর ফ্রাই এখন থেকে ইয়ামেনের মধ্যেই থাকবে, তখন তার আর খেদের সীমা থাকলো না। আর-কোনো প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে না তাকে: তার মানে ওই রজত-মুদ্রাগুলি আর তার বরাতে নেই। আর গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো কিন-ফোও এদিকে পুর্ণোদ্যমে আবার তার আলস্য আর ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য কাঁচি ব্যবহার করতে আরম্ভ ক'রে দিলে। বেচারা সুন! তখনও যদি সে জানতে পেতো ভবিষ্যৎ তার জন্য কী তুলে রেখেছে দিকের!

বাড়ি ফিরেই কিন-ফো প্রথমে পিকিং-এ একটি 'কোনোগ্রাম' পাঠাবার উদ্যোগ করলো। সে যে হৃত সম্পদ আবার ফিরে পেয়েছে এ-কথা জানাতে সে একটুও দেরি করলো না। আবার সেই প্রিয় কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে লা-ও তার আনন্দ যে কোথায় রাখে ভেবেই পেলো না। কোনোগ্রামের মূল বার্তা সম্বন্ধে তার কোনো আকর্ষণ ছিলো না—যে-কণ্ঠস্বর চিরকালের মতো স্তব্ধ হ'য়ে গিয়েছিলো ব'লে ভেবেছিলো আবার তার ধ্বনিস্পন্দন কানে যেতেই সে আহ্লাদে আটখানা হ'য়ে উঠলো। কিন-ফো জানিয়েছে যে সপ্তম চাঁদ দিগন্তের কোলে ঢ'লে পড়বার আগেই সে গিয়ে লা-ওর পাশে দাঁড়াবে—আর-কোনো দিনও মুহূর্তের জন্ম তার পাশ ছেড়ে যাবে না তারপর; কিন্তু তার আগে লা-ওকে দেখতে যাবার উপায় নেই তার, কারণ দ্বিতীয়বার লা-ওকে বিধবা করতে চায় না সে।

চিঠির শেষ কথাগুলোর অবশ্য কোনো মর্মোদ্ধার করতে পারলো না লা-ও। কিন্তু তার ভালোবাসার ধন সে যে আবার ফিরে পাবে, আর কখনো যে তাকে তার হারাতে হবে না—এই কথা জেনেই সে সেদিন পিকিং-এর সবচেয়ে সুখী তরুণী হয়ে উঠলো।

কিন-ফোর সমস্ত জীবন এরমধ্যেই আদ্যোপান্ত বদলে গেছে। তার রূপান্তর, যাকে বলে, এখন অতি সম্পূর্ণ। হৃত সম্পদ ফিরে পেতেই তার জীবনদর্শনই বদলে গিয়েছে একেবারে: এই সেদিন কোয়াংতুঙে সে তার যে বন্ধুদের ভোজসভায় আপ্যায়িত করেছিলো, তারা যদি তাদের সেই নিস্পৃহ ও নিরুত্তাপ বন্ধুকে এখন দেখতে পেতো, তাহ'লে কিছুতেই চিনতে পারতো না। আর ওয়াং? সে হয়তো কিন-ফোকে দেখে নিজের কাণ্ডজ্ঞান ও পঞ্চেন্দ্রিয়কেই অবিশ্বাস করতে শুরু ক'রে দিতো।

ওয়াং-এর কোনো চিহ্নই কোনো হদিশই পাওয়া যায়নি এখনো। সবগুলি বিদেশী বসতি, হাট-বাজার, রাস্তা-ঘাট, উপকণ্ঠ ও শহরতলি তন্নতন্ন ক'রে খোঁজা হ'লো—শাংহাইয়ের সব কোনাখামচিতে সন্ধান করা হ'লো—তার পাত্তা পাবার জন্ম অভিজ্ঞ ও বিচক্ষণ সব 'তি-পাও' বা গুপ্তচর লাগানো হ'লো—কিন্তু কিছুই ফল হ'লো না—কোনো সূত্র, বা ইঙ্গিত বা চিহ্নই পাওয়া গেলো না তার।

ক্রেগ আর ফ্রাই ক্রমেই কি-রকম অস্থির হ'য়ে উঠলো; সব দেখেশুনে বড্ড অস্বস্তি লাগছে তাদের; ফলে তারা আঠার মতো লেগে রইলো কিন-ফোর সঙ্গে—তার সঙ্গে শোয়, পারলে এক কাপড়ই বুঝি পরে; সেহ্ভিন্ন ছাড়া

আর-কিছু খেতে নিষেধ করলো তারা কিন-ফোকে—সেহ জিবে নাকি বিষ মেশাবার উপায় থাকে বড় তারা বোঝাতে চেষ্টা করলো কিন-ফোকে। এত সব বাধা-নিষেধের বিরুদ্ধে কিন-ফোর সমস্ত অন্তরাত্মা বিদ্রোহ ক'রে উঠলো। এ তো সেন্টেনারিয়ানের লোহার সিন্দুকে বন্দী হ'য়ে থাকার শামিল—তাহ'লে এই দু-মাস সেখানে থাকলেই হয়,—প্রত্যুত্তরে এই কথাই সে বললো তাদের।

কম্পানির স্বার্থের কথা বিবেচনা ক'রে বিজুল্ক অবশ্য একবার বলেছিলেন যে কিস্তির টাকা ফিরিয়ে দিয়ে না-হয় বীমার পলিসিটা বাতিল ক'রে ফেলা হোক। কিন-ফো কিন্তু সে প্রস্তাবে কিছুতেই কর্ণপাত করলো না। একবার যখন চুক্তি হয়েছে, তখন তার সমস্ত ফলাফলও ভোগ করতে হবে—বেগতিক দেখে তা আর খারিজ করা চলবে না। তাকে একটুও টলাতে না-পেরে বিজুল্ক শেষটায় হাল ছেড়ে দিলেন, তবে তাকে নিশ্চিন্ত করার জন্ত বললেন যে যে-কম্পানির প্রতিনিধিত্ব করতে পেরে তিনি গর্ব অনুভব করেন, কিন-ফো যে সেখানেই বীমা করেছে, এটা তার মস্ত সৌভাগ্যেরই লক্ষণ।

১১

বজ্রাঘাতের চক্রান্ত

· যখন কয়েক দিন চ'লে গেলো, অথচ ওয়াং-এর কোনো সন্ধানই পাওয়া গেলো না, কিন-ফো তখন তার উপর চাপিয়ে-দেয়া এই নিষ্কর্ম বন্দীদশায় অত্যন্ত বিরক্ত ও উত্তেজিত হ'য়ে উঠলো। বিজুল্ক নিজেও কিঞ্চিৎ উদ্বেগ ও অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন। প্রথমটায় যদিও ভেবেছিলেন যে ওয়াং নিশ্চয়ই ওই ভীষণ কর্মটি কদাচ সম্পন্ন করবে না, তবু এখন ক্রমে-ক্রমে তার বিশ্বাস হ'তে লাগলো যে চিনদেশে এমনকি মার্কিন মুলুকের চেয়েও অনেক তাজ্জব ব্যাপার অনেক অদ্ভুত ঘটনা অনায়াসে ঘ'টে যায়, শেষকালে কিন-ফোর মতেই সায় দিলেন তিনি: ওয়াং-এর এই রহস্যময় অজ্ঞাতবাস আসলে তার মারাত্মক পুনরাবির্ভাবেরই পূর্বাভাস, আকস্মিক বজ্রাঘাতের মতো অবতীর্ণ হ'য়ে হঠাৎ সেই চরম আঘাতটি হেনেই সেন্টেনারিয়ানের আপিসে গিয়ে সে তার প্রাপ্য অর্থ দাবি করতে চাইবে বোধহয়।

প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ, সব ভাবে বা কোনো বিশেষভাবে—যেমন ক'রেই হোক তার এই অভিসন্ধিকে ব্যর্থ করতে হবে, হবেই—ভাবলেন বিজুল্ক। কাজে

বিজ্ঞাপন দিলেন তিনি। শুধু যে 'পিকিং হরকরা,' 'ৎচিং-পাও' ও হংকং আর শাংহাইয়ের সবখবরের কাগজেই যে বারবার বিজ্ঞাপন দিলেন তিনি তা নয়, ইওরোপ আমেরিকারও সব কাগজে তার ক'রে বিজ্ঞাপন পাঠালেন তিনি। প্রথম বিজ্ঞাপনটির পাঠ ছিলো এ-রকম : 'শাংহাই-নিবাসী কিন-ফোর সঙ্গে ওয়াংএর যে-চুক্তিটি সম্পাদিত হয়েছিলো, কিন-ফো যেহেতু এখন একশো বছর বাঁচতে চান, সেহেতু তা এতদ্বারা খারিজ করা হ'লো।'

এই বিজ্ঞাপনটির পরেই বেরোলো আরেকটি ঘোষণা :

'দু-হাজার ডলার পুরস্কার

এত দ্বারা ঘোষণা করা যাচ্ছে যে শাংহাই-নিবাসী ওয়াং-এর বর্তমান গতিবিধি ও বাসস্থান সম্পর্কে নিম্নোক্ত ঠিকানায় যিনি খবর দিতে পারবেন, তাঁকে তেরোশো তায়েল বা দু-হাজার ডলার পুরস্কার হিশেবে দেয়া হবে।—উইলিঅম জে. বিড়ুলফ, সেন্টেনারিয়ান ইনশিওরেন্স কম্পানি, শাংহাই।'

চুক্তি সম্পাদন করবার মাত্র অল্প কয়েক সপ্তাহ বাকি আছে ব'লে ওয়াং-এর পক্ষে কোনো দূর দেশে চ'লে-যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই কম ; আশপাশে কোথাও সে ঘাপটি মেরে লুকিয়ে আছে, এটাই বোধকরি বেশি সম্ভাব্য—সুযোগ পেলেই ঘাঁটি থেকে বেরিয়েই শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। কিন্তু বিড়ুলফ তাই ব'লে কোনো সম্ভাবনাকেই বাজিয়ে না-দেখে ছেড়ে দেবার পাত্তর নন।

বিজ্ঞাপনগুলো ক্রমেই চারদিকে চাঞ্চল্য আর সাড়া তুলতে লাগলো। একদিন সকালে একটা বিজ্ঞাপন বেরোলো, যার উপরে বড়ো-বড়ো হরফে ছাপা :

'ওয়াং! ওয়াং! ওয়াং!'

আর ঠিক তার পরের বিজ্ঞাপনের উপর ছাপা হ'লো :

'কিন-ফো! কিন-ফো! কিন-ফো!'

আর তার ফলে এই হ'লো যে অচিরেই ওয়াং আর কিন-ফো চিন-মুলুকে দুটি বিষম কুখ্যাত নামে পরিণত হ'য়ে গেলো।

'ওয়াং কোথায় হে?'

'ওয়াং-এর মৎলবটা কী বলো তো?'

'কোনো পাত্তা পেলে ওয়াং-এর?'

কারু সঙ্গে দেখা হ'লেই এই হাস্তকর কথা ছাড়া আর-কিছু শোনা যায় না। শেষকালে এমনকি ছোটোদের মধ্যেও উত্তেজনাটা ছড়িয়ে পড়লো, রাস্তায় ছুটোছুটি করতে-করতে তারা শোর তুললো: 'ওয়াংকে কে দেখেছে, জানিস?'

কিন-ফোর নামও কম কুখ্যাত হয়নি তাই ব'লে। একশো বছর বাঁচতে চায়, কথাটা প্রকাশ্যে ঘোষিত হবার সঙ্গে-সঙ্গেই সে লোকের টিটকিরির পাত্র হ'য়ে উঠলো। বিশ বছর ধ'রে রাজার হাতিশাল-আলো-ক'রে-থাকা হস্তী-শাবকটির নতুন প্রতিদ্বন্দ্বী জুটলো অবশেষে—লোকে বললো; রাজকীয় পীতবসনের নতুন আরেক দাবিদার গজালো তাহ'লে, মান্দারিন কি ব্যাবসা-দার, ভবঘুরে কি নৌ-নিবাসী—সকলেই কিন-ফোর নাম ক'রে ঠাট্টা করতে শুরু ক'রে দিলো। 'উইলো বনের হাওয়া' গানের এক প্যারোডি বা টিটকিরি তৈরি হ'লো তার নামে,'শতবর্ষের বুড়ো' নামে হাসির গানটা এত জনপ্রিয় হ'য়ে উঠলো যে তিন পাপেক দামে গানটা বেচে গীতিকারটি দু-দিনেই বড়োলোক হ'য়ে গেলো। চিনমুলুকের লোকেরা এমনিতেই আমোদ-আহ্লাদ খুব ভালোবাসে; ঠাট্টা টিটকিরিতে তাদের কখনো অরুচি জাগে না, ঠাট্টা করার সুযোগ পেলে এমনকি কারু ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও মন্তব্য করতে ছাড়ে না: কিন্তু এই বিজ্ঞাপনগুলো তাদের যেমন হাসির খোরাক জোগালো তার আর কোনো তুলনাই হয় না।

এই হৈ-চৈ আর চাঞ্চল্য দেখে অবশ্য বিভুলফ অত্যন্ত তুষ্ট হলেন, তাঁর সব অভিপ্রায়ই এতে সার্থক হ'লো। অবশ্য ওয়াং-এর উপর তার প্রতিক্রিয়া কী হ'লো তা কেউ জানে না, কিন্তু বেচারা কিন-ফোর কাছে এই কুখ্যাতি অর্জন রীতিমতো অপ্রীতিকর ও বিরক্তিজনক হ'য়ে উঠলো। রাস্তা দিয়ে হাঁটা-চলাই মুশকিল হ'য়ে উঠলো তার পক্ষে: তাকে রাস্তায় দেখলেই বেকার আড্ডাখোরেরা চারপাশে ভিড় ক'রে, এমনকি শহর ছাড়িয়ে শহরতলির রাস্তা দিয়ে অনেকদূরে চ'লে গেলেও ওই ভিড়ের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যায় না; শেষকালে বিরক্ত হ'য়ে যখন ইয়ামেনে ফিরে আসে, তখন একপাল লোক তার পিছু-পিছু এসে ফটকের কাছে দাঁড়িয়ে থেকে নানা রকম মন্তব্য হানে। রোজ সকালে তুলকালাম শোরগোল ক'রে তার উদ্দেশে হাঁক পাড়ে শাংহাইবাসীরা: তারা স্বচক্ষে দেখে যেতে চায় যে রাতের অন্ধকারে কফিনে

খাবার দশা হয়নি তার; রোজ খবরের কাগজে তার খবর বেরোয়, রাজা-বাদশাদের খাদ্যপত্রের মতো; লোকের মনোযোগ এড়িয়ে কোনো-কিছু করার অবস্থা তার আর রইলো না। এই অসহনীয় পরিস্থিতিকে মানিয়ে নেবার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কারু যদি একটা মুহূর্তও নিজস্ব ও ব্যক্তিগত না-থাকে, তাহ'লে বেঁচে-থাকাই দুর্বহ হ'য়ে দাঁড়ায়। একুশ তারিখে সকাল-বেলায় তাই সে হন্তদন্ত হ'য়ে বিড়ুলফের আপিশে গিয়ে হাজির হ'লো; গিয়েই কোনো ভূমিকা না-ক'রে মূল কথাটি পেড়ে বসলো সে—এই মুহূর্তে সে শাংহাই ত্যাগ ক'রে চ'লে যাবে।

কম্পানির স্বার্থের কথা ভেবে-ভেবে বিড়ুলফের তখন চোখে ঘুম নেই; কিন-ফোর সংকল্প শুনে তাঁর চোখ কপালে উঠলো। এতে যে সে কী মহাবিপদের সম্মুখীন হবে, এটাই তিনি তাকে ভালো ক'রে বোঝাতে চাইলেন।

'বিপদে পড়তে হয় পড়বো—তার আর কী করবেন?' বললে কিন-ফো, 'কিন্তু আমি এই ঝুঁকি নেবোই—আপনি না-হয় আরো সাবধান হবার ব্যবস্থা করুন।'

'কিন্তু একবার ভেবে দেখুন,' বিড়ুলফ আবেদন করলেন।

কিন-ফো বাধা দিয়ে বললে, 'আমি যাবোই!'

'কোথায়?'

'জানি না। যে-দিকে দু-চোখ যায়।'

'কোথায় উঠবেন? থামবেন কোথায়?'

'কোথাও না।'

'ফিরবেন কবে?'

'আর ফিরবোই না।'

'কিন্তু যদি ওয়াংকে খুঁজে বের করতে পারি আমরা?'

'গোল্লায় যাক ওয়াং!'

'কিন্তু আপনার চুক্তির কথাটা একবার ভেবে দেখুন!'

'যেমন এক আকাট উজবুক ছিলুম, আস্ত বোকা ছিলুম, তাই এই ফল ভোগ করছি এখন!'

'কিন্তু এখনো হয়তো ওয়াংকে পাকড়াও করতে পারবো আমরা।'

'জাহান্নামে যাক ও!'

ভিতরে-ভিতরে কিন-ফো যে তীব্রভাবে চাচ্ছিলো ওয়াং ধরা পড়ুক, এটা

স্বীকার ক'রে নেয়াই ভালো। তার জীবন যে অন্ত লোকের মর্জির উপর সুতোর ডগাতে ঝুলে-ঝুলে দোল খাচ্ছে, এই জ্ঞানটাই এখন তার চিরযন্ত্রণার মূল কারণ। যুদ্ধ-বিগ্রহের অরাজক অবস্থার চেয়েও অনেক খারাপ অবস্থা এটা—আরো একমাস এমনি ভয়ংকর উৎকণ্ঠায় কাটাতে হবে ভাবলেই তার সর্বাঙ্গ হিম হ'য়ে আসে, বুকের রক্ত জল হ'য়ে যায়।

'সত্যি যেতে চান আপনি?' আবার গোড়া থেকে শুরু করলেন বিভুল্‌ক।

'আপনাকে তো বলেইছি আমি,' বললে কিন-ফো।

'ক্রেগ আর ফ্রাইকেও যে আপনার সঙ্গে যেতে হবে, তা জানেন নিশ্চয়ই?'

'সে আপনার মর্জি। আমি কেবল এটুকু জানিয়ে দিচ্ছি যে ওদের খুব হন্তদন্ত হ'য়ে ছুটে বেড়াবার জন্তে তৈরি থাকতে হবে।'

'যেতে তাদের হবেই,' আবারও জানালেন বিভুল্‌ক, 'আপনি বললেই তারা তৈরি হ'য়ে নেবে।'

ইয়ামেনে ফিরে এসেই কিন-ফো যাত্রার জন্ত তোড়জোড় শুরু ক'রে দিলো। সুন যখন শুনলো যে তাকেও প্রভুর সঙ্গে এই নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরুতে হবে, তখন তার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়লো, কুঁড়েমি করার চেয়ে ভালো জিনিশ কিছু আছে? হন্তদন্ত হ'য়ে ছোটাছুটি করার চেয়ে জঘন্ত বোধহয় আর-কিছু নেই—অন্তত সুনের সুচিন্তিত অভিমত ছিলো তা-ই। কিন্তু সাধের সেই শূকরপুচ্ছ বা বেণীটির প্রতি মমতা তার কিঞ্চিৎ বেশি ছিলো ব'লেই বেচারি কোনো প্রতিবাদ বা গাঁইগুঁই করার সুযোগ পেলে না।

একটু পরেই খাটি মার্কিন ক্ষিপ্রতার নজির হিশেবে যাত্রার জন্ত তৈরি হ'য়ে ক্রেগ আর ফ্রাই এসে হাজির।

'কোন দিকে—' শুরু করলো ক্রেগ।

'যেতে হবে আমাদের?' শেষ করলো ফ্রাই।

'প্রথমে তো নানকিং, তারপর সেখান থেকে গোআয়,' একটু যেন তীক্ষ্ণভাবেই ব'লে উঠলো কিন-ফো।

শুনে গোয়েন্দাযুগল পরস্পরের মধ্যে অর্থপূর্ণ হাস্ত বিনিময় করলো। পরে যখন জানলো যে সন্ধের আগে কিন-ফোর পক্ষে আর রওনা হওয়া হবে না, তখন দুজনে বিভুল্‌কের সঙ্গে কিঞ্চিৎ শলাপরামর্শ ক'রে আসতে গেলো; তা ছাড়া চৈনিক পোশাক প'রে নেবারও মৎলব ছিলো তাদের—মার্কিন পোশাক বড্ড সহজে চোখে প'ড়ে যায়। গেলো, আর এলো—হাতে ব্যাগ, কোমরে রিভলভার গুঁজে একেবারে যেন উড়তে-উড়তে ফিরে এলো দুজনে।

তখন সন্ধে হ'য়ে আসছে, ছোট্ট দলটি বেরিয়ে পড়লো। যতদূর সম্ভব লোকের চোখ এড়িয়ে মার্কিন বসতির বন্দরটায় গিয়ে হাজির হ'লো তারা। শাংহাই থেকে নানকিং পর্যন্ত স্টিমারে যাবে তারা; আবহাওয়া ভালো থাকলে এটুকু পথ যেতে তাহ'লে বারো ঘণ্টাও লাগবে না।

কিন্তু বেশিক্ষণ না-লাগলে কী হয়, ক্রেগ আর ফ্রাই কোনো সামান্য বিষয়কেও অবহেলা করতে রাজি নয়: তাদের জিম্মায় যে-চৈনিক যুবকটি রয়েছে, তার গায়ে যাতে আঁচড়টিও না-লাগে, সেই জন্য সব যাচিয়ে-বাজিয়ে না-দেখে কিছুতেই তুষ্ট হয় না। জাহাজের অন্য যাত্রীদের সবাইকে ভালো ক'রে খুঁটিয়ে দেখা তারা প্রথম কর্তব্য ব'লে মনে করলো। শাংহাইতে অনেক দিন আছে ব'লে ওয়াং-এর সৌম্য অমায়িক মূর্তি তাদের অচেনা ছিলো না; যতক্ষণ না তারা নিশ্চিত হ'লো যে ওয়াং ছদ্মবেশে এসে এই জাহাজে ওঠেনি, ততক্ষণ তারা নিশ্চিন্ত হ'লো না। ওয়াং সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হ'য়ে তারা কিন-ফোর ব্যক্তিগত নিরাপত্তার উপর কড়া নজর দিলো। কিন-ফো হেলান দিয়ে দাঁড়ালে যাতে ভেঙে প'ড়ে না-যায়, সেইজন্য রেলিংগুলো কেমন শক্ত, তা তারা পরখ ক'রে দেখলো। পাটাতনের প্রত্যেকটা কাঠ যাচিয়ে নিলো তারা, যাতে কিন-ফো চলতে গেলে ভুম ক'রে ভেঙে না-যায়; ইঞ্জিনের কাছে তো তাকে কিছুতেই যেতে দিলো না তারা, কখন বয়লার ফেটে যায় তার ঠিক কী! রাতের কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়ায় ডেকে এসে দাঁড়ালে তারা গজগজ করতে লাগলো—ঠাণ্ডা লাগিয়ে অসুখ করলেই হয়েছে! তার কামরার ঘুলঘুলিগুলো ভালো ক'রে আঁটা আছে কিনা দেখে নিলো তারা এক-এক ক'রে। নিজেরাই তার চা-জলখাবার ব'য়ে নিয়ে গেলো, যাতে কেউ বিষ মেশাতে না-পারে। আর সর্বদায় প্রভুর কর্মে অবহেলা করার দরুন সুনকে একযোগে তারা ধমকাতে লাগলো। শেষ-কালে জামাকাপড় না-ছেড়েই, কোমরে লাইফ-বেল্ট বেঁধে দরজার কাছে শুয়ে রইলো তারা, যাতে ধাক্কা লেগে, বয়লার ফেটে বা অন্য-কোনো কারণে জাহাজ চুরমার হ'য়ে গেলে কিন-ফোর জলে-ডুবে-মরার সম্ভাবনা হ'লে তারা সেই দৈব অভিপ্রায়ে বাদ সাধতে পারে।

নির্বিঘ্নেই অবশ্য নানকিং পৌঁছোলো তারা। এমন-কিছুই ঘটলো না, যাতে তাদের এত সাবধানতার সত্যিকার কোনো পরীক্ষা হয়। উয়ো-সুং পেরিয়ে এলো জাহাজ চট ক'রে; ইয়াং-ৎসিকিয়াং বা নীল নদীর মোহনায় ঢুকে পড়লো নির্বিঘ্নে; ৎসিং-সিং দ্বীপ পেরিয়ে, ও-সুং আর সাং-চানের আলো দূরে ফেলে রেখে পরদিন প্রাতঃকালে সেই প্রাচীন নগরের জেটিতে গিয়ে ভিড়লো জাহাজ।

কিন-কো যে শাংহাই ছেড়ে প্রথমেই নানকিংয়ের উদ্দেশে বেরিয়ে পড়েছিলো, তার পিছনে একটা সুস্পষ্ট উদ্দেশ্য ছিলো। এককালে এই পুরোনো নগর ছিলো ৎচাং-মাও বিদ্রোহের প্রধান ঘাঁটি; এখনো হয়তো সেখানে বিপ্লবের সঙ্গে জড়িত কেউ-কেউ গোপন ঘাঁটি বানিয়ে ব'সে আছে, কে জানে ওয়াং হয়তো শা'হাই ছেড়ে নানকিঙেই চ'লে আসার কথা ভেবেছিলো। নগরীর অতীত ইতিহাস যেন রক্তে গোলা আখরে। এখানেই প্রাক্তন শিক্ষক হুং-সিউ-ৎসিন তাই-পিংদের নেতৃত্ব দিয়ে মাঞ্চু শাসকদের দীর্ঘকাল প্রতিরোধ করেছিলেন: এখানেই ১৮৬৪ সালে শত্রুপক্ষের হাতে পড়ার ভয়ে বিষ খেয়ে তিনি আত্মহত্যা করেন, এখানেই মহাশান্তির নব যুগ ঘোষিত হয়েছিলো একদা, পরে সেখান থেকে হুং-সিউ-ৎসিনের ছেলে পালিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু তাতার শাসকরা পরে যাঁকে গ্রেপ্তার ক'রে শিরশ্ছেদ করেছিলো। আর তাঁর সেই অস্থিচূর্ণ যে কবর থেকে তুলে এনে শেয়াল-কুকুরের মধ্যে শ্মশানে-মশানে ছড়িয়ে দেয়া হয়েছিলো—সে তো এখানেই। অর্থাৎ নানকিং কি আসলে তার ভগ্নস্তূপের মধ্যে ওয়াং-এর শত সহস্র বিপ্লবী বন্ধুদের লুকিয়ে রাখার চেষ্টা করেনি—তিন দিন সবল প্রতিরোধ করার পর ঠাণ্ডা মাথায় তাতাররা যাদের নির্দয়ভাবে নিধন করেছিলো? এটা তো অত্যন্ত স্বাভাবিক—কিন-কো মনে-মনে আলোচনা করলো—যে, ওয়াং প্রথমে এখানেই এসে আশ্রয় নিতে চাইবে। ঘরে ফেরার প্রবল আকুতি যদি হঠাৎ তাকে ছিঁড়ে খেতে থাকে, তাহ'লে এখানে এসেই কি সে অতীতের লুপ্ত ধূসর বিধুর সৌগন্ধ নিতে চাইবে না বুক ভ'রে? তার ওই রক্তরাঙা প্রতিশ্রুতি পালন করার জন্য এই অতীতের স্মৃতি ও চিরপরিচিত পরিবেশের মধ্যে ফিরে এসেই কি সে শক্তি ও প্রেরণা লাভ করার চেষ্টা করবে না, যাতে একদিন সাহসে বুক বেঁধে বজ্রের মতো শাংহাইতে নেমে পড়তে পারে?

কিন্তু অন্য কোথাও যাবার আগে প্রথমে নানকিং-এ আসাটা আরো-একটা কারণে ভালো হ'লো। এখানেই যদি ওয়াং-এর সন্ধান পাওয়া যায়, তাহ'লে তো কথাই নেই, অত্যন্ত ভালো হবে, তক্ষুনি সব মুশকিলই আসান হ'য়ে যাবে। কিন্তু তা না-হ'লে কিন-কো বরং এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ক্রমাগত ঘুরেই বেড়াবে, যাতে নির্দিষ্ট সময়টা অতিক্রম ক'রে নির্ভয় হ'য়ে যাওয়া যায়।

ডাঙায় নেমেই কিন-কো তার দলবল নিয়ে শহরের অর্ধ-পরিত্যক্ত অঞ্চলের এক হোটেলে গিয়ে উঠলো। হোটেলটার আশপাশে প্রাচীন রাজধানীর ভগ্নস্তূপ প'ড়ে আছে—বন্য, বিমর্ষ ও ভয়াবহ।

'আগে থেকে তোমাদের একটা কথা ব'লে নিই,' অনুচরদের বললো সে একসময়, 'এটা মনে রেখো যে এখন আমি ছদ্মনামে ঘুরে বেড়াচ্ছি ; কোনো কারণেই কেউ আমাকে কিন-ফো ব'লে ডাকতে পারবে না। এখন থেকে আমার নাম কি-নান।'

'তাই হবে,' সুন জানালো।

'কি-নান,' ক্রেগ আর ফ্রাই নামটা ভাগাভাগি ক'রে পুনরাবৃত্তি ক'রে নিলো একবার।

ইদানীং লোকজন তাকে যেভাবে জ্বালাতন করেছে, তাতে সে যে উত্ত্যক্ত হ'য়ে তার হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য সব দিকেই নজর দেবে, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। সে যে আসলে নানকিঙেররাস্তায় ওয়াং-এর দেখা পাবে ব'লে প্রত্যাশা করছে, ঘুণাক্ষরেও এ-কথা সে কারু কাছে প্রকাশ করলো না। এটা সে বুঝেছিলো যে একবার যদি ক্রেগ আর ফ্রাই এ-কথা জানতে পারে তাহ'লে নতুন ক'রে আরো হাজারো বাধা-নিষেধের মধ্যে তাকে হাঁপিয়ে উঠতে হবে। ওই গোয়েন্দা দুজনের চোখে সে যেন সামান্য একটা মালের বস্তা ছাড়া আর-কিছু নয়—যে-ক'রেই হোক সব বিপদ-আপদের হাত থেকে রক্ষা ক'রে নিরাপদে এই মাল যথাস্থানে পৌঁছে দিতে হবে—তাদের উপর যেন এই দায়িত্ব বর্তেছে, অন্তত এটাই তাদের ভাবভঙ্গি।

শহরে ঘুরে বেড়াতেই সারা দিন কেটে গেলো তাদের। উত্তর থেকে দক্ষিণে, পুব থেকে পশ্চিমে—ভগ্নপ্রায় ও মুমূর্ষু শহরটাকে তারা আদ্যোপান্ত দেখে নিলো প্রথমে, তার হতশ্রী জীর্ণদশায় সেই প্রাচীন জাঁকজমক ও সমৃদ্ধির কিছুই আর নেই এখন। কিন-ফো খুব তাড়াতাড়ি হাঁটলো সারাক্ষণ ; কথা বললো খুব কম, সব সময় চোখকান খোলা রেখে কেবল যে প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ দেখতে-দেখতেই গেলো তা নয়, পথচারীদের ভাবভঙ্গি চলনবলন লক্ষ করতেও সে ভুললো না।

কিন্তু যে-অতিচেনা মুখটিকে সে খুঁজে বেড়াচ্ছিলো তাকে কোথাও দেখা গেলো না। খালে-বিলে নৌকোয়-শাম্পানে যারা থাকে, তাদের মধ্যে যেমন ওয়াং-এর কোনো হদিশ নেই, তেমনি অন্ধকারে গলিঘিঁজিতেও সেই পলাতক মানুষটির চিহ্ন পাওয়া গেলো না। কিন-ফো যেন আশ্চর্য-কোনো বর্ম প'রে এসেছে যার ফলে ক্লান্তি বা অবসাদ তাকে স্পর্শই করতে পারছে না। সুন বেচারা সারাক্ষণ ভারি ও অনিচ্ছুক পায়ে হাঁপাতে-হাঁপাতে তাকে অনুসরণ করলো। আর ক্রেগ আর ফ্রাই যদিও ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিলো, তবু তার

কোনো দ্বিরুক্তি না-ক'রেই তার সঙ্গে-সঙ্গে গেলো। এককালে যেখানে রাজবাড়ি ছিলো, এখন সেখানে তারা দেখলো কেবল মারবেল পাথরের ভাঙা বাহিরবাড়ি আর আধ-পোড়া দেয়াল। দেখতে পেলো ক্যাথলিক মিশনারিদের ইয়ামেন—১৮৭০ সালের অভ্যুত্থানের সময় আরেকটু হ'লেই তাতার-বাহিনীর হাতে তাদের মরতে হ'তো। এককালে এখানে পোর্সেলেনের যে-তোরণটা ছিলো, এখন সেই পোর্সেলেনের চিরস্থায়ী ইট দিয়ে কামানের কারখানা বানানো হয়েছে: তাও তারা পেরিয়ে গেলো, তারপর অনেক ঘোরাঘুরির পর তারা নগরীর পূর্বতোরণ পেরিয়ে গ্রামাঞ্চলে এসে পৌঁছোলো।

এখানে এসে কিন-ফোকে একবার থমকে গিয়ে চারপাশে তাকাতে হ'লো। শহর পেরোবার সঙ্গে-সঙ্গে মস্ত এক শান-বাঁধা রাস্তায় এসে পড়েছে তারা—দু-পাশে গ্র্যানাইট পাথরের মস্ত সব মূর্তি চ'লে গেছে সারি-সারি—সব জন্তু-জানোয়ারের মূর্তি—অতিকায় হস্তীযূথ, বন্য মহিষ, উটের পাল, ভীষণ ড্র্যাগন—কিছুই ভাস্করদের কল্পনাকে এড়িয়ে যেতে পারেনি। এই পথ ধ'রে এগোতে-এগোতে দূরে সে দেখতে পেলো ছোট্ট একটা মন্দির—মস্ত একটা টিলা উঠে গেছে তার পিছনে—টিলা না-ব'লে পাহাড় বলাই বোধকরি সংগত। পাহাড়টা আসলে গোরস্থান। সমাধিটা আসলে পুরোহিতরাজ হং-ঙ-র, পাঁচশো বছর আগে যিনি বৈদেশিক জোয়ালের বিরুদ্ধে প্রবল বিদ্রোহ ঘোষণা করেছিলেন। কিন-ফো তার মনোভাব আর চেপে রাখতে পারলে না। আবার নরকে হাত বাড়াবার আগে ওয়াং কি এই পুণ্য সমাধিতে তীর্থভ্রমণে না-এসে পারবে? কিন-ফোর মনে হ'লো এক্ষুনি বুঝি ওই ভগ্ন ও বনাকীর্ণ সমাধি ফুঁড়ে বেরিয়ে ওয়াং তার সামনে এসে দাঁড়াবে।

কিন্তু না—কেউ কোনোখানে নেই, বিজন মন্দিরটি খাঁ-খাঁ করছে: ওই অতিকায় পাথরের মূর্তিগুলোই শুধু মন্দিরের দ্বারী হিশেবে দাঁড়িয়ে আছে দু-ধারে, আশপাশে জীবন্ত কোনো জনপ্রাণীর চিহ্নও দেখা যায় না।

ফিরে আসবে ব'লে ভাবছিলো কিন-ফো, হঠাৎ মন্দিরের দরজায় কী-সব লেখা আছে দেখে থমকে দাঁড়ালো; সাগ্রহে এগিয়ে গিয়ে ভাখে কে যেন কতগুলি কথা খোদাই ক'রে গেছে এখানে—একেবারে টাটকা এই লেখা, যেন এইমাত্র কেউ এই হরফগুলো খোদাই ক'রে গেছে: ও. ক. ফ.।

আর-কোনো সন্দেহই নেই। ওয়াং আর কিন-ফো, এই দুই নামের আদ্যক্ষর না-হ'য়ে এ যায় না! 'এখানে এসেছিলো ওয়াং? হয়তো এখনো আশপাশে কোথাও আছে,' মনে-মনে বললো সে। উৎকণ্ঠায় ভ'রে গিয়ে

হন্তদন্তে চারপাশে খুঁজে দেখলো সে, কিন্তু তার সব সন্ধানই ব্যর্থ হ'লো। শেষকালে ফিরে-আসা ছাড়া তাদের কোনো গত্যন্তর রইলো না। আর তার পরেই হঠাৎ যেন বিষম অবসাদে ভ'রে গেলো সে। গোয়েন্দা দুজনও অবশেষে হোটেলে ফিরে যেতে পেয়ে খুশি হ'য়ে উঠলো।

পরদিন সকালেই তারা নান-কিং ছেড়ে চ'লে গেলো।

১২

পথে বেরোবার নানান ফ্যাচাং

ঘোড়ায় জিন-দিয়ে-আসা অচেনা লোকটিকে যদি সব চিনেরাই প্রহেলিকা ঠেকতো, তাহ'লে তেমন দোষ দেয়া যেতো না। কাল কোথায় যাবে আজ যে জানে না, এমন ভ্রমণকারী সহজেই বিস্ময় ও সন্দেহ জাগিয়ে তোলে। হোটেলে গিয়ে ওঠে, কিন্তু ঘণ্টা কয়েকের বেশি থাকে না। রেস্তোরাঁয় গিয়ে বসে, কিন্তু তড়িঘড়ি কিছু গিলেই বেরিয়ে পড়ে। খরচ করে দু-হাতে, কিন্তু সব সময়েই লক্ষ রাখে যাতে এত টাকার বদলে তাড়াতাড়ি পথ চলতে পারে সে।

স্পষ্ট বোঝা যায় যে সে ব্যাবসা দেখতে বেরোয়নি; কিংবা কোনো জরুরি কাজের ভার নিয়ে বেরিয়ে-পড়া মান্দারিনও সে নয়; প্রত্নতাত্ত্বিকও নয় যে পুরোনো মন্দির থেকে প্রাচীন দলিল-দস্তাবেজ বের ক'রে দেখতে চায়; এমনও নয় যে ডিগ্রিলাভের জন্য ব্যস্ত কোনো প্যাগোডা-শিক্ষার্থী সে; বৌদ্ধ শ্রমণও নয় যে বোধিদ্রুমের শিকড়ের টুকরো যে-সব পূজাবেদীতে রয়েছে ঘুরে-ঘুরে তা দেখতে বেরিয়েছে; কিংবা পাঁচ পাহাড়ের উদ্দেশে বেরিয়ে-পড়া তীর্থযাত্রী ব'লেও তাকে মনে হয় না। অদ্ভুত এই লোকটা, এই কি-নান – আগাগোড়াই তার কেমন রহস্যে ছাওয়া।

সেণ্টেনারিয়ানের এই মক্কেলটির যেন সব সময়েই শশব্যস্ত ভাবে ঘুরে-বেড়ানো ছাড়া আর-কোনো অভিপ্রায় নেই। সদাসতর্ক ক্রেগ আর ফ্রাই, আর বিতবিরক্ত ও অবসন্ন সুনকে নিয়ে সে হুড়মুড় ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে: উদ্দেশ্য তার দুটি এবং পরস্পরবিরোধী: যেমন সে ওয়াং-এর হাত থেকে রেহাই পেতে চাচ্ছে, তেমনি আবার অনাবিষ্কৃত সেই মানুষটিকে সে খুঁজেও বের করতে চাচ্ছে। একদিকে যেমন তার এই উভয়সংকট থেকে সে উদ্ধার পেতে চায়,

তেমনি আবার সব সময় ঘোড়ায় জিন দিয়ে থেকে ওই সমূহত দুর্বিপাক থেকেও রক্ষা পাওয়ার ইচ্ছে রয়েছে তার: ঝোপের পাখির চেয়ে উড়ে-যাওয়া পাখিকে মারা বেশি কঠিন ব'লেই সে কোথাও স্থির হয়ে থাকতে চায় না।

নানকিং থেকে দ্রুতগামী একটি মার্কিন জাহাজে ক'রে নীল নদী দিয়ে এগিয়ে ইয়াং-ৎসি-কিয়াং হান-কিয়াং-এর মোহনায় হান-কৌ পৌঁছলো তারা, আর সেই ভাসমান সরাইখানায় ক'রে সেখানে পৌঁছোতে সময় লাগলো মোটে ষাট ঘন্টা। এই রাস্তাতেই চোখে পড়ে স্রোতের মধ্যে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে একটি আশ্চর্য ও অতিকায় পাথর, যার উপরে বৌদ্ধমন্দিরে ভিক্ষু ও শ্রমণদের যাতায়াতের কোনো বিরাম নেই। লোকে এই আশ্চর্য পাথরটিকে 'ছোট্ট অনাথ' ব'লে ডাকে: এটাকে দেখে মুগ্ধ-হওয়া দূরে থাক, তারা এমনকি এটার দিকে একবার তাকালোই না।

অবশেষে হান-কৌতে কিন-ফো অর্ধেক দিনের জন্য বিশ্রাম নিতে রাজি হ'লো। প্রাচীন তাই-পিং বিভীষিকার চিহ্ন হিশেবে প'ড়ে আছে ধ্বংসস্তূপ, চারদিকে ভাঙাচোরা ঘরবাড়ি পথঘাটের ছড়াছড়ি, কিন্তু ওয়াং-এর কোনো খোঁজই কোথাও পাওয়া গেলো না—না পাওয়া গেলো হাং-ইয়াং-ফোর সংলগ্ন ডানতীরের ব্যাবসাকেন্দ্রে, না বা তাকে পাওয়া গেলো হো-পে প্রদেশের রাজধানী, বামতীরের উচো-চাং-ফোতে। নানকিং-এর সমাধিভবনে কিন-ফো সেই যে রহস্যময় কতগুলি অক্ষর দেখেছিলো, তারও কোনো পুনরাবৃত্তি কোথাও দেখা গেলো না।

ক্রেগ আর ফ্রাই যদি ভ্রমণবৃত্তান্ত লেখবার উদ্দেশ্য নিয়ে চিনের এ-সব অঞ্চলের ভৌগোলিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিষয়ের তথ্য লিপিবদ্ধ করতে চাইতো, তাহ'লে তাদের অত্যন্ত নিরাশ হ'তে হ'তো। কারণ কোনো জায়গাতেই তারা ততক্ষণ থাকতো না, যতক্ষণে ভালো ক'রে সব দেখা-শোনা যায়। এটা অবশ্য বলা উচিত যে বাচাল বা অতিভাষী নয় ব'লে তাদের কৌতূহল কম ছিলো। নিজেদের মধ্যেই তারা কম কথা বলতো, কিন্তু বেশি কথা বলার দরকারও তাদের তেমন ছিলো না। দুজনের চিন্তার ভঙ্গিই একেবারে একরকম, ফলে তাদের সব কথাবার্তাই শেষ পর্যন্ত কোনো-একজনের স্বগতোক্তি ব'লে মনে হ'তো হয়তো। এ-অঞ্চলের ভাস্কর্য সম্বন্ধে তাদের কোনো মাথাব্যথা ছিলো না; চওড়া রাস্তা, সুন্দর বাড়ি-ঘর, কি ইওরোপীয় বসতির ছায়াঘেরা পথঘাট—কোনো-কিছুকেই তারা তারিফ করতো না; বেশির ভাগ চিনে শহরেই যে শহরের ঠিক মাঝখানটাকে ঘিরা, আর

আশপাশকে ঝ্যাপ্ত ব'লে মনে হয়—এই অদ্ভুত বৈশিষ্ট্যটির দিকেও নজর দেবার মতো অবস্থা তাদের ছিলো না।

লাঙ-হো-কৌ পর্যন্ত আরো একশো মাইল পর্যন্ত নাব্য হান-কিয়াং; জাহাজটি যেই সেই উদ্দেশে রওনা হবার উপক্রম করলো, কিন-ফোও অমনি বাকি পথটুকু চ'লে যাবে ব'লে ঠিক ক'রে নিলো। তার দুই দেহরক্ষীও এই সিদ্ধান্তে বেশ খুশি হ'য়ে উঠলো, তার প্রধান কারণ এই যে ডাঙার চেয়ে জলপথে বিপদ-আপদের সম্ভাবনা অনেক কম—আর জাহাজে গেলে তাদের পক্ষে আরো কড়া নজর রাখার সুবিধে হয়। সুন তো তাদের চেয়েও বেশি খুশি। তার মেজাজের সঙ্গে জাহাজের জীবন দিব্যি খাপ খায়। অন্তত, হাঁটতে তো হবে না, তাছাড়া কাজ-কর্মেরও দরকার হয় না জাহাজে—কারণ ক্রেগ আর ফ্রাই তার প্রভুর যাবতীয় ফাই-ফরমাশ খেটে দেয়—নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে নিরেট করবার জন্য। জাহাজের একটা ছোট্ট কামরায় আরাম ক'রে প'ড়ে-প'ড়ে নাক ডাকায় সে সারাদিন, আর ঠিক কেমন ক'রে যেন খাবার সময়গুলোতে জেগে যায়: সুখাদ্যকে তারিফ করার মতো আভিজাত্য ও সুরুচি তার আছে। দু-এক দিন পরে কিন্তু সাধারণ খাদ্য-তালিকায় ছোটোখাটো কিছু পরিবর্তন দেখে বোঝা গেলো তারা আরো উত্তরে এসে পৌঁছেছে। ভাতের বদলে খামিরহীন রুটির মতো গম খেতে হ'লো তাদের—গরম-গরম-খেলে বেশ ভালোই লাগে তা। খাঁটি দক্ষিণীরা অবশ্যি কাঠের চামচে দিয়ে ভাত খাওয়ার অভ্যেস ভুলতে পারে না ব'লে সহজে তাদের এই নতুন খাদ্য মুখে রুচতে চায় না। সময় মতো তাকে চা আর ভাত জুগিয়ো, তাহ'লেই দেখবে দক্ষিণীর সন্তোষের শেষ নেই: জাহাজের ভালো রান্নার চেয়ে তার ওই অভ্যস্ত খাদ্যই বেশি ভালো লাগে।

আসলে তারা এবার গম-প্রধান অঞ্চলে এসে প্রবেশ করেছে, এখানকার মাটি শুকনো, দিগন্তে দেখা যায় মিং রাজাদের তৈরি কালো-কালো দুর্গ-ওলা গিরিশ্রেণী। কৃত্রিম পাড়ের স্বাভাবিক খাতের মধ্য দিয়ে ব'য়ে যায় জলস্রোত —নদী ক্রমশ চওড়া কিন্তু ঘোলাটে হ'য়ে আসে।

ইউয়েন-লো-ফুর বন্দরে শুল্ক বিভাগের আপিশের পাশে কয়েক ঘণ্টা থেমে রইলো জাহাজ; জ্বালানির ব্যবস্থা করতে হয় এখান থেকে—তাইতেই এত সময় নেয়; কিন-ফো কিন্তু তীরে নামলো না। কেন নামবে সে তীরে? এখানে তার দেখবার কিছু নেই; তার একমাত্র উদ্দেশ্য এখন হ'লো বিশাল চিন-দেশের মাঝখানে একেবারে হারিয়ে-যাওয়া, যেখানে সে যদি দৈবাৎ ওয়াং-এর

মুখোমুখি না-পড়ে তো ওয়াং-এর পক্ষে তাকে খুঁজে বের করা খুব কঠিন হবে।'

ইউয়েন-লো-ফুর পরে নদীর দুইপাশে মুখোমুখি দুটো শহর আছে। তার একটা কান-ৎচেং — মস্ত শহর, লোকসংখ্যা প্রচুর, অন্যটা সিয়াং-ইয়াং-ফু — সদর শহর, কর্তাব্যক্তিরাও থাকেন বটে, কিন্তু কেমন যেন মরা ব'লে মনে হয় একে। এখানে এসেই নদী হঠাৎ উত্তরে মোড় বেঁকেছে লাও-হো-কৌর দিকে — তার পরের অঞ্চল আর নাব্য নয়।

এখান থেকে ভ্রমণ ব্যাপারটা সম্পূর্ণ আলাদা চেহারা নিলে। নদীর সেই 'মসৃণসুন্দর প্রবহমানতা'র বদলে এবার বন্ধুর ও বনাকীর্ণ পথ দিয়ে যেতে হ'লো তাদের, দিব্যি ভেসে যাচ্ছিলে জাহাজে ক'রে এতকাল, এখন আদিম যানবাহনের জন্য পদে-পদে ধাক্কা ও ঝাঁকুনি লাগলো। সুন বেচারার প্রায় যা-দশা। জাহাজের এই আরামের পর এই রাস্তা তার কাছে সর্বনাশের নামান্তর ব'লে মনে হ'লো। এই পথ দিয়েই ধুঁকতে-ধুঁকতে চলতে হবে তাকে, অবসাদ আর গালাগাল ছাড়া আর-কিছুই জুটবে না বরাতে।

সত্যি বলতে কিন-ফোর দুর্দান্ত ভ্রমণপথের সঙ্গী হওয়াটা কারু পক্ষেই মোটেই ঈর্ষণীয় নয়। কোথাও থামা চলবে না, এই একটা কথা সে মনে-মনে জেনে নিয়েছে, ব্যস, আর কোনো সুবিধে-অসুবিধে বাধা-বিপত্তির কথা সে ধর্তব্যেই আনে না। শহর থেকে শহরে গেলো সে হুড়মুড় ক'রে, পেরিয়ে এলো প্রদেশের পর প্রদেশ। কখনো তার গাড়ি হ'লো খচ্চরে-টানা চাকা-বসানো ছাত-খোলা এক বাক্স, উপরে একটা ক্যানভাসের ঢাকা নামেই আছে, তাতে রোদবৃষ্টি কিছু আটকায় না, অন্য সময়ে তার যান হ'লো খচ্চরে-টানা চেয়ার — দুটি বাঁশের উপর ঝোলানো ক্যানভাসের চাদরে তাকে চিৎ হ'য়ে শুয়ে থাকতে হ'লো, আর সমুদ্রে টাইফুন উঠলে জাহাজ যেমন এ-কাৎ ও-কাৎ হয় তেমনিভাবে তাকে নিয়ে যেন লোফালুফি খেললো খচ্চরগুলি। ক্রেগ আর ফ্রাই দুটো হাড়জিরজিরে গাধার পিঠে চ'ড়ে — তার গতি আবার এমন যে খচ্চরে-টানা চেয়ারের চেয়ে কম যন্ত্রণাদায়ক নয় — দু-পাশ দিয়ে গেলো রাজার দেহরক্ষীর মতো। আর সুন পিছনে এলো গোঙাতে-গোঙাতে গজরাতে-গজরাতে পায়ে হেঁটে — যখনই মনে হয় যে এত জোরে হাঁটলে ম'রে যাবে তখনই গলায় ব্র্যাণ্ডির বোতল উপুড় ক'রে খানিকটা সান্ত্বনা নেয় — আর অবশ্য তার টলটলায়মান অবস্থার জন্য কেবল রাস্তাকেই দোষ দিলে ভুল হবে।

পরে অবশ্য খচ্চর আর গাধা দুইই বাতিল ক'রে দিয়ে ঘোড়ায় চ'ড়ে কিন-ফো তার অবসন্ন সঙ্গীদের নিয়ে প্রাচীন তাংরাজাদের রাজধানী সিন-গান-

ঢুকতে ঢুকলো। পথে অবশ্য প্রচুর কাঁচা সবুজের নামগন্ধহীন প্রান্তর পেরোতে হ'লো, সুদূর শেন-শি প্রদেশের এই নগরে প্রবেশ করার আগে তাদের কষ্ট ও ক্লান্তি অবশ্য সহ্যের সীমা ছুঁয়ে ফেললো। তার একটা কারণ ছিলো গরম —একে যে মাস, তায় জায়গাটার অক্ষরেখা দক্ষিণ স্পেনের মতো—গায়ে প্রায় ফোশকা পড়ার দাখিল। মেঘের মতো কুণ্ডলী পাকিয়ে হলুদ ধুলো ওড়ে বড়ো রাস্তায়, সব ঢেকে যায় কুয়াশা'র মতো, পা থেকে মাথা অবধি ধুলোয় ভ'রে যায় পথিকদের। লু-ওঠা অঞ্চল এটা; ভূতাত্ত্বিক সংস্থান কেবল উত্তর-চিনের দ্বারাই সবস্বত্ব সংরক্ষিত—কিয়ঁ রসে বলেছেন, 'এখানে না আছে মাটি, না বা পাথর—বরং বলা ভালো নিরেট আর শক্ত হবার আগে পাথরের দশা যে-রকম হয়, সেই হবু-পাথরেই দেশটা গড়া।' তাছাড়া প্রাণের ভয়ও এখানে তুষ্ট করার মতো নয়; পুলিশও গুণ্ডাবদমাশদের ছুরির ভয়ে থরথর কাঁপে; রাতে এ-সব জায়গায় বড়ো শহরেরও কেউ বাড়ি ছেড়ে এক পা বেরোয় না, কারণ পুলিশ সব ভার যেন গুণ্ডার হাতেই ছেড়ে দিয়েছে। ফলে রাস্তায়-ঘাটে যে নিরাপত্তার নামগন্ধও নেই, এটা বোধহয় উল্লেখ না-করলেও চলে। বার কয়েক ওই ধুলোর ঝড় ফুঁড়ে কয়েকদল সন্দেহ-জাগানো লোকের আবির্ভাব হয়েছিলো; কী কু-মৎলব ছিলো কে জানে, কিন্তু ক্রেগ আর ফ্রাই-এর কোমর-বন্ধে রিভলভার দেখে তারা তেমন-কিছু না-ক'রেই স'রে পড়েছে। তবু চারদিক দেখে শুনে ক্রেগ আর ফ্রাই রীতিমতো উদ্বিগ্ন হ'য়ে পড়েছিলো; দস্যুই মারুক আর ওয়াংই মারুক—কিন-ফো প্রাণ হারালে সেন্টেনারিয়ানের হাল সেই একই হবে। কিন-ফোও যে একেবারে ভয় পায়নি, তা নয়, নিজের নিরাপত্তার জন্য তার দুশ্চিন্তার আর শেষ ছিলো না; জীবন সম্বন্ধে তার সব ধারণা আগাগোড়া বদলে গেছে, ফলে সে যেন জীবনকে আঁকড়ে ধ'রে বেঁচে থাকতে চাচ্ছে এখন। তার দশা এখন এমন দাঁড়িয়েছে যে বেঁচে থাকার চেষ্টা করতে গিয়েই সে যেন এখন মরো-মরো—যুক্তির বালাই না-রেখে ক্রেগ আর ফ্রাই অন্তত তা-ই ভাবলে।

সিংনানফুতে ওয়াং-এর সঙ্গে দেখা হবার কোনো সম্ভাবনাই নেই। কোনো তাই-পিং এখানে মাথা গোঁজার কথা ভাবতেই পারবে না। বিপ্লবের সময় তারা কখনোই এখানকার প্রকাণ্ড মাটি কেল্লাটির মস্ত দেয়াল বেয়ে উঠতে পারেনি। যদি অবশ্য এমন হয় যে দার্শনিকপ্রবর অবশেষে পুরাতাত্ত্বিক কৌতূহলে এখানকার রহস্যময় শিলালিপিগুলি দেখতে এসেছে—এখানকার জাদুঘরে শিলালিপির সংখ্যা এত যে লোকে জাদুঘরটাকে 'প্রস্তরফলকের

অরণ্য' ব'লে তাকে—এসে থাকলে অবশ্য স্বতন্ত্র কথা; না-হ'লে অন্তত এই অঞ্চলটি সে সর্বাবস্থাতেই এড়িয়ে যেতে চাইবে।

যথা রাশিয়া, তিব্বত, মোঙ্গোলিয়া আর চিন—এই চারদেশের মধ্যে বাণিজ্য চালায় ব'লে শহরটির নানা দিক দিয়ে গুরুত্ব রয়েছে। ব্যাবসার জমজমাট অবস্থা দেখে অন্য লোক হ'লে হয়তো কিছুদিন এখানে থেকে যেতো, কিন্তু কিন-ফো পৌঁছনো মাত্রই আবার যাবার জন্য পা বাড়ালো। উত্তর দিকেই এগোতে লাগলো সে, হোয়েং-হো নদীর অধিত্যকা দিয়ে সেই হলুদ নদীর স্রোত ধ'রে এগোলো তারা। শুকনো খটখটে ডাঙার মধ্য দিয়ে এঁকেবেঁকে গেছে নদী। কায়ো-লিন শিয়েন আর নিং-হং-শিয়েন পেরিয়ে পৌঁছোলো তোং চুয়ে, ১৮৬০ সালে যেখানে মুসলমানরা এক ভীষণ রক্তরাঙা দাঙ্গাহাঙ্গামার সৃষ্টি করেছিলো। রাস্তা তারপরে আরো-ক্লান্তিকর হ'য়ে উঠলো, কখনো বা নৌকোয় কখনো বা হেঁটে শেষকালে তারা হোয়েং-হো আর হোয়াংহো নদীর মোহানায় অবস্থিত তা-কোনানের দুর্গে এসে পৌঁছোলো।

হোয়াং-হো হ'লো সুবিখ্যাত হলুদ নদী। তিব্বত থেকে বেরিয়ে পূর্বাঞ্চল দিয়ে প্রবাহিত হ'য়ে এসে সে অবশেষে পীত সমুদ্রে পড়েছে। পীত সমুদ্র অবশ্য তেমনি পীতবর্ণ, যেমন কৃষ্ণবর্ণ কৃষ্ণসাগর, বা যেমন আরক্ত লোহিত সাগর। হলুদ যেহেতু রাজবর্ণ ব'লে সম্মানিত, সেইজন্য নাম শুনে মনে হয় এই নদী বোধ করি স্বর্গ থেকেই বেরিয়ে এসেছে, কিন্তু এর আরেক নাম 'চিনের দুঃখ'। প্রতি বছর এর বন্যাস্রোত স্ফীত হ'য়ে যে তাণ্ডব চালিয়ে যায়, তাতেই এই নাম হয়েছে তার।

তা-কোনান কোনো বাণিজ্যকেন্দ্র নয়, বরং একটি সামরিক শিবির—সাধারণ মাঞ্চু তাতারদের একটি বাহিনী থাকে এখানে—চিনে ফৌজের কোনো নামকরা বাহিনী এটা নয়। সেই জন্যে কিন-ফোর সঙ্গীরা এই আশা লালন করেছিলো যে কোনো ভাবে হোটেল দেখলে কিন-ফো বুঝি এখানে কয়েকদিন জিরিয়ে নেবে, তা-ই হয়তো শেষ অবধি হ'তো, যদি-না সুন বেচারা একটা মস্ত আহাম্মুকি ক'রে বসতো। সব সাবধানতা ভুলে গিয়ে অকস্মাৎ বোকা কিন-ফোর আসল নাম দিয়ে বসলো বোকারাম—ছদ্মনাম কি-নানের কথা সে একেবারে ভুলে গিয়েছিলো। এই ভুলের ফলে সাধের লুকোচুরির একটা মস্ত অংশ হারাতে হ'লো তাকে, কিন্তু খবরটা তক্ষুনি একেবারে দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়লো। কিন-ফো এসেছে—একশো বছর যে বাঁচতে চেয়েছে, সেই লোকটা কিনা সশরীরে এই শহরে বর্তমান! তক্ষুনি পান্থশালাটির চারপাশে

মন ঠিক ক'রে ফেলো ; ফলে অমনি চম্পট দেবার ব্যবস্থা করতে হ'লো তাকে আর তার সঙ্গে যেতে হ'লো ক্রেগ আর ফ্রাইকেও — যেহেতু তার সঙ্গে তাদের নাড়ির যোগ আছে, কুড়ি মাইল দূরে একটা অজ পাড়াগাঁয়ে এসে যখন ক্লান্তিতে ও অবসাদে তারা আধমরা হ'য়ে পড়লো, কেবল তখন থামলো — মনে-মনে ভাবলো এখানে বুঝি আবার অপরিচয়ের অন্ধকারে নিজেকে মিলিয়ে দিতে পারবে।

ওই বেমক্কা ভুলটুকু ক'রে আহাম্মক সুন নিজের উপর যে-দুঃখ ডেকে আনলো, তা নেহাৎ হেলাফেলার নয়। স্থির ভৃত্যের এই উজবুকমুখো কাণ্ডে প্রকৃতি এতই রুষ্ট ও বিরক্ত হ'য়ে উঠেছিলেন যে তিনি আর দৃকপাত না-ক'রে তার সাধের বেণীর একটা মস্ত অংশ কেটে দিলেন কচ ক'রে, বেণীর যা অবশেষ যেটুকু মাথায় রইলো, তা বেচারাকে সব লোকের উপহাস ও টিটকিরির পাত্র ক'রে তুললো। রাস্তায় বেরোলেই ছেলের পাল তাকে ঘিরে আওয়াজ দেয়। ফলে বেচারা মনে-প্রাণে এই বিষম ভ্রমণের অবসানই কামনা করতে লাগলো শুধু!

কিন্তু অবসান কোথায়? বিভুলংকে তো কিন-ফো ব'লেই ছিলো যে-দিকে দু-চোখ যায় নাক বরাবর সোজা সেই দিকেই যেতে থাকবে সে — আর ওই জন্যেই বুক বেঁধে পথে বেরিয়েছে সে।

যে-ছোট্ট অজ পাড়াগাঁয়ে তারা এসে আস্তানা গেড়েছে, সেখানে না-আছে ঘোড়া বা গাধা, না আছে খচ্চরে টানা গাড়ি বা খচ্চরের চেয়ার। অথচ সিধেসিধেই আবার বেরিয়ে-পড়া উচিত তাদের। গতিক দেখে মনে হ'লো পদব্রজে হণ্টন ছাড়া আর-কোনো পথ বুঝি খোলা নেই। হণ্টনে অবশ্য কিন-ফোর মোটেই রুচি নেই, কারণ নাক বরাবর যত পথই সে যেতে চাক না কেন, পদব্রজে বেশি দূর যাবার কথা সে কস্মিন কালেও ভাবেনি। এটা অস্বীকার করার জো নেই যে এ-ক্ষেত্রে সে আদৌ কোনো বিচক্ষণ দার্শনিকতার পরিচয় দিলে না। গজগজ করতে শুরু করলে সে, খেঁকিয়ে উঠলো বারে-বারে, মেজাজ তার চ'ড়েই রইলো সপ্তমে। আস্ত জগৎকে দায়ী করলো সে নিজের এই দশার জন্য, সঙ্গীসাথীদের যে কত গালাগাল দিলে, তার তো কোনো হিসেবই নেই। — যদিও এটা তার ভাবা উচিত ছিলো নিজের এই বিপত্তির জন্য নিজেই সে সম্পূর্ণ দায়ী। অতীতের জন্য দীর্ঘশ্বাস ফেললো অবিরাম — তখন কোনো চিন্তা বা দুশ্চিন্তা ছিলো না তার — দিব্যি ছিলো। ঘোষণা করলো যে যদি আবার স্বাচ্ছন্দ্যের পূর্ণ মর্যাদা দেবার জন্য দুঃখ-বিপত্তির অভিজ্ঞতা দরকার হয়, তাহ'লে

ইহলোকের এই জীবনের উপযোগী সুখকই সে প্রচুর ভোগ ক'রে ফেলেছে এর মধ্যেই। আর, কোন আকাঙ্ক্ষাই বা হয়নি তার এই ক-দিনে? সে কি ভাবেনি কানাকড়ি না-নিয়েও লোকে দিব্যি তুষ্ট ও সুখী বেঁচে থাকে? সে কি সেই চাষিদের ভাবেনি, যারা মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দু-মুঠো অন্ন জোগাড় ক'রেও দিব্যি হাসিখুশি বেঁচে থাকে? গান গেয়ে-গেয়ে কাজ করতে ভাবেনি কি সে মিস্ত্রিদের? হয়তো শুধু কাজকর্মের মধ্যে দিয়েই লোকে স'ত্যিকার সুখ পেতে পারে। অন্তত এই ধারণায় তার সন্দেহ নেই যে, তার মতো পোড়া কপাল আর কারু নেই।

ক্রেগ আর ফ্রাই কিন্তু এর মধ্যে যানবাহনের জন্য সারা গাঁ তোলপাড় ক'রে ফেলেছে। সন্ধের একেবারে শেষ সীমায় পৌঁছেছে তারা, মরিয়াদশা যাকে বলে। শেষকালে সারা গাঁ তছনছ ক'রে অবাক একটা শকট জুটলো—কিন্তু তাতে আবার মাত্র একজন লোক বসতে পারে, কিন্তু তাতেও অবস্থার কোনো হেরফের হ'লো না। শকট জুটলে কী হবে, সেটা চালাবার উপায় কী?

গাড়িটা হচ্ছে এক চাকার হাত-গাড়ি—পাড়াগাঁয়ের লোকেরা মাল-পত্র আনা-নেয়ার জন্য ব্যবহার করে। প্যাম্পালের এই ঠেলাগাড়ি বোধকরি আদ্যিকালের, নাবিকদের দিগদর্শক কি গোলন্দাজদের ভীষণ বারুদ আবিষ্কার হবারও আগের জিনিশ। চাকাটা সামনে বসানো নয়, মাঝখানে—পাটাতনের ঠিক তলায়। পাটাতনটা দু-ভাগে ভাগ করা, একদিকে বসে যাত্রী নিজে, অন্য দিকে তার মালপত্তর। পিছন থেকে ঠেলে-ঠেলে চালিয়ে নিয়ে যায় চালক—যাত্রীর নৈসর্গিক সৌন্দর্য দেখায় বিঘ্ন ঘটায় না। মাঝে-মাঝে একটা মাস্তুল দাঁড় করিয়ে চৌকো পাল তুলে দিয়ে অনেক কাজে আসে—হাওয়া অনুকূল থাকলে অথবা যাত্রীকে আশাতীত দ্রুতবেগে ঠেলে নিয়ে যাওয়া যায়।

ঠেলাগাড়িটা ভাড়া দেবে কোন বোকচন্দ্র? দরকার হ'লে ওই পালমাস্তুল সব সমেত কিনে নিতে হবে। কেনাই হ'লো শেষ অবধি—এবং কিন-ফো গিয়ে গাড়ির উপরে বসলো।

'চল এবার, সুন,' কিন-ফো বললো।

'যাচ্ছি,' ব'লে সুনও উপর গাড়ির উঠে বসবার উপক্রম করলো।

'না, না, ওখানে মালপত্তর থাকবে', কিন-ফো চেঁচিয়ে বাধা দিলে।

'আর আমি?' সুন যেন পথেই ব'সে পড়ে।

'গাড়ির পিছনে থেকে দিবি ঠ্যালা,' কিন-ফো অধীর হ'য়ে নির্দেশ দিলো।

'ক্-কোথায়? ক্-কেন…' সুন তোতলাতে থাকলো, কিন-ফোর কথা তার

মাথায় ঢুকেছে ব'লে মনে হ'লো না, রেসের পরে ঘোড়দৌড়ের ঘোড়ায় হাটুর জোড় যেমন খুলে যেতে চায়, তারও দশা তখন সেই রকম।

'তর্নাদ?' কাচির মতো আঙুল দিয়ে যাচাই করার ইঙ্গিত করলো কিন-কো, যার যথার্থ স্বন মর্মে মর্মেই অনুভব করতে পারলো।

আর-কে নো কথা না ব'লে স্বন পিছনে গিয়ে হাল ধ'রে দাঁড়ালো। হাওয়া অনুকূল ছিলো তখন, পাল তোলা হয়েছিলো আগেই, ক্রেগ আর ফ্রাই দু-পাশে নিজেদের স্থান নিলে। জোর কদমে যাত্রা শুরু হ'লো। প্রথমে কোচবাক্সের ঘোড়ার স্থান নিতে হ'লো ব'লে স্বন রেগে টং হ'য়ে গিয়েছিলো, পঞ্জরাকে পঞ্জরাতে ঠেলছিলো গাড়িটাকে, শেষকালে যখন ক্রেগ আর ফ্রাইও মাঝে-মাঝে সাহায্য করতে এলো ধাক্কা দিয়ে, তখন তার জলুনি খানিকটা হ্রাস পেলো। আসলে তখন অন্তত খুব-একটা বেশি পরিশ্রম হচ্ছিলো না তাদের। দক্ষিণের হালকা হাওয়ায় আপনা থেকেই যাচ্ছিলো গাড়িটা তাদের কাজ অনেকটা ছিলো সাম্পানের মাঝি'-এর মতো হাল ধ'রে-ব'সে থাকা।

যখন হাত-পায়ের আড়মোড়া ভাঙার দরকার হয়, তখন গাড়ি থেকে নেমে পড়ে কিন-কো, আর যখন হাঁটতে কষ্ট হয়, তখন পাটাতনে উঠে বসে: আর এইভাবেই আরো উত্তর দিকে এগিয়ে গেলো তারা। হোনান-ফু আর কাফং এড়িয়ে, রাজাখালের পথ ধ'রে এগোলো তারা, কুড়ি বছর আগে চুম ক'রে যখন সব ছারখার ক'রে হোয়াং-হো তার পুরানো খাতে বইতে শুরু করে, তখন থেকে রাজাখাল রাজধানী থেকে চা-বাগান অঞ্চল অবধি মস্ত এক রাজপথে পরিণত হ'য়ে যায়। হুসিনান আর হো-কিয়েনের মধ্যে দিয়ে অবশেষে পে চিলি প্রদেশে পৌছোলো তারা, তারপর পিকিং-এর উদ্দেশে রওনা হ'লো।

রাস্তায় তিয়েন-ৎসিন ব'লে মস্ত একটা শহর পড়লো—জনসংখ্যা তার চার লক্ষ, শহরের চারপাশে মস্ত প্রাচীর আর দুটো কেল্লা রয়েছে শত্রু প্রতিরোধ করার জন্য। পাই-হো আর রাজখালের মোহনায় এই শহরের প্রধান বন্দর অবস্থিত—জাহাজ ভিড়তে পারে এই বন্দরে—বছরে কয়েক কোটি টাকার আমদানি-রপ্তানি চলে এখানে, ফুল, জলপদ্ম, তাতারি তামাক এ-রকম নানা ধরনের প্রাচ্যদেশীয় জিনিশ চালান যায় এখান থেকে, আমদানি হয় আরো-সব বিচিত্র জিনিশ—চন্দন কাঠ, নানা ধাতুখণ্ড, পশম—আর ল্যাঙ্কাশিয়র থেকে আসে কলে-বোনা কাপড়।

জায়গাটা নানা দিক থেকে কৌতূহলোদ্দীপক—কিন-কো অবশ্য তাই ব'লে এখানে থেমে-পড়ার কথাই ভাবলে না। যেমন সে নরককুণ্ডের প্যাগোডাটি

দেখতে গিয়ে সময় নষ্ট করলো না, তেমনি 'লাইনসরণি'তে গিয়ে বিখ্যাত বাড়িলাইনগুলি দেখে আসার ইচ্ছে প্রকাশ করলে না। মুসলমান মালিক সিওন লাং কিং বিখ্যাত রেস্তোরাঁ 'সম্মান ও মৈত্রীগৃহে' গিয়ে আহার করা দূরে থাক, ওখানকার বিখ্যাত সুরা পর্যন্ত চেখে দেখলো না, এমনকি রাজ্যপাল লি-হুঙ-চাং-এর প্রাসাদে গিয়ে নিজের নামাঙ্কিত কার্ড পাঠাবার কথা পর্যন্ত সে বিবেচনা করলে না একবার। ১৮৭০ সাল থেকে ইনি এখানকার লাটসাহেব, অমাত্যসভার অন্যতম সদস্য, পীত বসন পরেন ইনি, খেতাব পেয়েছেন ক্রাউ-ধ্বজ চাও-পাও। এ-সবের কিছুতেই কোনো আকর্ষণ বা কৌতূহল ছিলো না কিন ফোর — চলা ছাড়া আর কিছুই যেন সে এখন জানে না। শস্যভরা বন্যা পড়ে আছে জেটির দু-পাশে, তার মধ্যে দিয়ে কোনোদিকে দৃকপাত না-ক'রেই এগিয়ে গেলো, পেরিয়ে গেলো মার্কিন ও ইংরেজ বসতি, বিখ্যাত ঘোড়দৌড়ের মাঠ, শরবর্ণীর সুন্দর কুঞ্জ, আঙুর-খেত আর ফলবাগানের মধ্য দিয়ে এগিয়ে গিয়ে গ্রামের রাস্তায় এসে পড়লো সে। দু-পাশে মস্ত মাঠ চলে গেছে দিগন্ত অবধি — যব, তিল, ধানের খেত প'ড়ে আছে পর-পর মাঠ জুড়ে, সবুজ বনের কাছে খরগোশ, তিতির আর ঘুঘু পাখি ঘুরে বেড়ায়, আর রাজপাখির শিকার হয় হাজারে হাজারে।

শান বাঁধানো রাস্তা দিয়ে যাচ্ছে তারা এবার: সাত মাইল ধ'রে এই রাস্তা চলবে, এক পাশে নানা ধরনের গাছপালা, অন্যপাশে নদীর তীর ঘেঁষে চলেছে জংলি জলা ঝোপঝাড়। সোজা গিকি পৌঁছে যেতো তারা এই রাস্তা ধরে গেলে — কিন্তু পথে তুং-চুতে একবার থামতে বাধ্য হলো তারা। কিন ফো তার এই হড়বড় পলায়নে কাতর ও খেদমান, ক্রেগ আর ফ্রাই ঠিক আগের মতোই সতেজ ও অক্লান্ত, সুন ধুলোমলিন ও শ্রান্ত এবং মাত্র দু এক ইঞ্চিতে পর্যবসিত তার বেণীর শোকে আকুল ও আর্ত।

জুন মাসের উনিশ তারিখ আজ। এই কড়ারনামা উৎপত্তির অবসান হ'তে আরো ছ দিন বাকি। এ পর্যন্ত অবশ্য কোথাও ওয়াং-এর বেণীর ডগাটিও দেখা যায়নি। কোথায় ঘাপটি মেরে লুকিয়ে আছে সে — কে জানে!

১৩

দৌড়! দৌড়! দৌড়!

কিন-ফো যখন তার ওই ঠেলাগাড়িতে ক'রে পিকিং-এর মাইল দশেক আগে তুং-চু শহরে পৌঁছলো, তখন হঠাৎ ঘোষণা ক'রে বসলো যে ওয়াং-এর সঙ্গে এই বিষম চুক্তির মেয়াদ না ফুরোনো অবধি এখানেই সে থেকে যাবে।

'চার লাখ লোক যে-শহরে থাকে, সেখানে বোধহয় আমি বেশ খানিকটা নিরাপদ,' বললো কিন-ফো, 'কিন্তু সুন যেন এটা মনে রাখে যে সে পেন-সী প্রদেশের ব্যাবসাদার কি-নানের কাছে চাকরি করে, না-হ'লে --'

সুন তাড়াতাড়ি প্রতিবাদ ক'রে জানালো যে দ্বিতীয়বার এই নির্দেশ ভোলবার পাত্তর সে নয়, একবার আহাম্মুকি ক'রেই যে-ফল পেয়েছে, তাতে আবার সেই একই-ভুল করার মতো বুকের পাটা তার নেই, তার আশা এবার তাকে যেন কিন-ফো ('কি-নান,' একযোগে বাধা দিয়ে ব'লে উঠলো ক্রেগ আর ফ্রাই।) তার যোগ্য কাজে বাহাল করে — যেন ঘোড়ার মতো তাকে গাড়িতে জুতে না-দেয়, আরো ঘোষণা করলো যে তার সঙ্গে নাকি এখন কোনো মৃতদেহের পার্থক্য নেই — এতই ক্লান্ত সে, আশা করে কিন-ফো ('কি-নান,' আবার ক্রেগ আর ফ্রাই একযোগে এমনভাবে তাকে শুধরে দিলো যে মনে হ'লো তাদের বাক্‌যন্ত্র বুঝি একটাই।) তাকে অন্তত আটচল্লিশ ঘণ্টা ঘুমোবার অনুমতি দিয়ে হৃত শক্তি ফিরে পেতে দেবেন।

'হ্যাঁ, ইচ্ছে হ'লে এক হপ্তাই নাক ডাকা গে,' তার প্রভু জানালেন, 'কারণ যত বেশি ঘুমোবি, তত কম আবোলতাবোল বকবি।'

তুং-চুতে হোটেলের সংখ্যা প্রচুর। কিন্তু সহজে আত্মগোপন ক'রে থাকা যায়, এমন-একটা হোটেলই বেছে নিতে হবে কিন-ফোকে, তার অভিপ্রায়ের পক্ষে তেমন-কোনো হোটেলেই হবে সবচেয়ে বড়ো সহায়। শহরটা আসলে পিকিং-এরই মস্ত এক শহরতলি — শান-বাঁধানো যে-রাস্তাটি দিয়ে দুই শহরের যোগাযোগ ঘটেছে, তার দু-পাশ দিয়েই সারি-সারি ভিলা, ও গোলাবাড়ি গেছে একটানা, আর শহর দুটি থেকে এত লোক নিত্য যাওয়া-আসা করে যে রাস্তায় গাড়ি-ঘোড়া লোকজনের স্রোত সব সময় অফুরানভাবে উপচে পড়ে।

জায়গাটা কিন-ফো'র চেনা ব'লেই তাই-ওয়াং-মিয়াও উদ্দেশেই এসেছে সে। তাই-ওয়াং-মিয়াও নামটির অর্থ 'যুবরাজের দেবালয়', এটি ছিলো ধর্ম-প্রতিষ্ঠান, সম্প্রতি এটাকে হোটেল বানানো হয়েছে—একজন আগন্তুক যা-যা চায় ব'লে মনে করতে পারে, তার সব-কিছুরই ভালো ব্যবস্থা আছে এখানে। নিজের জন্য একটা কামরা ভাড়া করলে কিন-ফো, পাশের ঘরেই ক্রেগ আর ফ্রাইয়ের থাকার ব্যবস্থা ক'রে দিলো আর সুনের জন্যও যোগ্য ব্যবস্থা করা হ'লো—তারপরেই সুনের আর কোনো পাত্তা নেই—মুহূর্ত মধ্যে নিজের ডেরায় গিয়ে সে হাত পা ছড়িয়ে দিলো।

ঘণ্টাখানেক বিশ্রাম ক'রে বেশ চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় দিয়ে মধ্যাহ্ন-ভোজ সেরে তবে তিনজনে চারপাশে নজর দেবার অবসর পেলো। স্থানীয় একটা খবর কাগজ জোগাড় ক'রে প্রথমেই দেখা দরকার তাদের কাজে লাগবার মতো কোনো খবর বেরিয়েছে কিনা, ফলে যথারীতি কিন-ফোকে মাঝে রেখে ক্রেগ আর ফ্রাই সরু ঘিঞ্জি রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো, কেউ যাতে খুব একটা কাছে ঘেঁষতে না পারে, সেইজন্য দুজনে চেষ্টার ত্রুটি করলো না। বন্দরের কাছে 'সরকারি বার্তাবহ' কাগজটির আপিস, যথাকালে সেখান থেকে একটি চলতি সংখ্যা কিনে নেয়া হলো। কিন্তু ওয়াংকে খুঁজে বের করতে পারলে দু-হাজার ডলার ইনাম মিলবে, এই বিজ্ঞাপনটি ছাড়া তাদের আকর্ষণ করার মতো কোনো খবর পাওয়া গেলো না।

'এখনো ওর পাত্তা মেলেনি তাহলে?' বললো কিন-ফো, 'অবাক কাণ্ড! কোথায় গিয়ে লুকোলো ও?'

'সত্যি আপনার মনে হয় তিনি চুক্তির শর্ত পালন করবেন?' বাক্যটাকে দু-ভাগে ভাগ করে জিগেস করলো ক্রেগ আর ফ্রাই।

'সন্দেহ করার অবকাশ কই?' উত্তর দিলো কিন-ফো। 'আমার অবস্থা যে সম্পূর্ণ বদলে গিয়েছে, তার তো বিন্দুবিসর্গও ও জানে না। তাই ও কী ক'রে আন্দাজ করবে যে আমার মনোভাবও পালটে গেছে। এই ছ-দিনে বিপদের আশঙ্কা মোটেই কম নেই—বরং আগের চেয়ে আরো-বেশি সংকটজনক—বলা যায়।'

'খুব সাবধানে থাকবেন আপনি,' তারা বললো। 'বিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করবেন।'

কিন-ফো জিগেস করলো, 'সেটা কী?'

এ-বিষয়ে ক্রেগ আর ফ্রাইয়ের ঐকমত্য দেখা গেলো: ভিন্ন-ভিন্ন তিনটে পথ

খোলা আছে তার সামনে; হোটেলে নিজের কামরায় দরজা-জানলা বন্ধ ক'রে বলা কোনোক্ষেত্রেই পাদমেকং ন গচ্ছামি, কিংবা কোনো ছোটোখাটো দুষ্কর্ম ক'রে জেলে-যাওয়া—জেলখানার চেয়ে নিরাপদ জায়গা আর কোথায় আছে? কিংবা এই গুজবটা ছড়িয়ে দেয়া যে তার মৃত্যু হয়েছে—তারপর বিপৎকাল উত্তীর্ণ হবার সময় আত্মগোপন ক'রে থাকা।

কোনো প্রস্তাবই কিন-ফোর মনে ধরলো না। মুহূর্তমাত্র ইতস্তত না-ক'রেই সে প্রস্তাব তিনটেকে অগ্রাহ্য ক'রে বললো—এটা সে ভালো ক'রেই জানে যে ওয়াং যদি একবার স্থির ক'রে থাকে তার প্রতিশ্রুতি সে রাখবেই, তবে হোটেল, জেলখানা কি গোরস্থান কোনো-কিছুই তার কাছে দুর্ভেদ্য বাধা ব'লে ঠেকবে না।

'না,' সে বললো, 'ও সব হবে না। আমি কয়েদী ব'নে যেতে চাই না।'

ক্রেগ আর ফ্রাইকে উদ্বং সংশয়াকীর্ণ দেখলো; প্রতিবাদ করতে যাবে, এমন সময় কিন-ফোই আবার অত্যন্ত নিশ্চিত ভঙ্গিতে বললো, 'আমার যা ইচ্ছে হবে আমি তা-ই করবো। কম্পানির যে দু-লাখ টাকা বাঁচাবার জন্ম আপনারা এসেছেন, তা বিপন্নই থাকুক না-হয়।'

'কম্পানির প্রতি তো আমাদের একটা কর্তব্য আছে,' তারা বললো।

'আমিও আমার নিজের প্রতি কর্তব্য পালন করবো—আমার নিজের ধরনেই অবিশ্যি। এটা ভুলে যাবেন না যে এ-বিষয়ে আমার নিজের স্বার্থ আপনাদের চেয়ে বড় গুণ বেশি। যাই হোক, আমার পরামর্শ শুনুন—চোখ-কান খোলা রাখুন, যথাসাধ্য চেষ্টা করুন আমাকে বাঁচাবার জন্ম, আর দয়া ক'রে নিজেকে বাঁচাবার জন্ম আমি যা-যা করি, তার উপর আস্থা রাখুন।'

এর পরে আর কীই বা বলার থাকে! সদা জাগ্রত সতর্কতা ছাড়া আর-কীই বা করার থাকে এর পর? যে-কাজের দায়িত্ব তারা নিয়েছে, পরের কয়েকদিনে তা যে চরম সংকটে পৌঁছোবে, এতে তাদের সন্দেহ ছিলো না।

তং-চু চিনদেশের প্রাচীন শহরগুলির অন্যতম ব'লেই তার জন-সংখ্যাও বিপুল হ'য়ে উঠেছে। পাই-হো নদী থেকে কেটে-বের করা একটি খালের পাশে গ'ড়ে উঠেছে এই শহর, আর সেই খালের পাশে পিকিং থেকে এসে-পড়া আরেকটি খাল এসে মিশেছে ব'লে তং-চুর বন্দর পরিবহণ ব্যবস্থার একটা মস্ত কেন্দ্র হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। শহরে কোনো নতুন লোক এসে কেবল-যে জেটির স্ফীত চঞ্চল জনসমুদ্র দেখে বিস্মিত হবে তা নয়, বন্দরে ভিড়-ক'রে-থাকা অগুন্তি সাম্পান আর পাল-তোলা জাহাজ দেখেও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হবে।

এত ভিড় দেখেই ক্রেগ আর ফ্রাই যেন একটু আশ্বস্ত ও নিরাপদ বোধ করলে। ওরা যদি সত্যি তার রক্তমাখা প্রতিজ্ঞাটি পালন করবার জন্য আবির্ভূত হয়, তাহ'লে কর্মটি সম্পন্ন করার জন্যে সে একটু নিরিবিলিই পছন্দ করবে—নিহত মানুষটার পাশে ওই বাঁকাবোক্তি সংবলিত চিরকুটটা ফেলে রেখে সে গোটা ব্যাপারটাকে আত্মহত্যার চেহারা দিতে চাইবে—অন্তত ক্রেগ আর ফ্রাইয়ের ধারণা তা-ই। সেইজন্য এই জনসমুদ্রে, বিপুল ভিড়ে, জয়ের কিছু বেশি—শহরের জনাকীর্ণ রাস্তাঘাটে তারা কিঞ্চিৎ নিশ্চিন্ত, সেইজন্যই পথচারীদের দিকে আনমনে তাকিয়ে তারা পথ চলছিলো—গুরুতর কিছু ঘটবে ব'লে তারা আশা করেনি।

কিন্তু হঠাৎ কিন-ফো একেবারে পাথরের মূর্তির মতো থেমে দাঁড়ালো। বারে-বারে উৎকর্ণ হ'য়ে কী যেন শুনবার চেষ্টা করলো সে। না, তার কোনো ভুল হয়নি, কিম্ভূতকিমাকার সব উদ্ভট অঙ্গভঙ্গি ক'রে একদল বালখিল্য রাস্তায় হল্লোড় করছে, আর মাঝে-মাঝে তার নামই চীৎকার ক'রে আওড়াচ্ছে তারা। নিজের নাম শুনে সে বিষম চমকে উঠলো, বুকের ভিতরটা ধ্বক ক'রে উঠলো, ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে হতভম্ব দাঁড়িয়ে রইলো সে ঠায়, আর তার দেহরক্ষীরা আরো গা ঘেঁষে দাঁড়ালো। তাকে চিনে ফেলেছে তবে? এত ছদ্মবেশ, এই ছদ্মনাম—সব তবে ব্যর্থ? কিন্তু তা তো মনে হয় না। স্পষ্টই তো বোঝা যাচ্ছে এই ছেলেদের দলের আকর্ষণের বস্তু সে অন্তত নয়। কিন্তু বারে-বারে তার নামই যে তবে আওড়াচ্ছে: 'কিন-ফো! কিন-ফো!' শান্ত ভাবে দাঁড়িয়ে কিন-ফো এই শোরগোল চেঁচামেচির মর্মার্থ অনুধাবন করার চেষ্টা করলে।

রাস্তায় গান গেয়ে গেয়ে চলেছে এক গায়ক, আর তাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে আবালবৃদ্ধবনিতা, প্রচণ্ড করতালি দিয়ে তাকে উৎসাহ জোগাচ্ছে তারা—এমনকি সে গান ধরার আগেই তাদের হাততালি সেই যে শুরু হ'লো, সহজে আর থামতেই চাইলো না।

ভিড় যত বাড়লো, লোকটা ততই খুশি হ'লো। তারপর যখন ভিড়ের আয়তন তাকে যথেষ্ট পরিমাণে তুষ্ট করলো, তখন পকেট থেকে সে বার করলো একতাড়া রংচঙে ছোটো-ছোটো প্রচারপত্র, আর খনখনে গলায় চেঁচিয়ে বলতে লাগলো, 'শতজীবীর পাঁচ প্রহর! শতজীবীর পাঁচ প্রহর!'

ও! সব হৈ-চৈ এর কারণ তবে তা-ই। কিন-ফোকে টিটকিরি দিয়ে লেখা সেই অতিবিখ্যাত ও জনপ্রিয় গানটা তবে বিক্রি ক'রে বেড়াচ্ছে এই গায়ক? ক্রেগ আর ফ্রাই ব্যাপারটা বুঝে কিন-ফোকে নিয়ে কেটে পড়ার

চেষ্টা করলো, কিন্তু কিন-কো নষ্ট নড়নচড়ন নট কিচ্ছু ; তাকে নিয়ে লেখা গান, অথচ সেই তা কোনোদিন শোনেনি ! এবার গানটা শুনবে ব'লেই মনস্থির করেছে, কেউ যখন এখানে তাকে চেনে না, তখন এখানে দাঁড়িয়ে গানটা শুনতে আর আপত্তি কোথায় ?

নানা রকম প্রাথমিক অঙ্গভঙ্গিসহ গলাসাধার পর গায়কটি আরম্ভ করলো :

'নামিলো গোধূলির পাংশু-আকাশে
বিবর্ণ তরুণ চাঁদ — লাবণ্যে ঢাকা সে,
উঠলো গাছের ছায়া
দিলো সব মায়া-ছায়া,
কিন-কো পৌঁছালো এসে বিংশতি বছরে।

যামিনী দ্বিতীয় দণ্ড : স্বচ্ছ অপরূপা
সোমেশ্বরী ঈশানেতে ছড়াতেছে রূপা ;
স্নিগ্ধ শোভা মাঠ-ঘাস
ঘরে সন্তানাদি বাস,
কিন-কো এখনো যুবা চল্লিশ বছরে।'

গায়কের মুখচোখের অভিব্যক্তি কিন্তু প্রত্যেক স্তবকের সঙ্গে-সঙ্গে বদলে যাচ্ছে, একটা ক'রে স্তবক শেষ হয়, আর সে যেন আরো বুড়ো হ'য়ে পড়ে। আর তাই দেখে ভিড় আরো সহর্ষে হাততালি দিয়ে ওঠে।

'শর্বরী তৃতীয় যামে : জ্যোৎস্না সমুজ্জ্বলা,
বর্তুল, পূর্ণ ও স্নিগ্ধ ষোলো-চন্দ্রকলা ;
কিন্তু হেমন্তের হাওয়া
এই বুঝি সবে যাওয়া,
কারণ কিন-কো এসে ষষ্টিবর্ষে পড়ে।

নিশীথিনী চতুর্থাংশ : গগনমণ্ডলে
চন্দ্রমা পশ্চিমদিকে অস্তগামী চলে !
ঝলমলে, কদুষ্ণু,
ঝড়, ও জ্যোৎস্না কভু, –
কিন-কো অশীতিপর শাংহাই নগরে।

মৃত্যুর পঞ্চম যাম : কনকনে, ভীষণ
হিমাংশু অরুণ-কালো, নিস্তারা গগন।
কোনো দীর্ঘশ্বাস নয়,
এখন মরলেই হয়, –
কেননা পৌঁছেছে কিন-কো একশো বছরে।

বিষম প্রভূত, কই সম্রাট ইয়েন
'সুভোর'বন্ধু' ব'লে তাকে তাড়াতে দিলেন।
নরকে প্রবেশ তার
নিষিদ্ধ ব'লে আবার
'হনুর মতো' ঘোরে কিন-ফো চিরকালে।'

গান শেষ হ'তেই হাততালির আওয়াজ এমন প্রবল আকার ধারণ করলে যে বুঝি-বা বধির ক'রে ফেলবে। প্রত্যেকেই এমন হুড়মুড় ক'রে এক-এক সাপেক দিয়ে রঙচঙে কাগজে-ছাপা গানটা কিনে নিতে শুরু করলো, মুহূর্তে লোকটার সব গান প্রায় শেষ হ'য়ে এলো।

গানটা কিনে না নেবার কোনো যুক্তি দেখলে না কিন-ফো। পকেট থেকে কিছু খুচরো পয়সা বার ক'রে গায়কের হাতে দিতে যাবে, এমন সময় ভিড়ের মধ্যে কার দিকে যেন চোখ পড়তেই সে এত চমকে উঠলো যে তার বিস্ময় এক অস্ফুট ধ্বনি হ'য়ে বেরিয়ে এলো। ক্রেগ আর ফ্রাই ভাবলে শেষ অবধি বুঝি-বা চরম আঘাতটি সে পেয়েছে, আরো আঁটো ক'রে তাকে চেপে ধরলো তারা।

কিন-ফো চেঁচিয়ে ব'লে উঠলো, 'ওয়াং!'

'ওয়াং!' ক্রেগ হতচকিত। 'কোথায়?'

'কোথায়?' ফ্রাই পুনরাবৃত্তি করলে প্রশ্নটার।

কিন-ফো মোটেই ভুল করেনি। ওয়াং যে শুধু সেখানে ছিলো তা নয়, কিন-ফোকে সে দেখতেও পেয়েছিলো। কিন্তু হুড়মুড় ক'রে তার দিকে ধেয়ে এসে বিষম কর্মটি সাধন করার বদলে চট ক'রে ঘুরে দাঁড়িয়েই ভিড়ের মধ্যে দিয়ে তীরের মতো ছুটে গিয়েছে সে, প্রাণপণে দৌড়ে পালিয়েছে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, কিন-ফোকে হঠাৎ দেখে সেও কম বিস্মিত বা বিচলিত হয়নি।

কিন-ফো আর এক মুহূর্তও ভাবলে না। তক্ষুনি তার পিছু নিলে সে, আর ক্রেগ আর ফ্রাইও তার সঙ্গ ছাড়লো না।

বারে-বারে চেঁচিয়ে ডাক দিলো সে দার্শনিককে, কিন্তু কোনো ফল হ'লো না।

'ওয়াং! ওয়াং!' চীৎকার ক'রে ডাকলো কিন-ফো, 'এখন আর কোনো গণ্ডগোল নেই—সম্পত্তি ঠিকই আছে! ওয়াং! ওয়াং, ফিরে এসো! আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে চাই!'

ওয়াং যাতে শুনতে পায় সেজন্য ক্রেগ আর ফ্রাই যথেষ্ট চেষ্টা করলো, কিন্তু

সে ততক্ষণে এত দূরে চ'লে গিয়েছে যে তাদের হাঁকডাক তার কানে যাচ্ছিলো কিনা সন্দেহ।

জেটির পাশ থেকে বেরিয়ে, খালের পাড় ধ'রে এত জোরে সে ছুটছিলো যে পাহারাই তারা তার পিছন নিলে—মধ্যেকার ব্যবধান এক চুলও কমলো না।

পাঁচ-ছটি চিনেম্যান আর দুটি চৈনিক পুলিশ প্রথমটায় তাদের পিছনে ধাওয়া করেছিলো, ভেবেছিলো বুঝি কোনো চোরকে তারা তাড়া করেছে; কিন্তু একটু পরেই তা আর ছ-সাত জনের ব্যাপার থাকলো না—পেল্লায় এক ভিড়ও ছুটতে শুরু করলো পিছনে—ওয়াং এর নাম তাদের কানে গেছে: যাকে খুঁজে বার করতে পারলে মস্ত ইনাম মিলবে, সেই ওয়াং! উত্তেজনা মুহূর্তে চরমে পৌঁছোলো, চেঁচিয়ে হাঁক পেড়ে ডাক ছেড়ে এক বিপুল জনতা এই ধাবমান ত্রিমূর্তির সঙ্গ নিলে।

প্রাণপণে দৌড়ুলো তারা, প্রত্যেকের দৌড়ের পিছনেই নিজস্ব কারণ রয়েছে। কিন-ফো দৌড়ুচ্ছে তার আটলক্ষ ডলারের সম্পত্তির লোভে—প্রাণের মায়ার কথা না হয় না-ই বললাম! ক্রেগ আর ফ্রাই দৌড়ুচ্ছে তাদের উপর দু-লাখ ডলার বাঁচাবার ভার আছে ব'লে! আর এই উত্তেজিত জনতার প্রত্যেকেই কি এই দু-হাজার ডলার পুরস্কারের লোভে ছুটছে না?

'ওয়াং! ওয়াং!' হাঁকডাক ক্রমশ চ'ড়ে যাচ্ছে সপ্তমে।

'ওয়াং! এখন আমি বড়োলোক!' কিন-ফো হাঁপাতে-হাঁপাতে চীৎকার করলো।

'ধরো ওকে, পাকড়ো!' চীৎকার তুললো জনতা।

কিন্তু হয় কিছুই শুনতে পাচ্ছিলো না ওয়াং, নয়তো কিছুই শুনতে চাচ্ছিলো না। কনুই দুটি পাঁজরায় ঠেকিয়ে সে সামনে ছুটে চলেছে, ঘাড় ফিরিয়ে একবারো তাকাচ্ছে না পর্যন্ত। শহরতলি পেরিয়ে একটা খোলা রাস্তায় এসে পড়লো সে—এখন আর তার সামনে কোনো বাধা-বিঘ্ন নেই। ফলে এবার দ্বিগুণ জোরে ছুটলো সে, আর ধাওয়া-করা ভিড়কেও তাই সেই অনুপাতে ছুটতে হ'লো।

প্রায় পনেরো মিনিট ধ'রে এই পেল্লায় দৌড় চললো—কেউ হাল ছাড়ছে না, কেউ থামবার লক্ষণ দেখাচ্ছে না। কিন্তু শেষকালে পলায়মান ওয়াং অবসাদ ও ক্লান্তি অনুভব করতে পারলো ভিতরে-ভিতরে: বুঝতে পারলো যে তার আর জনতার ভিতর ব্যবধান ক্রমেই ক'মে আসছে। ছুটে তাদের

হাত এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করা বৃথা, তাতে এক সময় ক্লান্ত হ'য়ে তাকে ধপ ক'রে মাটিতে প'ড়ে যেতে হবে সটান। একটা ফন্দিফিকির ছাড়া এই খ্যাপা জনতার হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার কোনো উপায় নেই, তাই প্রথম সুযোগটাকেই সবলে আঁকড়ে ধ'রে সে ঝটিতে মোচড় মেরে একটা ছোট্ট প্যাগোডার সবুজ গাছপালার মধ্যে মিলিয়ে গেলো।

'যে ওকে পাকড়াতে পারবে, তাকে দশ হাজার ডলার তায়েল ইনাম দেবো,' কিন ফো চ্যাঁচালো।

'দশ হাজার তায়েল বখশিশ,' ক্রেগ আর ফ্রাই জনতাকে শোনাবার চেষ্টা করলে।

'হুরাহ!' ব'লে ভিড়ের সামনে থেকে চীৎকার উঠলো, তারপর তারাও প্যাগোডার দেয়ালের কাছে এসে বাঁক ঘুরলো।

ওয়াংকে কিন্তু কোথাও দেখা গেলো না। ধাবমান জনতা একটু থমকে গেলো যেন, কিন্তু পরক্ষণেই আবার আকাশফাটা ধ্বনি উঠলো, 'ওই-যে ওখানে!'

ভেতের ক্ষুদ্র কটা আর সরু গলিগুলির মধ্য দিয়ে পথ ক'রে চম্পট দেবার চেষ্টা করছে তখন ওয়াং, আঁকাবাঁকা পায়ে চলা পথ গেছে গলিগুলির মধ্য দিয়ে আরেকটা মোড় ঘুরলো সে, অমনি হঠাৎ সে আবার খোলা রাস্তায় এসে পড়লো, এখানে আপ্রাণ ছোটা ছাড়া কোনো উপায় নেই তার। তার হাঁটুর জোড় যে এক্ষুনি খুলে যেতে চাচ্ছে, এই উত্তেজনাতেও একটা বার জানতে পারছিলো না ব'লে বারে বারে ফিরে তাকিয়ে দেখবার সে চেষ্টা করছিলো পশ্চাদ্ধাবকদের সঙ্গে তার কতটুকু ব্যবধান এখনো বজায় আছে। স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছিলো এই অভূতপূর্ব দৌড়ের পরমায়ু ফুরিয়ে এসেছে। শেষটায় তরুণ যুবকরাই যে জিতে যাবে, তাতে সংশয় নেই।

আরেকটু এগুলেই দেখা যাবে সেই বিখ্যাত পালিকাও সেতু, শিল্পকর্ম হিশেবে জগৎজোড়া খ্যাতি এই সেতুর—মারবেল পাথরের থাম আর খিলান, আর দু-পাশে দুইসার অতিকায় সিংহমূর্তি। আঠারো বছর আগে পে-চি-লি প্রদেশে প্রবেশ করা তাদের পক্ষে সম্ভব হ'তো না। অন্য ধরনের আরেকজন পলাতক রাস্তাটা আটকে থাকতো তখন। এখানেই ১৮৬০ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর ফরাশি বাহিনীর কাছ থেকে মার খেয়ে রাজার খুড়ো সান-কো লিন-ৎসিনকে থমকে দাঁড়াতে হয়েছিলো, আর অসীম দুঃসাহস সত্ত্বেও মাঞ্চু তাতারেরা ইওরোপীয় গোলন্দাজদের হাতে তখন ছিন্নভিন্ন হ'য়ে গিয়েছিলো।

কিন্তু এখন যদিও সেতুটির উপরকার বৃত্তিগুলোতে সেই ভীষণ যুদ্ধের ক্ষতচিহ্ন হ'য়ে গেছে, তবু আজকাল কারু পক্ষেই সেতুপথে যাবার বাধা নেই। পা টলছে, বুঝতে পারছিলো ওয়াং, বুঝতে পারছিলো যে তার শক্তি ফুরিয়ে এসেছে, চট ক'রে মুখ ঘুরিয়ে পিছন দিকে একবার দেখে নিলো সে। ব্যবধান একটু আগে ছিলো কুড়ি কদম, এখন তা দশ পাও হবে না। পিঠের উপর তাদের নিশ্বেস অনুভব করতে পারছিলো যেন সে, তার অবশ্য চেঁচিয়ে তাদের দম ফুরোতে চাচ্ছিলো না আর মিনিট খানেকের মধ্যেই তো তারা পাকড়ে ফেলবে তাকে। মৃগয়ার অবসান সন্নিকট, পাকড়াধাওয়া এখানেই এবারকার মতো শেষ।

উঁহু, মোটেই তা নয়। পরমুহূর্তেই ওয়াং সেতুর থামের উপর লাফিয়ে উঠলো। তারপরই ঝপাং ক'রে পাইহোর জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

বিষম চমকিয়ে গেলেও তক্ষুনি কিন-ফো মনস্থির ক'রে ফেললে। 'এখন ওকে পাকড়ানো যেতে পারে,' ব'লে চেঁচিয়ে উঠে সে নিজেও জলে ঝাঁপিয়ে পড়লো।

'দু লাখ ডলার জলে গেলো!' সমস্বরে আর্তনাদ ক'রে উঠলো ক্রেগ আর ফ্রাই। মরিয়া হ'য়ে তারাও তক্ষুনি পাইহো নদীতে ঝম্প দিয়ে পড়লো।

আর সেই অদ্ভুত উত্তেজনার মধ্যে আরো কয়েকজনও নিজেদের সামলাতে না-পেরে ঝপঝপ ক'রে লাফিয়ে পড়লো।

কিন্তু সব চেষ্টাই বিফলে গেলো। অনেকক্ষণ সন্ধান করলো তারা, কিন্তু খামকাই এত খোঁজাখুঁজি। বেচারা দার্শনিক তাহ'লে জলে ডুবেই মরলো নিশ্চয়ই স্রোতে ভেসে গেছে সে। কিন্তু কেউই বা হঠাৎ এমনভাবে জলে ডুবে মরতে গেলো? এই রহস্য ভেদ করবে কে?

ক্লান্ত, ভ্যাবাচ্যাকা, বিমূঢ়, হতাশ, নিরুৎসাহ ও আলুথালু কিন-ফো শেষকালে ক্রেগ আর ফ্রাইয়ের সঙ্গে হোটেলেই ফিরে এলো। জামাকাপড় ছেড়ে শুকোতে দিয়ে কিছু জলখাবারের ব্যবস্থা করলে তারা, তারপর সুনকে ডেকে পাঠালো। তারা যখন বললো যে আর ঘণ্টা-খানেক পরেই পিকিং যেতে হবে তখন সুনের বিরক্তি আর গজরানি একেবারে অসীমে পৌঁছোলো।

১৪

পিকিং

চিনের আঠারোটি প্রদেশের মধ্যে যেটি সবচেয়ে উত্তরে, সেই পে-চি-লি ন-টা জেলায় বিভক্ত। সদর জেলা হচ্ছে প্রথম শ্রেণীর একটি 'স্বর্গীয় শহর' — শরোকে পিকিং নগরী।

যদি কোনো চৈনিক হেঁয়ালির ছিন্ন টুকরোগুলো কোনো ১৩৫০০০ একর জমি-জোড়া নিখুঁত আয়তক্ষেত্রে সাজানো যায়, তাহ'লে ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে মার্কো পোলো যে অদ্ভুত বর্ণনা দিয়েছিলেন, সেই রহস্যময় কামবালু ও চিন সাম্রাজ্যের বর্তমান রাজধানীর কিঞ্চিৎ আন্দাজ পাওয়া যাবে।

আসলে দুটো ভিন্ন শহর নিয়ে গ'ড়ে উঠেছে পিকিং মস্ত একটা দুর্গপ্রাচীর দিয়ে শহরটা দু ভাগে ভাগ করা, চিনে পাড়াটা একটা আয়তক্ষেত্রাকার সামারিকের মতো, আর তাতার পাড়াটা যেন চৌকো একটা বর্গক্ষেত্র, এই তাতার পাড়াতেও দুটো মহল্লা রয়েছে একটার নাম হোয়াং-চিং, পীতনগর, অন্যটা হলেন কিন-চিং ওরফে লোহিত বা নিষিদ্ধ পল্লি।

আগে এখানে বিশ লাখের বেশি লোকের বাস ছিলো, কিন্তু চরম দুর্দশায় প'ড়ে অনেকে বাস্তুত্যাগ ক'রে চলে গেছে। এখন লোকসংখ্যা দাঁড়িয়েছে লাখ দশেক, বাসিন্দারা মূলত তাতার আর চৈনিক, এছাড়া হাজার দশেক মুসলমান, আর কিছু মোঙ্গোল আর তিব্বতিও আছে। তাতার পল্লিটি একটি দুর্গপ্রাচীর দিয়ে ঘেরা, ইট পাথরের এই প্রাচীরটি চওড়ায় চল্লিশ পঞ্চাশ ফুট হবে, উচ্চতাতেও তাই। দুশো গজ পরে-পরে রয়েছে পেল্লায় একেকটি পাটাতন, সব সময় সশস্ত্র পাহারা থাকে এখানে, পুরো প্রাচীরটা এক চমৎকার বেড়াবার জায়গা, দৈর্ঘ্যে পনেরো মাইল হবে। এই সুরক্ষিত নগরীর মধ্যেই সম্রাট ওরফে 'দেবপুত্র' বাস করেন।

তাতার পল্লির হলুদ শহর বা পীত নগরীর আয়তন প্রায় ১৫০০০ একর, আটটা তোরণ দিয়ে ঢোকা যায় হলুদ শহরে, তিনশো ফুট উঁচু, কয়লার তৈরি বিশাল এক পিরামিডই এখানকার প্রধান দ্রষ্টব্য, আর আছে এক সুন্দর হ্রদ — 'মধ্যসাগর' বলে তাকে লোকে, মার্বেল পাথরের একটু সেতু আছে তার

উপর; আছে বৌদ্ধ শ্রমণদের জন্য দুটি মহাবিহার ও প্যাগোডা; পাই-থা-সে নামে একটি ধর্ম প্রতিষ্ঠান আছে যাদের স্বচ্ছ নির্মলজলে ঘেরা একটা ছোট্ট ব-দ্বীপে; ক্যাথলিক মিশনারিদের জন্য আছে পেং-তং, তাদের বাসস্থান। আছে এক রাজমন্দির, উজ্জ্বল নীল-টালি বসানো সেই ঘন্টার গভীর নিনাদ অনেক দূর থেকে শোনা যায়, আর আছে বর্তমান রাজবংশের উদ্দেশে সমর্পিত একটি বিপুল মন্দির, প্রেতাত্মার মন্দির, 'পবনদেবের মন্দির', বজ্র-দেবতার মন্দির, রেশমের দেবতার মন্দির, দেবরাজের দেবালয়, ড্রাগনদের পক্ষমণ্ডপ, চিরনির্বাণের মহাবিহার—এইগুলোও দ্রষ্টব্য বস্তুর তালিকায় শীর্ষস্থান নিতে পারে।

আর হলুদ শহরের ঠিক মাঝখানে—তার বুকের কাছে, বলা যায়—রয়েছে নিষিদ্ধ নগরী। ১৮০ একর জমি জুড়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এই লোহিত নগর, চারপাশে পরিখা-কাটা, সাতটি মারবেল পাথরের সেতু আছে তার উপর। এটা নিশ্চয়ই বলা বাহুল্য যে মাঞ্চুরাই যেহেতু বর্তমান শাসক, সেইজন্য পিকিং-এর এই অংশে মূলত কেবল মাঞ্চুদেরই বাস—পরিখার ওপারে, প্রাচীরের বাইরে, চৈনিকেরা তাদের নিজেদের পল্লিতেই কেবল থাকে।

নিষিদ্ধ নগরীর চারপাশে হলুদ রঙের টালিবসানো লাল ইটের দেয়াল; 'মহাশুদ্ধতার তোরণ' দিয়ে প্রবেশ করা যায় এই পল্লিতে, আর তোরণদ্বার কেবল খোলে যখন সম্রাট কিংবা সম্রাজ্ঞী যাতায়াত করেন। ভিতরে আছে তাতার রাজবংশের পূর্বপুরুষদের দেবালয়: রংচঙে টালি-বসানো ডবল ছাত দেয়ার, চি আর ৎসি নামে ঊর্ধ্ব ও অধঃলোকের দুই অধীশ্বরের নামে দুটি মন্দির আছে এখানে, আর আছে গাশমহল, রাষ্ট্রীয় উৎসব ও ভোজসভা উপলক্ষে যেখানে অভিজাতগণ জমায়েৎ হন, তারপরেই মারুমহল, এই দেবপ্রিয় দেবপুত্রগণের বংশলিপি সেখানে দেখা যায়, তারপরেই আম দরবার, যার বড়ো হলঘরটায় সম্রাট বসেন অমাত্যদের নিয়ে, নাই-কোর পটমণ্ডপে প্রাক্তন সম্রাটের খুল্লতাত যুবরাজ কং-এর সভাপতিত্বে সাম্রাজ্যের সচিবসভা বসে—যুবরাজ কং নিজে পররাষ্ট্র সচিব, তারপরে রয়েছে কলালক্ষ্মীর চন্দ্রাতপ, যার ছায়ায় সম্রাট বছরে একবার ক'রে ধর্মগ্রন্থ পঠনপাঠনে নিয়োজিত থাকেন, তারপরেই হ'লো ৎচুয়ান-সিন-হিয়েনের নাটমণ্ডপ, যেখানে কনফুসিয়াসের উদ্দেশে বলিদান হয়: অন্যান্য দ্রষ্টব্যের মধ্যে রাজার গ্রন্থাগার, প্রত্নতত্ত্বশালা, ভু-ইংসেন-হিয়েন বা মুদ্রণশালা, বসন-শিল্পালয় প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তারপরে কেউ ইচ্ছে করলে দ্যুলোকজ্জ্বলতার প্রাসাদ দেখতে যেতে পারে: রাজপরিবারের

যাবতীয় জটিলতা এখানে আলোচনা ক'রে মোচন করা হয়; ঐহিক ভবনে থাকেন তরুণী সম্রাজ্ঞী; সম্রাটের অসুখ হ'লে আশ্রয় নেন ধ্যানভবনে; রাজবংশের শিশুদের জন্য রয়েছে তিনটি অট্টালিকা; ১৮৬১ খ্রীস্টাব্দে হিয়েন-ফং যখন মারা যান, তখন তাঁর বিধবা ও তাঁর সন্তানদের জন্য 'চতুরঙ্গভবনটি' দিয়ে দেয়া হয়, ৎচু-নিং-কং হ'লো রানীমহল, সখিভবনে রানীর সখিরা রাজঅতিথিদের অভ্যর্থনা করেন, নির্বাণভবন নামটি আশ্চর্য, কারণ এখানে অভিজাত রাজপুরুষদের ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া শেখে; পরবর্তী দ্রষ্টব্য: অনশনভবন—যেখানে অনশন ক'রে চিত্তশুদ্ধি ক'রে নেয়া হয়, ক্লান্তিহরভবন—যেখানে রাজকুমারেরা থাকেন। গতায়ু পূর্বসূরিদের উদ্দেশে নিবেদিত মন্দিরটির ভাবও উল্লেখযোগ্য। নগরদেবতার মন্দির ও তিব্বতি দেবালয়টিও দৃষ্টি আকর্ষণ করার মতো। তাছাড়া রাজভবন ও আপিসকাছারি আছে বহু, লাওকং-চুতে থাকে নপুংসকেরা—লোহিত নগরে তাদের সংখ্যা পাঁচ হাজারের কম নয়, সব সুদ্ধ ৬৮টি অট্টালিকা রয়েছে রাজভবনের চৌহদ্দির মধ্যে: তার মধ্যে অবশ্য হলুদ শহরের হ্রদের পাশে অবস্থিত ৎজেন-কুয়াং-কো বা বেগনি আলোর মণ্ডপের কথা ধরা হয়নি, এই মণ্ডপেই ১৮৭৩ সালের ১৯শে জুন ইংরেজ, রুশ, আলেমান, ওলন্দাজ ও মার্কিন রাজদূতেরা রাজসন্নিধানে যাবার অধিকার পেয়েছিলেন। এই তালিকা থেকে ওয়ান-চেউ-চানকেও বাদ দেয়া উচিত হবে না—এই গ্রীষ্মাবাসটি পিকিং-এর মাইল পাঁচেক দূরে অবস্থিত। ১৮৬০ সালে এই গ্রীষ্মাবাসটি ধ্বংস হ'য়ে যায়। সেই ভগ্নস্তূপের মধ্যে এখন আর 'অচঞ্চল শিখার বিতান', 'পান্নার ফোয়ারা,' আর 'দশ সহস্র প্রাণের চূড়া' ভালো ক'রে চোখেই পড়ে না। আর-কোনো প্রাচীন শহরেই এমন অদ্ভুত ও বিচিত্র হর্ম্যরাজি দেখা যায় না, ইওরোপের কোনো রাজধানী এমন আশ্চর্য ভাষায় তার প্রাসাদগুলির নামকরণ করেনি।

হলুদ শহরের চারপাশে যে-তাতার পল্লি রয়েছে, সেখানে রয়েছে ইংরেজ, ফরাসি ও রুশ দূতাবাস, লনডন মিশনের হাসপাতাল, একাধিক ক্যাথলিক মিশনভবন, আর একটি হস্তিশালা যার বাসিন্দা এখন কেবল একটি থুরথুরে বুড়ো কানা হাতি। মস্ত একটা ঘড়িঘর সেখানে মাথা তুলেছে শূন্যে—তার লাল ছাতে সবুজ টালি বসানো। কনফুসিয়সের মন্দির, হাজার সাধার বিদ্যাভবন, কা-হুয়ার দেবালয়, মস্ত চৌকো স্তম্ভওলা জ্যোতির্মন্দির, জেসুইট ও অধ্যাপকদের ইমারত, পরীক্ষাগ্রহণকেন্দ্র—তাতার পল্লির প্রধান দ্রষ্টব্য এগুলোই। পুবে-পশ্চিমে আছে বিজয়তোরণ। উত্তরসাগর শৈবালসাগর নামে

দুটি ছোটো খালে নীল পদ্ম ফুটে থাকে রাশি-রাশি — গ্রীষ্মাবাস থেকে বেরিয়ে এসে এই খাল দুটি বড়ো খালটায় গিয়ে পড়েছে। অর্থ, উৎসব, সমর, পূর্ত ও স্বরাষ্ট্র সচিবদের প্রাসাদগুলো এখানেই অবস্থিত: মহাফেজখানা, জ্যোতির্বিদ্যা ও চিকিৎসাবিভাগের প্রধান কার্যালয়ও এই এলাকাতেই অবস্থিত। অদ্ভুত অঞ্চল এটা. দারিদ্র্যে আর জাঁকজমকে যেন মাখামাখি হ'য়ে আছে এখানে। একদিকে আছে সরু কানা গলি, আলো পৌঁছোয় না, হাওয়া ঢোকে না, ঘিঞ্জি জীর্ণ হতশ্রী বাড়ি সারে সারে, আর তারই মাঝে-মাঝে গাছপালার আড়ালে ছায়ার ঘোমটা মুখে টেনে আকাশ পর্যন্ত উঠে গেছে মস্ত প্রাসাদ — কোনো সচিব বা অভিজাত পুরুষ হয়তো সেখানে থাকেন। গ্রীষ্মকালে রাস্তাঘাটগুলো ধুলোবালিতে অসহ্য হ'য়ে ওঠে, আর শীতকালে তারা শুকিয়ে-যাওয়া ছোট্ট ঝরনার চেয়ে বেশি ভালো নয়। যত রাজ্যের বেওয়ারিশ কুকুর, কয়লার বোঝা পিঠে মোঙ্গোলীয় উট, আট বেহারার টানা পাল্কি, খচ্চরে-টানা গাড়ি-ঘোড়ায় রাস্তা-ঘাটে সব সময়েই প্রচণ্ড ভিড় আর হৈ-হল্লা লেগেই আছে। মঁসিয় গুধের হিসেব মতো অন্তত: ১০০০০ ভিখিরি থাকে এখানে, আর মঁসিয় আর্মে বলেছেন যে জীর্ণ খানাখন্দ ভরা রাস্তায় জলভরা খাদগুলি এতই গভীর হয় যে কোনো অন্ধ লোক যে-কোনো মুহূর্তে জলে ডুবে ম'রে যেতে পারে।

চৈনিক পল্লি বরং কে হবাই চেং নানা দিক দিয়ে পিকিং-এর তাতার পল্লিরই আরেক সংস্করণ। দক্ষিণ মহল্লায় দ্যুলোকের আর কৃষির দেবতার উদ্দেশে নিবেদিত দুটি মন্দির আছে, আর আছে দেবী কোআনাইনের দেবালয়, জগৎপ্রতিভার পুণ্যগৃহ, কালো ড্রাগনের মন্দির, ও ভূলোক-দ্যুলোকের আত্মার উদ্দেশে নিবেদিত পটমণ্ডপ। অন্যান্য দর্শনীয় স্থানের মধ্যে সোনালি মাছের দিঘি, কাই-ওয়ান-সের মঠ, বাজার ও নাট্যশালা উল্লেখযোগ্য। সবচেয়ে বড়ো রাস্তাটা যেন শহরের ধমনী — উত্তর থেকে দক্ষিণে সমস্ত শহর জুড়ে এই গ্র্যাণ্ড অ্যাভিনিউ চ'লে গেছে তিয়েন তোরণ থেকে হং তিং ফটক পর্যন্ত। আর একেই সমকোণে ছেদ ক'রে গেছে আরেকটি আরো-লম্বা রাস্তা — পূর্বপ্রান্তের চা-তোরণ থেকে পশ্চিমের কোয়ান-হুং ফটক পর্যন্ত। এই রাস্তার নাম চা-কোআ অ্যাভিনিউ — গ্র্যাণ্ড অ্যাভিনিউকে যেখানে এই চা-কোআ অ্যাভিনিউ ছেদ করেছে, সেইখানেই থাকে সুন্দরী লা-ও, কিন-ফো যাকে বিয়ে করবে ব'লে ঠিক ক'রে আছে।

এটা নিশ্চয়ই মনে আছে যে দুঃসংবাদ বহন ক'রে প্রথম চিঠি আসার পর এই তরুণী বিধবাটি কিন-ফোর অবস্থা পরিবর্তনের খবর পেয়েছিলো আরেকটি

চিঠিতে, যাতে জেনেছিলো সপ্তম চাঁদ ডুবে যাবার আগেই তার প্রিয়তম তার কাছে ফিরে আসবে। সেই যে মাসের ১৭ তারিখের পর থেকে কিন-কোর আরেকটা কথাও শোনেনি সে। শাংহাইতে বেশ কয়েক বার চিঠি লিখেছে লা-ও, কিন্তু কিন-কো শূন্যে ঝাঁপ খেয়ে তার ওই খ্যাপা অভিযানে বেরিয়েছে ব'লে তার চিঠিগুলো সব নিরুত্তরই থেকে গেছে। ১৯শে জুন এসে গেলো, অথচ কিন-কোর কোনো পাত্তা নেই—লা ওর অস্বস্তি যে কী-পরিমাণ বেড়ে গিয়েছিলো তার বর্ণনা দেয়ার চেয়ে বরং কল্পনা করা সহজ। এই দীর্ঘ ক্লান্তি-কর জীর্ণ-করা দিনগুলোয় একবারও লা-ও বাড়ি ছেড়ে পা বাড়ালো না—তার উৎকণ্ঠা ক্রমেই বেড়ে চললো, আর তার বুড়ি-মা নানও তারই সঙ্গে পাল্লা দিয়ে দুর্বহ হ'য়ে উঠতে লাগলো—সে মোটেই এই নির্জন যন্ত্রণার উৎফুল্ল সঙ্গী নয়।

যদিও লাওৎসের ধর্মই চিনের সবচেয়ে পুরোনো ধর্মমত (খ্রিস্টের জন্মেরও পাঁচশো বছর আগে তার সূচনা হয়েছিলো) আর কনফুসিয়ুসীয় ধর্ম যদিও তারই সমসাময়িক আর স্বয়ং সম্রাট, অভিজাতজন ও প্রধান মান্দারিনদের আরাধ্য, তবু বৌদ্ধ মতবাদ বা ফো-র ধর্মই অধিকাংশ লোককে আকৃষ্ট করেছিলো। পৃথিবীতে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের সংখ্যাই সর্বাধিক—অন্তত ৩০০,০০০,০০০ লোক বোধিসত্ত্বের পুজারী। আর চিনদেশে বৌদ্ধদের দুটো মত আছে—মঠে বা বিহারে যারা থাকে, তারা ধূসর আলখাল্লা আর লাল টুপি মাথায় দেয়—অন্য লামারা আপাদমস্তক পীত বসনে সজ্জিত থাকে। লা-ও এই প্রথম শ্রেণীর বৌদ্ধদের সমর্থক—দেবী কোআনাইনের নামে নিবেদিত যে কোআন-তি-মিআও মন্দির আছে, প্রায়ই সেখানে সে পুজো দিতে যায়। সেখানে পাথরের মেঝেয় সাষ্টাঙ্গে শুয়ে প'ড়ে সে ধূপকাঠি জ্বালিয়ে দেবীর পুজো দেয় আর কায়মনোবাক্যে তার প্রেমিকের সুখশান্তি কামনা করে।

আজ এই ১৯শে জুন তারিখে হঠাৎ তার মন কেন যেন যতরাজ্যের অলুক্ষুনে আশঙ্কায় ভ'রে গেলো। অমনি সে ঠিক ক'রে ফেললো দেবীর কাছে গিয়ে সে কিন-কোর মঙ্গলের জন্য ধর্না দেবে। নানকে ডেকে সে গ্র্যাণ্ড অ্যাভিনিউর মোড় থেকে একটা পাল্কি ডেকে আনতে বললো। নান কোনো উত্তর দেয়ার প্রয়োজন বোধ করলে না, বিরক্তিভরে কাঁধ ঝাঁকিয়ে কর্ত্রীর হুকুম পালন করতে চ'লে গেলো।

নান চ'লে যেতেই লা ও করুণ-চোখে একবার তার গ্রামোফোনটির দিকে তাকালো। আহা! কতদিন এটা কোনো কথা কয় না—চুপচাপ প'ড়ে আছে, বিমর্ষ! 'আমি যে ওকে কখনো ভুলিনি, অন্তত এটা তো ও জানতে পারবে,'

মনে-মনে সে ভাবলে, 'আমার মনের কথা যদি ধ'রে রাখি, ও তো ফিরে এসে তা শুনে নিতে পারবে।' কণ্টা চালিয়ে দিয়ে লা-ও যেন তার হৃদয় ঢেলে দিলে তার মধ্যে। কতক্ষণ যে তার ওই আকুল গুঞ্জন চলতো ঠিক নেই, কিন্তু নান হঠাৎ দুমদাম ক'রে ঘরে ঢুকে তাড়া লাগলো, 'পাল্কি হাজির!' সেই সঙ্গে অবশ্য এ-কথাও বললো যে তার মতে এখন নাকি লা-ওর বাড়ি থাকাই উচিত। কিন্তু বুড়ি দাদার আপত্তিতে কোনো ফল হ'লো না। লা-ও তাকে একা ব'সে যত খুশি গজগজ করতে দিয়ে পাল্কিতে গিয়ে উঠলো, বেয়ারাদের বললো তাকে কোআন-তি-মিআও নিয়ে যেতে।

মন্দিরের রাস্তায় কোনো ঘোরপ্যাঁচ নেই—সোজা গ্র্যাণ্ড অ্যাভিনিউ ধ'রে তিয়েন তোরণ পর্যন্ত যেতে হয়। কিন্তু যাওয়া বললেই কি যাওয়া হয়, এ-রাস্তা দিয়ে তাড়াতাড়ি যায় কার সাধ্যি! একে রাজধানীর সবচেয়ে জনবহুল অঞ্চল এটা—তার উপর এই সময়ই শহরের ব্যস্ততা চরমে পৌঁছোয়। কার সাধ্যি এই হৈ হল্লায় কান পাতে! আর ফিরিওলারা রাস্তার দু পাশে সারি বেঁধে পশরা সাজিয়ে বসে এ-সময়—দেখে মনে হয় মেলা বসেছে। যত্তরাজ্যের বক্তা, সরকারি কত্তোর' ঘোষক, জ্যোতিষী, ছবি-আঁকিয়ে, কৌতুকশিল্পী (মান্দারিনদের অঙ্গভঙ্গি নকল করে তারা টিটকিরি দেয়)—সবাই এই হৈ-হল্লায় নিজেদের গলা যোগ ক'রে দিয়েছে। এক সময় আবার জমকালো এক শবযাত্রা রাস্তার গাড়িঘোড়া অচল করে দিলো, আরেক জায়গায় আবার একদল বরযাত্রী গেলো—শবযাত্রার লোকদের মতো ততটা ফুর্তি অবশ্য তাদের দেখা গেলো না—কিন্তু রাস্তার গাড়ি-ঘোড়া থামিয়ে দিতে তারা কশুর করলে না। কোনো ম্যাজিস্ট্রেটের হ্যামেনে হয়তো কেউ গিয়ে ঢাকে কাঠি দিয়ে বিচার প্রার্থনা করলে, অমনি হৈ-হৈ ক'রে চারপাশে ভিড় জমে গেলো। 'লিঙ-পিং' পাথরের কাছে এক অপরাধী হামাগুড়ি দিয়ে ঘাড় নিচু ক'রে ব'সে অপেক্ষা করছে কখন জল্লাদের কুঠার নেমে আসে ঘাড়ে—আর চারপাশে লাল ঝাপ্পাওলা মাঙ্কিটুপি মাথায় কড়া পুলিশ পাহারা—কোমরে একই খাপে তলোয়ার আর কৃপাণ রেখেছে তারা। আরেক জায়গায় দেখা গেলো একদল চৈনিক বদমাশের বেণী ধ'রে টানতে-টানতে শাস্তি দেবার জন্য নিয়ে-যাওয়া হচ্ছে। তারপরেই দেখা গেলো এক কাঠের খোপের মধ্যে বন্দী একটা লোকের ডান পা আর বাঁ হাত খোপের দেয়ালের ঘুলঘুলি দিয়ে বের ক'রে রাখা হয়েছে: এক চোরকে বসিয়ে রাখা হয়েছে এক কাঠের বাক্সে, তার মাথাটাই কেবল বাক্সের বাইরে বেরিয়ে আছে: তারপরেই দেখা গেলো আরেকদল গুণ্ডাবদমাশকে জোয়ালে যেমন

ক'রে ষাঁড় জোতে তেমনি ক'রে একসঙ্গে জুতে রাখা হয়েছে। আর তাছাড়া রাস্তার যেখানেই বেশি ভিড়, সেইখানেই অন্ধ, কানা, খঞ্জ, আতুর, বোবা, কালারা ভিক্ষে চাচ্ছে - কেউ তাদের মধ্যে আতুর সেজেছে, কেউ বা আবার সত্যি বিকলাঙ্গ—কুষ্ঠরোগীর চারপাশে তাদের সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি।

মন্থরভাবে এগোচ্ছে লা-এর পাল্কি, কারণ যতই তারা বহির্দেয়ালের দিকে এগোচ্ছে ততই গাড়ি-ঘোড়া লোকজনের ভিড় বেড়ে যাচ্ছে। অবশেষে দেবী কোআনাইন-এর মন্দিরের দ্বারে এসে বেয়ারারা পাল্কি নামালো। পাল্কি থেকে নেমে মন্দিরে গিয়ে ঢুকলো লা-ও। প্রথমে নতজানু হ'য়ে প্রণাম ক'রে পরে সে একেবারে দেবীপ্রতিমার পায়ে শুয়ে পড়লো। তারপর উঠে 'প্রার্থনা-চক্রে'র দিকে এগিয়ে গেলো সে। প্রার্থনা-চক্রটি অনেকটা চরকিকলের মতো, আটটা তার ডাল, প্রত্যেক ডালেই কোনো না-কোনো পুণ্যলিপি খোদাইকরা। এক শ্রমণ ছিলেন তত্ত্বাবধানের জন্য—ভক্তদের পুজোআচ্চায় সাহায্য করেন, আর নৈবেদ্য গ্রহণ করেন তিনি। লা-ও তাঁর হাতে কয়েকটি তায়েল তুলে দিলো, তারপর বাঁ-হাতে বুক ছুঁয়ে ডানহাতে প্রার্থনা-চক্রের হাতল ধ'রে ঘোরাতে লাগলো। প্রার্থনা যাতে সফল হয় সেজন্য বোধকরি বেশি খাটেনি সে, না-হ'লে শ্রমণটি কেন তাকে উৎসাহ দিয়ে আরো জোরে-জোরে চাকাটা ঘোরাতে বলবেন?

প্রায় পনেরো মিনিট অতি জোরে চক্রটা ঘোরাবার পর শ্রমণ তাকে জানালেন যে দেবী তুষ্ট হ'য়েই তার নিবেদন গ্রহণ করেছেন। আবার দেবীপ্রতিমাকে দণ্ডবৎ ক'রে মন্দির থেকে বেরিয়ে বাড়ি ফিরবে ব'লে পাল্কিতে এসে বসলো লা-ও।

কিন্তু মন্দিরচত্বর থেকে বেরিয়ে গ্র্যাণ্ড অ্যাভিনিউতে পড়তেই তার পাল্কিবেয়ারাদের ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দেয়া হ'লো। নির্দয়ভাবে রাস্তা থেকে ভিড় হটিয়ে দিচ্ছে সৈন্যরা, দোকানপাট সব বন্ধ ক'রে দেয়া হয়েছে হুকুম দিয়ে, আর তিপাওদের তত্ত্বাবধানে নীল ঝালর ঝুলিয়ে সব চোরাগলিতে ঢোকবার পথ বন্ধ ক'রে দেয়া হচ্ছে।

ইতিমধ্যেই শোভাযাত্রাটি ঢুকে পড়েছে রাস্তায়। সম্রাট কোয়াংলিন ওয়োকে 'মহিমার নির্ঝর' তাতার প্রাসাদে ফিরে চলেছেন এখন—তাঁর উদ্দেশে মাঝখানের বড়ো তোরণটা এখন খুলে দেয়া হবে। শোভাযাত্রার পুরোভাগে রয়েছে দুটি অশ্বারোহী পুলিশ, তারপরে রয়েছে পদাতিক বাহিনী ও

বরমধারীদের সারি; অভিজাত রাজপুরুষরা এলেন তারপর, ড্রাগন-আঁকা বিশাল এক হলদে ছাতা বহন ক'রে—চিনদেশে ড্রাগন সম্রাটের প্রতীকচিহ্ন আর ফিনিক্স-পাখি সম্রাজ্ঞীর। তার পরেই শাদা গোলাপ-আঁকা লাল আলখাল্লা পরা আর রেশমি কামিজ আঁটা ষোলোজন বেহারা বহন ক'রে নিয়ে এলো মস্ত এক চতুর্দোলা, আর এই চতুর্দোলার পাশে-পাশে ঘোড়ায় চ'ড়ে এলেন রাজপুত্র আর অন্যান্য অভিজাতগণ; ঘোড়ার পিঠে জিনের উপর থেকে ঝুলছে হলদে রেশমের ঝালর—তাঁদের আভিজাত্যের প্রতীক। চতুর্দোলায় হলদে রঙের রেশমি-পর্দা একটু উঁচু-করা: দেখা যায় স্বয়ং 'দেবপুত্র' হেলান দিয়ে ব'সে আছেন তাতে—প্রাক্তন সম্রাট তং-বচির তিনি জ্ঞাতি ভ্রাতা, আর যুবরাজ সং-এর ভ্রাতুষ্পুত্র। অতিরিক্ত একদল পরিচারক ও বেহারা এলো সবার পিছনে—দেখতে না-দেখতে গোটা শোভাযাত্রা ব্যাবসাদার, ভিখিরি, ফিরিওলা সবাইকে আশ্বস্ত ও নিশ্চিন্ত ক'রে তিয়েন তোরণ পেরিয়ে চ'লে গেলো। দুম ক'রে হঠাৎ যেমন সব কাজে বাধা পড়েছিলো, তেমনি হঠাৎ আবার একযোগে চ্যাচামেচি ও হৈ-হল্লা শুরু হ'য়ে গেলো।

এবার লা-ওর পাল্কি ধীরে ধীরে এগোতে পেলো। শেষকালে যখন সে বাড়ি পৌঁছোলো তখন দু-ঘণ্টা কেটে গেছে। আর ফিরে এসেই ত্যাখে যে কেবা কোআনাইন তাকে চমকে দেবার ব্যবস্থা ক'রে রেখেছেন!

পাল্কি থেকে নামতে-না-নামতেই ধূলিধূসর একটি খচ্চরে-টানা গাড়ি হন্তদন্ত হ'য়ে তার বাড়ির সামনে এসে থামলো, আর দরজা খুলে ভিতর থেকে নেমে পড়লো কিন-ফো—আর তার পিছন-পিছন ক্রেগ, ফ্রাই আর সুন।

'কিন-ফো, তুমি! সত্যি তুমি? আমি ভুল দেখছি না তো? চোখ খারাপ হয়নি তো আমার?' বিস্মিত লা-ও ব'লে উঠলো।

'বাঃরে, আমিই তো!' কিন-ফো উত্তর দিলে, 'বোন, তুমি কি ভেবেছিলে আমি আর ফিরে আসবো না!'

লা-ও আর একটাও কথা না-ব'লে হাত ধ'রে তাকে তার নিজের ঘরে নিয়ে গিয়ে তার গ্রামোফোনের সামনে দাঁড় করালো: তার সব গোপন উৎকণ্ঠা আর দুঃখের মুখর সাক্ষী এই গ্রামোফোন।

'এই শোনো,' লা-ও বললো, 'আমি যে সারাক্ষণ কেবল তোমারই কথা ভেবেছি, তা এখুনি বুঝতে পারবে।' বলতে-বলতে সে গ্রামোফোনটা চালিয়ে দিলে। একটু আগেই ব্যাকুল লা-ও যে-কথাগুলো বলেছিলো ঠিক গলায় সেই কথাগুলোই আবার মুখর হ'য়ে উঠলো: 'ফিরে এসো, ভাইটি আমার,

ফিরে এসো! রাতের ওই ধ্রুবতারার মতো এক হ'য়ে উঠুক আমাদের হৃদয়। তোমার ফিরে-আসার পথ চেয়ে আছি শুধু ব্যাকুল…'

একটুক্ষণ চুপ ক'রে রইলো গ্রামোফোন একটি মুহূর্তের জন্যই কেবল। তারপরে শোনা গেলো ক্যাঁচকেঁচে খনখনে গলার বিরক্তি : 'যেন কত্রীঠাকরুন একাই রয়েছে মন্দ নন -- আবার এক কর্তাও এসে হাজির হবেন! যুবরাজ ইয়েন গলা টিপে মারুক ছুঁড়িকেই -- তাহ'লেই হয়!'

এর অর্থ খুঁজে বের করা দুঃসাধ্য নয়। লা-ও পুজো দিতে চ'লে যাবার পর বুড়ি নান এ ঘরে দাঁড়িয়ে গজগজ করেছিলো—স্বপ্নেও ভাবেনি যে তার কথাগুলো সব হুবহু এই গ্রামোফোন রেকর্ডে উঠে যাচ্ছে।

ওহে দাসদাসীগণ, অবধান করো : গ্রামোফোন সম্বন্ধে সাবধান! তক্ষুনি বুড়ি নানের চাকরি গেলো -- সপ্তম চাঁদ ডুবে-যাবার সময়টুকুও সে পেলে না, সেদিনই তাকে বাড়ি ছেড়ে চ'লে যেতে হ'লো।

১৫

কপাল যায় সঙ্গে

কিন-ফোর সঙ্গে লা-ওর বিয়ে হবার সব বাধাই এখন অপসৃত। সত্তি-সে ওয়াংকে যতখানি সময় দেয়া হয়েছিলো, তা এখনো সম্পূর্ণ উত্তীর্ণ হয়নি, কিন্তু দুর্ভাগা দার্শনিকটি তো শেষ পর্যন্ত অমন অদ্ভুতভাবে পালাতে গিয়ে জলে ডুবেই ম'রে গেলো -- এখন আর তার কাছ থেকে অন্তত কোনো আশঙ্কা নেই। একদা কিন-ফো যে-তারিখে নিজের জীবনে ছেদ টেনে দিতে চেয়েছিলো, সেই পাঁচিশে জুন তারিখেই বিয়ে হবে ব'লে ঠিক হ'লো।

প্রথম যে-দিন কিন-ফো চিঠি লিখে লা-ওকে প্রত্যাখ্যান ক'রে জানিয়েছিলো যে তাকে সে তার দারিদ্র্য ও দুর্দশায় অংশীদার করতে চায় না, কিংবা তাকে পুনর্বার বিধবা ক'রে যাবার ইচ্ছে তার নেই, তার পর থেকে কিন-ফোকে যে কতবারই পরিহাসপ্রবণ ভাগ্যের উত্থান-পতন সহ্য করতে হয়েছে সে-সব লা-ও এবার জানতে পেলো, জানতে পেলো ভাগ্যের সেই আমূল পরিবর্তনের কথা, যার ফলে আবার উন্মুখ কিন-ফো এসে তাকে বিয়ে করতে চাচ্ছে।

ওয়াং-এর মৃত্যুর বিবরণ শুনে লা-ও তার চোখের জল সামলাতে পারলে

না। কত কাল ধ'রে জানে সে এই দার্শনিককে। ওয়াংকে সে শ্রদ্ধার চক্ষে দেখতো চিরকাল; তাছাড়া লা-ও যখন প্রথম কিন-ফোর প্রেমে পড়েছিলো, তখন ওয়াংই ছিলো তার একমাত্র সহায় ও পরামর্শদাতা—তার কাছেই লা-ও প্রথম হৃদয় উদ্‌ঘাটন করেছিলো। 'আহারে!' ধরা গলায় বললো লা-ও, 'বেচারা ওয়াং। বিয়ের সময় ওকে না-দেখে বড্ড মন কেমন করবে আমার!'

'সত্যি বেচারা!' কিন-ফোও দুঃখ প্রকাশ করলো, 'কিন্তু এটা মনে রেখো, আমাকে বধ করবে ব'লে শপথ করেছিলো ও।'

'না, না,' সুন্দর ছোট্ট মাথাটি নেড়ে বললো লা-ও, 'কিছুতেই ও-কাজ সে করতে পারতো না! এ-কথা আমি মোটেই বিশ্বাস করি না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস ওই প্রতিশ্রুতিটা এড়াবার জন্যই সে পাই-হোয় ডুবে মরেছে।'

তার অনুমানটি যে অসম্ভাব্য নয়, এটা কিন-ফোকে স্বীকার করতেই হ'লো। যৌবনের এই প্রিয় বন্ধুটিকে হারিয়ে তারও মনস্তাপের সীমা ছিলো না। তারা দুজনেই ওয়াংকে খুব শিগগির ভুলে যেতে পারবে ব'লে তো মনে হয় না।

এটা নিশ্চয়ই বলা বাহুল্য হবে যে পালিকাও সেতুর সেই মর্মান্তিক দুর্ঘটনার পরে খবরের কাগজে বিডুল্‌ফের ওই সাড়া-জাগানো বিজ্ঞাপন বেরোনো বন্ধ হ'য়ে গিয়েছিলো—কিন-ফোর নাম যেমন উল্কাবেগে দেশসুদ্ধ কুখ্যাতি কুড়িয়েছিলো, তেম'ন উল্কাবেগেই তা আবার বিস্মৃতিতে তলিয়ে গেলো। ক্রেগ আর ফ্রাইয়ের চাকরি এখন আর তেমন ভীষণ জরুরি নয়। সত্যি যে তিরিশ তারিখ অবধি, বীমার মেয়াদ উত্তীর্ণ না-হওয়া পর্যন্ত, সেণ্টেনারিয়ানের স্বার্থের কথা বিবেচনা ক'রে তাদের কিন-ফোর উপর কড়া নজর রাখতে হবে। তবু এটা ঠিক ওয়াং-এর কাছ থেকে কোনো বিপদ আসার এখন আশঙ্কা নেই—কিন-ফো যে এখন আত্মহত্যা করতে চাইবে, এটা ঠিক সম্ভব ব'লে মনে হয় না—বরং এখন সে যথাসম্ভব দীর্ঘকাল বেঁচে থাকতেই চাইবে। কিন্তু কিন-ফো দুম ক'রে তাদের হঠাৎ বরখাস্ত ক'রে দিতে চাচ্ছিলো না। তারা অবশ্য নিঃস্বার্থভাবে তাকে বাঁচাবার জন্য মাথার ঘাম পায়ে ফেলে খাটেনি, কিন্তু তাহ'লেও তারা যথেষ্ট দরদ দেখিয়েছে, শত অসুবিধে সত্ত্বেও কর্মে অবহেলা করেনি, সেই জন্যেই কিন-ফো তাদের অনুরোধ করলো বিবাহ-উৎসব পর্যন্ত থেকে যেতে। বেশ খুশি হ'য়েই ক্রেগ আর ফ্রাই এই আমন্ত্রণ গ্রহণ করলো।

ফ্রাই ঠাট্টা ক'রে তার জুড়োভাইকে বললে, 'বিয়েটাও একধরনের আত্মহত্যাই।'

'আত্মহত্যা না-হোক, নিজের জীবন অন্যের কাছে সমর্পণ ক'রে দেয়া তো বটে,' ক্রেগ উত্তর দিলো।

বুড়ি নানের জায়গায় শিগগিরই সভ্যভব্য আরেকজনকে গৃহকর্মের জন্য নিয়োগ করা হ'লো লা-ওর বাড়িতে। তাছাড়া সু-তা-সু এসেছেন বাড়িতে; লা-ওর মাসি তিনি, যথেষ্ট বয়েস হয়েছে, বিয়ের সময় লা-ওকে তিনিই সম্প্রদান করবেন। তিনি আসলে একজন নীল কিতেওলা দ্বিতীয় শ্রেণীর মান্দারিনের স্ত্রী—(আগে তিনি ছিলেন সম্রাটের উপাধ্যায় আর হানলিন আকাদেমির সদস্য)—মনে হয় লা-ওর মা বেঁচে থাকলে যেভাবে বিবাহের কাজ চালাতেন, ঠিক সেইভাবেই সব কাজ তিনি সমাধা করবেন।

কিন-ফোর ইচ্ছে ছিলো বিয়ের পরেই পিকিং ত্যাগ করবে—প্রথমত রাজসভার ধারেকাছে থাকার অভিরুচি তার ছিলো না, দ্বিতীয়ত তরুণী স্ত্রীকে তার ওই জমকালো ইয়ামেনের কর্ত্রীরূপে প্রতিষ্ঠিত দেখতে চাচ্ছিলো সে। ইতোমধ্যে সে তিয়েন-মেন দুর্গপ্রাচীরের কাছে তিয়েন ফু-তাং ওরফে স্বর্গসুখের সরাইখানা নামে একটি মস্ত ও ভালো হোটেলে আস্তানা গেড়েছিলো—চৈনিক ও তাতার পল্লির ঠিক মাঝখানে পড়ে হোটেলটা। ক্রেগ আর ফ্রাইও ওই হোটেলেই উঠেছিলো। ক্রমশ গল্পগুজব করতে-করতে তার কাছে লেগে গিয়েছিলো, কিন্তু আশপাশে কোনো ফোনোগ্রাফ আছে কি না, সেটা সে দেখে নিতে অবশ্য ভোলেনি। বুড়ি-মা নানের দুর্দশা দেখেই সে যথেষ্ট সাবধান হ'য়ে গেছে।

পিকিং-এ হঠাৎ কোয়াংতুঙের দুই বন্ধুর দেখা পেয়ে কিন-ফো খুব খুশি হ'য়ে উঠলো—ইন-পাং এখানে এসেছে ব্যাবসাসূত্রে, আর সাহিত্যিক হুআল বেড়াতে। তাদেরও আমন্ত্রণ করা হ'লো আসন্ন উৎসবে—রাজধানীর যে-সব অভিজাত রাজপুরুষ ও ব্যাবসাদারদের কিন-ফো চিনতো, তারাও নিমন্ত্রণ-তালিকা থেকে বাদ গেলো না।

অবশেষে ওয়াং-এর সেই চিরনিস্পৃহ অতি উদাসীন শিষ্যটিকে সত্যি সুখী দেখা গেলো, মাত্র দুটি মাস নানা বিপত্তি ও উদ্বেগে কাটিয়েই সে নিজের সৌভাগ্যকে অনুধাবন করতে পেরেছে। ওয়াং-এর দর্শন মোটেই ভুল ছিলো না—তার অনুমানই যে শেষ পর্যন্ত সত্যি হ'লো এটা দেখবার জন্য সে-ই কি না এখন বেঁচে নেই - এটা সত্যি দুঃখের।

সারাক্ষণই কিন-ফো এখন এই তরুণী বিধবাটির সঙ্গে কাটায়। কিন-ফো পাশে থাকলেই লা-ওর সুখের সীমা থাকে না। শহরের সবচেয়ে অভিজাত

দোকান থেকে কিন-কো তার জন্ত যে দামি-দামি উপহার নিয়ে আসে, কিন্তু সে-সবের প্রতি না-ওর বিন্দুমাত্র নজর নেই। তার ধ্যানজ্ঞান কেবল কিন-কোই, বারে-বারে সে মনে-মনে বিখ্যাত পান-হোয়েই-পান এর বিচক্ষণ বাণী আওড়ায়: 'মনের মতো স্বামী পেলে তাকে কখনো হারাতে হয় না।' 'যে-মানুষটির নাম বহন করবে, তার প্রতি যেন কনের অসীম শ্রদ্ধা থাকে।' 'ছায়া যেমন থাকে, প্রতিধ্বনি যেমন থাকে, তেমনি যেন পত্নী থাকে পতিগৃহে।' 'স্ত্রীলোকের স্বর্গ স্বামীই।'

এদিকে বিয়ের উত্তোগ চলেছে পূর্ণোত্তমে। কিন-কোর ভীষণ ইচ্ছে বিয়েটা যেন খুব সুন্দরভাবে অনুষ্ঠিত হয়। কোনো মহিলার বিয়ের যৌতুক হিশেবে তিরিশ জোড়া চটিজুতো লাগে: এর মধ্যেই না-ওর ঘরে জরির কাজ-করা বহুমূল্য চটিজুতোর মেলা ব'সে গেছে। তাছাড়া মিষ্টি-মেঠাই, শুকনো ফলমূল, চিনেবাদাম-ভাজা, চিনি, সিরাপ, কমলা ছাড়া যত রাজ্যের দামি-দামি রেশমি কাপড়, জড়োয়া গয়না, আংটি, বালা, কঙ্কন, অঙ্গুলিত্রাণ, চুলের কাঁটা—অর্থাৎ কোনো তরুণীর সাজগোজে যা-যা লাগে সব—পিকিং-এর দোকানপশার উজাড় ক'রে আনা হ'য়ে গেছে।

আজব মুলুক এটা: বিয়ের সময় মেয়েরা এখানে পিতৃগৃহে থেকে কোনো যৌতুকই পায় না—আক্ষরিকভাবে বর বা বরের আত্মীয়-স্বজন যেন তাকে তার পিতামাতার কাছ থেকে কিনে নেয়। ভাই না-থাকলেও পিতার সম্পত্তির কানাকড়িও মেয়েরা পায় না—অবশ্যি পিতা যদি কোনো ইচ্ছাপত্র ক'রে যান, তাহ'লে আলাদা কথা। বিয়ের আগেই এ-সব ব্যবস্থা করতে হয়—আর ঘটকালির সময় যারা এই ব্যবস্থা ক'রে দেয় তাদের বলে 'মেই-জিন'। অতঃপর সেই তরুণী কন্যাকে ভাবী স্বামীর পিতামাতার কাছে দেখানো হয়। বিয়ের আগে স্বামীদেবতাটিকে বেচারা দেখতেই পায় না—একটা ঢাকা পাল্কিতে ক'রে তাকে স্বামীগৃহে নিয়ে যাওয়া হয় অতঃপর। পাল্কির দরজা জানলা সব তালাবন্ধ থাকে—স্বামীদেবতাটির হাতে চাবিটি সমত্নে দেয়া হয়, এবং তিনি অতঃপর দুয়ার খুলে দেন—ভিতরের কন্যাটি যদি তাঁর পছন্দ হয়, তাহ'লে তিনি হাত বাড়িয়ে দেন কন্যার দিকে—আর তা না-হ'লে সশব্দে দরজা বন্ধ ক'রে দেন তিনি মেয়েটির মুখের উপর; আর ঘটকালির সেখানেই ইতি ঘটে—কন্যার পিতামাতা অবশ্য ইচ্ছে করলে সে-ক্ষেত্রেও বায়নার টাকাটা রেখে দিতে পারেন।

কিন-কোর বেলায় অবশ্যি এ-সব অনুষ্ঠানের কোনো দরকার হ'লো না।

লা-ও আর সে—দুজনেই স্বাধীন ও অভিভাবকহীন—সুতরাং বিয়ের আগে আর-কারু পরামর্শ নেবার কথাই ওঠে না। কিন্তু অন্য কতগুলো রীতি অবশ্য অবহেলা করা চলে না—তা তাদেরও পালন করতে হবে।

বিয়ের তিন দিন আগে থেকেই লা-ওর বাড়ির অন্দরমহলে চব্বিশ ঘণ্টাই আলোয় আলোময় ক'রে রাখা হ'লো। পর-পর তিন রাত্রি কন্যাগৃহের প্রতিনিধি হিশেবে লু-তা-লু নিদ্রা থেকে বঞ্চিত রইলেন—কন্যাকে চিরকালের মতো হারাতে ব'সে তাঁর যে দুঃখের অবধি নেই, সেই বিচ্ছেদ-বেদনা প্রকাশ করার জন্যেই কন্যাকর্ত্রীকে নির্ঘুম কাটাতে হয়। কিন-কোর বাবা-মা বেঁচে থাকলে তারও বাড়ি শোক প্রকাশের জন্য আলোময় হ'য়ে থাকতো, কারণ কাঙ-ফিএৎ-চুচেন অনুযায়ী 'ছেলের বিয়েকে' নাকি 'পিতার মৃত্যুর প্রতীক' ব'লেই গণ্য করা উচিত।

তাছাড়া নানা রকম জ্যোতির্গণনাও ক'রে নিতে হয়। ঠিকুজিকুষ্ঠি মিলিয়ে দেখে বর-কনের যোটক বিচার করতে হয়। তিথি, নক্ষত্র, ঋতু, সব মঙ্গলসূচক না-হ'লে চলে না। সব বিচার ক'রে দেখা গেলো এমন রাজযোটক ও শুভ লক্ষণ নাকি কোনোকালে দেখা যায়নি।

অবশেষে সেই প্রত্যাশিত শুভ দিন এলো। উৎসব শুরু হবে ব'লে সব ঠিকঠাক। চিনদেশে অবশ্য শ্রমণ, লামা বা নগরপালের সামনে কোনো সরকারি চুক্তি সম্পাদন করতে হয় না। ঠিক হ'লো যে সন্ধেবেলায় আটটার সময় মহা সমারোহ ও জাঁকজমকের সঙ্গে কনেকে স্বর্গসুখের সরাইখানায় নিয়ে যাওয়া হবে।

সাতটার সময় কিন-কো অভ্যাগতদের আদর-আপ্যায়ন করার জন্য ক্রেগ আর ফ্রাইয়ের সঙ্গে তার কোঠার সামনে এসে দাঁড়ালো। লাল কাগজের উপর খুদে-খুদে হরফে লেখা যে-নিমন্ত্রণচিঠি কিন-কো বিলি করেছিলো, তার বয়ান এই: 'শাংহাইর কিন-কো যথাবিহিত সম্মান পুরঃসর অমুককে নিবেদন করছেন যে তিনি যেন দয়া ক'রে অধমের অতি দীন বিবাহ অনুষ্ঠানকে সফল ক'রে তুলতে সাহায্য করেন।'

একে-একে নিমন্ত্রিতরা সকলেই এসে পৌঁছোলেন। বরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করতে এসেছেন তাঁরা—যে-রাজকীয় ভোজসভার আয়োজন করা হয়েছে, তাতে তাঁরা অংশ নেবেন; মহিলাদের জন্য আলাদা টেবিলের ব্যবস্থা করা হয়েছে, তাঁরা সেখানেই বসবেন। অন্যান্য নিমন্ত্রিতদের সঙ্গে-সঙ্গে ইন-পাং আর সাহিত্যিক হুআলও যথাকালে এসে পৌঁছেছে। কয়েকজন ম্যান্ডারিন

তাঁদের সরকারি টুপির উপর তাদের উচ্চপদের স্মারক হিশেবে পায়রার ডিমের মতো লাল পাথর বসিয়েছেন। অন্য মান্দারিনদের টুপিতে শাদা বা নীল রঙের গোল পাথর বসানো—এঁরা যে তুলনায় অপেক্ষাকৃত নিম্নস্তরের, শাদা আর নীল পাথর তাই বোঝাচ্ছে। অভ্যাগতদের অধিকাংশই কিন্তু খাঁটি সৈনিক ও রাজকর্মে লিপ্ত। কিন-ফো ডাক্তারদের অপছন্দ করে ব'লে সহজেই এর কারণ বোঝা যায়। অভ্যাগতরা সবাই জমকালো পোশাক প'রে এসেছেন—আর ময়ূরপুচ্ছের মতো বর্ণবহুল জনসমাবেশ সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে বসে।

অভ্যাগতরা পৌঁছোবামাত্র কিন-ফো তাঁদের সমাদর ক'রে হলঘরে নিয়ে গেলো: দুটো ঘর পেরিয়ে এই ঘরে পৌঁছোতে হয়; জমকালো ভাবে সাজানো ঘর দুটির মধ্য দিয়ে যাবার সময় ভৃত্যেরা যখন দরজা খুলে দাঁড়ালো, সে নিজে স'রে গিয়ে অতিথিদের তার আগে যেতে অনুরোধ করলে। তার সম্ভাষণে বিনয়বচনের একেবারে ছড়াছড়ি। 'মহান নাম' ধ'রে তাঁদের সম্বোধন করলে সে, জিগেশ করলে তাঁদের 'মহান স্বাস্থ্যের' কথা, জিগেশ করলে তাঁদের 'মহান পরিবারের' কুশল। কোনো বিশ্বনিন্দুকও বোধকরি তার আচারব্যবহারে কোনো খুঁত বের করতে পারতো না।

সবিস্ময়ে ও মুগ্ধ চোখে তার হাবভাব লক্ষ করলো ক্রেগ আর ফ্রাই। আরেকটা কারণেও তারা তার উপর নজর রাখছিলো। একটা কথা সম্প্রতি তাদের দুজনেরই মনে জেগেছে। এমনও তো হ'তে পারে যে ওয়াং জলে ডুবে মরেনি। তার চুক্তির মেয়াদ ফুরোতে আরো কয়েক ঘণ্টা বাকি নেই কি এখনো? হয়তো এখন সে অতিথিদের মধ্যে ছদ্মবেশে ঢুকে তার সেই চরম আঘাত হেনে যাবে। তার সম্ভাবনা অবশ্য নেই—কিন্তু অসম্ভব ব'লে একে একেবারে উড়িয়েও দেয়া যায় না। সেইজন্যই ক্রেগ আর ফ্রাই তীক্ষ্ণ চোখে প্রতিটি অভ্যাগতকে খুঁটিয়ে দেখছিলো। কিন্তু যে-মুখটিকে তারা খুঁজে বেড়াচ্ছিলো, তাকে মোটেই দেখা গেলো না।

এদিকে কনে তখন চা-কোঅ্যাভিনিউএ তার বাড়ি থেকে বেরিয়ে বন্ধ পাল্কিটায় উঠে বসেছে। প্রাচীন শাস্ত্রে যদিও আছে যে বিয়ের সময় বর মান্দারিনের পোশাক প'রে নিতে পারে, কিন-ফো কিন্তু তবুও তা গায়ে দেয়নি; লে-ও কিন্তু এদিকে অভিজাত মহলের রীতি অনুযায়ী নিখুঁতভাবে সেজেছে। সবচেয়ে মূল্যবান উজ্জ্বল-লাল ঢিলে জামা তৈরি; তার মুখের উপর রয়েছে এক ছোটো-ছোটো মুক্তো-বসানো অতি-স্বচ্ছ ওড়না, সোনার ঝালর তার

কপালে ; জড়োয়া গয়না আর পাথরবসানো ফুল পরেছে সে তার দীঘল কালো চুলে আর বেশভূষার মধ্যে আগাগোড়া রুচি ও আভিজাত্যের ছাপ। পাল্কির দরজা খুলে কিন-কো তাকে দেখে যে অপছন্দ করার কিছু পাবে না, এটা বোধহয় নির্ভয়েই ব'লে ফেলা যায়।

শোভাযাত্রা বেরিয়ে পড়লো। শবযাত্রা হ'লে যে জাঁকজমক আরো বেশি হ'তো তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু এটাও বা কম কি ? গ্র্যাণ্ড অ্যাভিনিউ ধ'রে যখন হিয়েন-মেন দুর্গপ্রাচীরের দিকে শোভাযাত্রা চললো, কাতারে-কাতারে লোক দাঁড়িয়ে পড়লো জমকালো মিছিলটি দেখতে। লা-ওর সাথিরা সব গেলো পা ক'রে পিছন-পিছন, তাদের হাতে কনের সাজসজ্জার কত-যে উপাদান তার যেন লেখাজোখাই নেই। সবচেয়ে সামনে রয়েছে বাজনদারেরা, তারস্বরে নানা বাদ্যযন্ত্র তাদের হাতে, আর পাল্কির চারপাশ ঘিরে হাঁটছে দাসদাসীরা, হাতে তাদের মশাল আর রঙিন লণ্ঠন। কনেকে কিন্তু কিছুতেই তাকিয়ে দেখা যাবে না বাইরে থেকে : পতিদেবতাই প্রথম দর্শনের অধিকারী — অন্তত শাস্ত্রের নির্দেশ তাই।

রাস্তায় ভিড় বেশি ব'লে চতুর্দোলাটি যখন স্বর্গসুখের সরাইখানায় পৌঁছলো, তখন প্রায় আটটা বাজে। সরাইখানার দরজা জাঁকালোভাবে সাজানো হয়েছিলো, আর কিন-কো নিজে দাঁড়িয়েছিলো দরজার কাছে। চতুর্দোলার দরজা খুলে দিয়ে কনেকে নামতে সাহায্য করবে সে হাত বাড়িয়ে, তারপর একটি বিশেষ কোঠায় তাকে নিয়ে গিয়ে দ্যুলোকের চার দিক্‌পতিদের প্রণতি জানাবে। তারপর দুজনে যাবে সেই ভোজসভায়, কনে প্রথমে চারবার নতজানু হ'য়ে সবসমক্ষে বরকে অভিবাদন করবে, আর বর তার বদলে দু বার সেইভাবেই তাকে সম্মান জানাবে। এরপরে তারা দু-তিন ফোটা সুরা ছিটিয়ে দিয়ে পূর্বপুরুষদের তর্পণ ক'রে নেবে, প্রেতলোকের উদ্দেশে তারপর কিঞ্চিৎ খাদ্য নিবেদন করবে, এবং অতঃপর তাদের মিলনের পবিত্রতা সম্পূর্ণ হবে যখন পরস্পরের হাতে একটি ক'রে সুরাপাত্র তুলে দেয়া হবে. প্রথমে তারা আলাদা-আলাদাভাবে অর্ধপাত্র পান ক'রে নেবে, তারপর দুজনেই অবশিষ্ট সুরা একই পেয়ালায় ঢেলে দেবে এবং দুজনেই এবার সেই পেয়ালা থেকে বাকি মদটুকু পান করবে।

কনে এসে পৌঁছেছে দেখে কিন-কো এগিয়ে গেলো। উৎসবপালিক তার হাতে চাবি তুলে দিলেন, কিন-কো হাত বাড়িয়ে চতুর্দোলার দরজা খুলে দিলে : আর রূপসী লা-ও আস্তে একটু উত্তেজিত, মধুরভাবেই উত্তেজিত, হালকা

পায়ে নেমে এলো। অভ্যাগতরা বুকে হাত তুলে তাকে সম্ভ্রম প্রদর্শন করলেন, আর তাদেরই মধ্য দিয়ে লঘু পায়ে সে এগিয়ে এলো। কন্যা যেই সরাইখানার ভিতর পা দিলে, অমনি কে যেন সংকেত করলো আর সঙ্গে-সঙ্গে কত ফানুস আর ঘুড়ি উড়ে গেলো আকাশে—কত রকম যে দেখতে—কোনোটা ড্রাগনের মতো, কোনোটা যেন কিংবদন্তির ফিনিক্স পাখি, তাছাড়া আরো কত কিসের প্রতীক। সাথে ঘুন্টি-বাঁধা পায়রা ওড়ানো হ'লো, আর ঘুন্টির শব্দে চারপাশ ভ'রে গেলো। সেই সঙ্গে তুবড়ি হাউই আর রংমশাল জোনাকি পোকার মতো আকাশ থেকে ঝ'রে পড়তে লাগলো।

আচমকা এমন সময়ে দুর্গপরিখার ওপার থেকে এক তুমুল কোলাহল ভেসে এলো। আর, সব কলরব ছাপিয়ে, দূর থেকে ভেসে এলো শিঙার প্রবল শব্দ। কোলাহল যেন থেমে গেলো মুহূর্তের জন্য, তারপরেই আবার যখন শুরু হ'লো, তখন মনে হ'লো কলরোল যেন অনেকটা কাছে এসে পড়েছে। বোঝা গেলো, এই রাস্তা দিয়েই কোলাহলটা এগিয়ে আসছে। কিন-ফো থমকে দাঁড়িয়ে উৎকর্ণ হ'য়ে দাঁড়ালো। তার বন্ধুরা অপেক্ষা করতে লাগলো বধূকে স্বাগত জানাবার জন্য। আস্তে-আস্তে কোলাহল কাছে এসে পড়লো, শিঙার শব্দ শোনা গেলো আরো প্রবল ও গম্ভীর।

'কী ব্যাপার, বুঝছি না তো?' কিন-ফো বিস্ময় প্রকাশ করলে।

পাণ্ডুর হ'য়ে গেলো লা-ও, কী এক অলক্ষুনে আশঙ্কায় তার বুক কেঁপে উঠলো। আর তক্ষুনি রাস্তায় ছুটে এলো এক উত্তেজিত জনতা। আর এই শোরগোলের কারণ ঘোড়ার পিঠে ক'রে যাওয়া রাজপোশাকপরা এক সরকারি ঘোষক, আর তার সঙ্গে যাচ্ছে কেবল তিনজন পাণ্ডা। ঘোষক শিঙার আওয়াজ করতেই চারপাশে স্তব্ধতা নেমে এলো, শোনা গেলো তার গম্ভীর স্বর। 'রানীমাতার মৃত্যু হয়েছে! সব কাজ বন্ধ করো—রাজার নামে নিষেধ জারি করা যাচ্ছে—'

কিন-ফোর মুখ দিয়ে ক্রোধ ও হতাশা-মিশ্রিত আওয়াজ বেরিয়ে এলো। নিষেধ জারি করার অর্থ সে খুব ভালো ক'রেই জানে: ঘোষণার সঙ্গে-সঙ্গেই যতদিন পর্যন্ত রাজসভা শোক পালন করবে, ততদিন মস্তকমুণ্ডন নিষিদ্ধ, সর্বপ্রকার উৎসব বা অনুষ্ঠান, নাট্যশালা কি আদালত ততদিন বন্ধ থাকবে, সর্বোপরি কোনো বিবাহউৎসব অনুষ্ঠিত হ'তে পারবে না! শুধু তাই নয়, রাজসভা যে কতদিন শোক পালন করবে কেউ জানে না—বংশের অবস্থান ক'রে দরবার তার স্থায়িত্ব নির্ধারণ করবে।

অত্যন্ত দুঃখ অনুভব করলেও লা-ও একেবারে ভেঙে পড়েনি। কিন-ফোর হাত ধ'রে আস্তে একটি চাপ দিলো সে, তারপর কোনো রকমে ধরা গলায় বললো, 'না-হয় আর ক-টা দিনই অপেক্ষা করবো!'

সুতরাং আবার সেই রূপের ডালিকে নিয়ে চতুর্দোলা ফিরে চললো চা-কোআ ম্যানশনিউএ, উৎসব স্থগিত হ'য়ে গেলো, টেবিল পরিষ্কার ক'রে ফেলা হ'লো, বিদায় দেয়া হ'লো গীতবাদ্যের দলকে—আর অতিথিরা বিমর্ষ বরটিকে তাঁদের সমবেদনা জানিয়ে একে-একে বিদায় গ্রহণ করলেন।

শুধু ক্রেগ আর ফ্রাইকে সঙ্গে নিয়ে কিন ফো তার পরিত্যক্ত ঘরে ব'সে রইলো, আর স্বর্গসুখের সরাইখানা নামটা তাকে যেন নীরবে পরিহাস করতে লাগলো। তার পোড়াকপাল তাহ'লে এখনো তার সঙ্গ ছাড়েনি। রাজার আদেশ অমান্য করার সাহস তার ছিলো না—সম্রাট এখন কতদিন শোক পালন করেন কে জানে। এত দিনে সে বুঝলো ওয়াং কেন তাকে এত তত্ত্বকথা শোনাতো।

ঘন্টাখানেক পরে একটি চিঠি নিয়ে এক ভৃত্য এলো তার ঘরে. এক্ষুনি নাকি কে এক অচেনা লোক এসে চিঠিটা দিয়ে গেছে। চিঠিটা দেখেই কিন ফো বিস্ময়ে চেঁচিয়ে উঠলো। ওয়াং-এর হাতের লেখা চিনতে তার এক মুহূর্তও লাগেনি।

'প্রিয় বন্ধু,

'এখনো বেঁচে আছি বটে, কিন্তু চিঠিটা যখন তুমি পাবে, তখন আমি আর ইহলোকে নেই। তোমার সঙ্গে যে-চুক্তিটা আমি করেছিলুম, কিছুতেই তা সম্পাদন করার ক্ষমতা পেলুম না ব'লে আমাকে মরতে হ'লো। কিন্তু মন খারাপ ক'রে বোসো না যেন, তোমার ইচ্ছেই যাতে পূর্ণ হয়, আমি তার ব্যবস্থা ক'রে যাচ্ছি। লাও-শেন নামে আমার এক বন্ধু তাই-পিংএর কাছে তোমার অঙ্গীকারপত্র তুলে দিয়েছি। এ-কাজ করতে গেলে তার হাত অন্তত কাঁপবে না। সে-ই তোমাকে হত্যা করবে। তোমার মৃত্যুর পর আমি যে-টাকা পেতুম, সব আমি তাকেই দিয়ে গেলুম।

'বিদায়, বন্ধু, বিদায়। তোমার মৃত্যুর বেশি আগে অবশ্য আমি মরছি না, তবু বিদায়।

'তোমারই চিরবিশ্বস্ত

ওয়াং!'

১৬

পা বাড়ালেই রাস্তা

উভয়সংকট আর কাকে বলে। কিন-ফোর অবস্থা বরং আগের চেয়েও এখন আরো বিপজ্জনক হ'য়ে উঠেছে। ওয়াং-এর সাহসে যে শেষ অবধি ফুরিয়ে এসেছিলো, তা ঠিক, তার কাছ থেকে এখন আর কোনো আশঙ্কাই নেই। কিন্তু যে-নামজাদা তাই-পিংটির কাঁধে সে দায়িত্বটা দিয়ে গেছে, বুকে ছুরি বসাতে তার কি হাত কাঁপবে একবারও? শুধু তাই নয়, তার হাতে আবার এমন একটা দলিল রয়েছে, তাতে সে যে শাস্তির হাত থেকে বেঁচে যাবে; তাই নয়, সঙ্গে-সঙ্গে বিনিময়ে আবার পঞ্চাশ হাজার ডলারও পাবে। এমনিতেই তাই-পিংদের বুকে দয়া-মায়া নেই, তার উপরে আবার এই দলিল।

কী করবে ভেবে না-পেয়ে মাটিতে পা ঠুকলো কিন-ফো, বিড়বিড় ক'রে বললো, 'না, যথেষ্ট হয়েছে আর নয়। ব্যাপারটার এক ফয়শালা করতেই হবে যে-কোনোভাবে!' কী পরামর্শ দেয় জানবার জন্য ক্রেগ আর ফ্রাইয়ের হাতে ওয়াং-এর চিঠিটা তুলে দিলে কিন-ফো। তারা প্রথমেই জানতে চাইলো যে ওয়াংকে সে-চিরকুটটা লিখে দিয়েছিলো, তাতে ২৫ তারিখকেই চুক্তির শর্ত পূরণ করার শেষ তারিখ হিশেবে উল্লেখ করা ছিলো কি না।

'না। তারিখের জায়গাটা ফাঁকা রেখে ওয়াংকে চিরকুটটা লিখে দিয়েছিলুম পরে যাতে ইচ্ছেমতো একটা তারিখ সে বসিয়ে দিতে পারে। পাজির পাঝাড়া ওই লাও-শেন তো যখন খুশি তখন ছুরি বসাতে পারে—সময় নিয়ে কোনো বাধ্যবাধকতা তার নেই।'

'কিন্তু আপনার বীমার মেয়াদ তো,' ক্রেগ আর ফ্রাই বললো, 'তিরিশেই ফুরিয়ে যাচ্ছে। লাও-শেন নিশ্চয়ই এটুকু বোঝে যে তার এক ঘণ্টা পরেও ছুরি চালালে তার কোনো লাভ হবে না। না, যা করবার তা সে হয় তিরিশের আগেই ক'রে ফেলবে, নয়তো আপনার বেণীর ডগাটিও ছোঁবে না।'

এ-কথার উত্তরে খুব-একটা বাগবৈদগ্ধ্য দেখানো যায় না। অস্বস্তি বোধ ক'রে কিন-ফো ঘরের মধ্যে পায়চারি শুরু ক'রে দিলো। 'লাও-শেন লোকটাকে আমাদের খুঁজে বার করতেই হবে। যেখানেই থাক না কেন, তাকে আমাদের চাইই। ওয়াংকে যে-অভয়পত্র লিখে দিয়েছিলুম, সেটাকে

কেন্নং পেতেই হবে—যা হয় হবে, যত দাম লাগে দেবো, তবু চিরকুটটা কেন্নং চাই—তার জন্যে যদি পঞ্চাশ হাজার ডলারও দিতে হয়, তাতেও আমি পেছ পা হবো না।

'অবিশ্যি যদি তাতেও পান, তাহ'লেই,' ক্রেগ সায় দিলে।

'যদি পাই—পেতেই হবে আমাকে—পাবোই!'

কিন্তু কিন-ফো ক্রমশ উত্তেজিত হ'য়ে উঠতে লাগলো। 'আপনারা কি ভেবেছেন আমি কেবলই মুখ বুজে কেবল একের পর এক হতাশা সহ্য ক'রে যাবো?' আরো দ্রুত পায়ে সে খানিকটা পায়চারি ক'রে নিলো। কয়েক মিনিট পরে বললো, 'আবার বেরিয়ে পড়ছি আমি!'

'আমরাও আছি সঙ্গে,' ক্রেগ আর ফ্রাই জানালো তাকে।

'আমি আবার বেরোচ্ছি। আপনারা যা ইচ্ছে তাই করতে পারেন—কিন্তু আমি আর এক মুহূর্তও দেরি করবো না।'

'আমরাও যে সঙ্গে যাবো, তা তো বলাই বাহুল্য,' এক নিশ্বাসে বললো ক্রেগ আর ফ্রাই।

'সে আপনাদের অভিরুচি,' কিন-ফো আবারও বললো।

'আপনাকে একা বেরোতে দিলে আমাদের গাফিলতি হবে—কম্পানি তো আমাদের সেই জন্যে নিয়োগ করেনি।'

'বেশ,' কিন-ফো বললো, 'তাহ'লে আর একটুও সময় নষ্ট করা চলবে না।'

লাও-শেনকে খুঁজে বার করাটা খুব কঠিন কাজ হবে না বোধহয়। পাজির হদ্দ লোকটা, কুকর্মের জন্য দেশজোড়া তার নাম, ফলে দু-তিন জায়গায় খোঁজখবর নেবার পরেই জানা গেলো যে তাই-পিং বিদ্রোহে তার সক্রিয় ভূমিকা ছিলো ব'লে বিদ্রোহ নির্মূল হবার পর উত্তরে গিয়ে পে-চি-লি উপসাগরের শাখা লিয়াও-তং উপসাগরের ধারে বিখ্যাত চিনের প্রাচীরের কাছে সে আস্তানা গেড়েছে। বিদ্রোহের অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে সরকার যে-ভাবে আপোষ করেছিলেন বা শাস্তি দিয়েছিলেন, তার সঙ্গে তেমন-কিছুই করেননি—চোখ বুজে উচ্চবাচ্য না-ক'রে তাকে একেবারে চিন সীমান্তের বহির্দেশে যেতে দিয়েছেন—আর সেখানে লাও-শেন পরমানন্দে দস্যুবৃত্তি অবলম্বন ক'রে কাল কাটাচ্ছে। ওয়াং তার উপর যে-কাজের ভার দিয়েছে, সে-কাজ হাসিল করার যোগ্যতম ব্যক্তি তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

আরো ভালো ক'রে সন্ধান নেবার পর জানা গেলো সম্প্রতি নাকি লিয়াও-তং উপসাগরের একটা ছোটো বন্দর ফু-নিংএর আশপাশে দেখা গেছে লাও-

পেনকে : শুনে কিন-ফো অবিলম্বে সেখানেই যাবে ব'লে মনস্থির ক'রে নিলো। লোকটার পুরো হদিশ না-পাক, কয়েকটা সূত্র পেতে পারে তো নিশ্চয়।

প্রথমে অবশ্য লা-ওর কাছে গিয়ে এই নতুন জটিলতার কথাটা জানিয়ে আসা উচিত। শুনে লা-ও যেভাবে ভেঙে পড়লো, তা দেখলে কষ্ট হয়। অশ্রু-ভরা চোখে তার দিকে তাকিয়ে ধরা গলায় সে মিনতি ক'রে বললে, কিন-ফো যেন কিছুতেই ওই ডাকাতে খুনীটার ধারে-কাছেও ঘেঁষে না—বরং চিন ছেড়েই চ'লে যাক অন্য কোথাও। পাগল নাকি! লাও-শেনের কাছে যাবে? বরং পৃথিবীর দূরতম প্রান্তে গিয়ে আশ্রয় নেওয়া উচিত!

কিন-ফো যথাসাধ্য সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলো। বুঝিয়ে বললো যে পৃথিবীর কোনো কোণায় গিয়েও সে কোনো শান্তি পাবে না—যখনি মনে পড়বে যে তার জীবন এক অর্থপিশাচ নরাধমের দয়ার উপর নির্ভর ক'রে আছে, তখনি জীবন তার কাছে দুর্বহ হ'য়ে উঠবে। বরং লোকটাকে খুঁজে বার করতেই হবে, যেমন ক'রে হোক—টাকা চায় সে? বেশ, টাকাই দেবে সে তাকে—সেই সর্বনেশে কাগজটা তাকে উদ্ধার করতেই হবে যেমন ক'রে হোক—আর তার দৃঢ় বিশ্বাস যে এ-কাজে সে সফল হবে। তারপরেই চটপট ফিরে আসবে সে পিকিং—রাজসভায় অশৌচ কাটার আগেই সে ফিরে আসবে—কোনো ভয় নেই। 'আমাদের বিয়েটা কিছুদিন স্থগিত থেকে এক দিক থেকে ভালোই হ'লো কিন্তু,' সব শেষে সে বললো, 'একটা পলকা সুতোয় আমার প্রাণ ঝুলছে—যে-কোনো মুহূর্তে ছিঁড়ে যেতে পারে—আর এই অবস্থায় তুমি আমার স্ত্রী হ'লে কী ভীষণ হ'তো ভেবে দ্যাখো তো!'

'না, না,' ধরা গলায় ব'লে উঠলো লা-ও, 'ও-কথা বোলো না। বরং তোমার স্ত্রী হ'লেই তোমার সঙ্গে যে-কোনোখানে যাবার দাবি করতে পারতুম আমি—প্রত্যেকটি ভয়ংকর মুহূর্তে তোমার পাশে-পাশে থাকতে পারতুম তাহ'লে!'

'উঁহু, বরং এটাই ভালো হয়েছে,' বললো কিন-ফো, 'হাজার বার বিপদে পড়তে হয়, তাও সই! হাজারবার মরতে হয়, তাও-ভালো—তবু তোমাকে এমন ঝামেলায় যেন কখনো না-ফেলি।'

শুনে লা-ও আরো ভুলে গেলো। তার এই অঝোর কান্না দেখে কিন-ফোর চোখেও জল এসে গেলো। কোনোমতে 'আমি তাহ'লে…' ব'লে তার আলিঙ্গন থেকে নিজেকে ছিনিয়ে নিয়ে সে বেরিয়ে গেলো।

সেদিন সকালবেলাতেই কিন-ফোরা সদলবলে শাং-চু ফিরে গেলো। এত

ক'রে বিশ্রাম চাচ্ছে খুব, কিন্তু বারে-বারেই তাকে আবার রাস্তায় বেরিয়ে পড়তে হচ্ছে—দুঃখে তার মনে হ'লো পৃথিবীতে তার মতো পোড়া কপাল বুঝি আর কারু নেই। কিন্তু কী আর করা যায়?

কিং কর্তব্য, প্রথমেই সেটা ঠিক ক'রে নেয়া উচিত। ডাঙা দিয়ে যাবে, না জলপথে? ডাঙা দিয়ে যাওয়া মানে এমন অঞ্চল দিয়ে যাওয়া যেখানে মৃত্যুর আশঙ্কা পদে-পদে। তবু চিনের প্রাচীর পেরিয়ে আরো-দূরে যাবার সম্ভাবনা না-থাকলে সেই ঝুঁকিও তারা হয়তো নিতো, কিন্তু ফু-নিন বন্দরটা আরো দূরে অবস্থিত—কোনো জলপোতের ব্যবস্থা করতে পারলে অনেকটা সময় বাঁচানো যায়: তাহ'লে দু-তিন দিনেই পৌঁছোনো যাবে সেখানে। খোঁজ-খবর নিতে লাগলো কিন-ফো: কিছু জিজ্ঞাসাবাদ ক'রে জানা গেলো এই মুহূর্তেই নাকি পাই-হো নদীর মোহনায় ফু-নিন গামী একটি জাহাজ নোঙর ক'রে আছে—যদি এক্ষুনি একটা শাম্পানে ক'রে রওনা হ'তে পারে, তাহ'লে অনায়াসেই জাহাজটাকে ধরা যেতে পারে। হ্যাঁ, জায়গা আছে—বিফল হ'য়ে ফিরে আসতে হবে না।

ক্রেগ আর ফ্রাই মাত্র একটি ঘণ্টা সময় চাইলো: বেশ অনিচ্ছাসত্ত্বেও কিন-ফো শেষ পর্যন্ত তাদের এক ঘণ্টার জন্ত ছুটি দিলে: জাহাজডুবি হ'লে প্রাণ বাঁচাবার জন্ত নানা-রকম পোশাক-আশাক নিয়ে এলো তারা: আগেকার দিনের লাইফবেল্ট তো কিনলোই, সেই সঙ্গে সামান্যতম ঝুঁকে না-নিয়ে কিনলো ক্যাপ্টেন বোয়াতোঁর নবাবিষ্কৃত ভাসা-পোশাক।

চটপট তৈরি হ'য়ে নিয়ে ২৬শে অপরাহ্লেই তারা পাই-হো নদীর ছোট্ট ফেরি-স্টিমার 'পেই-তাং'-এ গিয়ে উঠলো। নদী এমন এঁকেবেঁকে গেছে যে তংচু থেকে মোহনা অবধি সোজাসুজি গেলে যতটুকু পথ পেরুতে হ'তো, তার প্রায় দ্বিগুণ পথ পেরোতে হয় স্টিমারকে। নদীর পাড়গুলো মনুষ্যনির্মিত—খালের জলও বেশ গভীর—সেইজন্তই বেশ ভারি-ভারি স্টিমারও যেতে পারে। তাই নদীর অন্ত শাখার—প্রায় সমান্তরালভাবে দ্বিতীয় শাখাটা চ'লে গেছে—চেয়ে এখানে জলযানের ভিড় স্বভাবতই অনেক বেশি।

ছোট্ট দ্রুত স্টিমারটি বয়াগুলোর মধ্য দিয়ে ভেসে চ'লে এলো, তার ঘূর্ণ্যমান চাকার দাপটে জল ছিটকে যাচ্ছে, মাঠের মধ্যে সেচের জন্ত যে-সব খাল গেছে তাদের জল ফুলে-ফুলে উঠেছে। শহরতলির উঁচু প্যাগোডাটি পেরিয়ে এলো স্টিমার চট ক'রে, তারপর নদী হঠাৎ তীক্ষ্ণ বাঁক নিয়েছে ব'লে চুড়োটি হারিয়ে গেলো দৃষ্টি থেকে। জোয়ার এলে কী হবে, নদী তেমন প্রশস্ত নয়:

তীরে কোথাও বালির চড়া কোথাও-বা ঝোপঝাড়, আর তারই ধার ঘেঁষে গ'ড়ে উঠেছে মাতাও, কে-দি-ডো, নন-ৎসাই আর ইয়াংৎসুন গ্রাম—তারই মধ্যে সবুজ বনের ফাঁকে-ফাঁকে গ'ড়ে উঠেছে সুন্দর কতগুলো ছোটো পল্লি।

অল্প পরেই হিয়েন-ৎসিনকে দেখা গেলো কাছে। স্টিমার থাবে ব'লে পুবদিকের ঝোলানো সাঁকোটা তুলে দিতে কিঞ্চিৎ দেরি হ'লো, তার উপরে বন্দরে নানা মাপের নানা ধরনের জাহাজের ভিড় ব'লে তার মধ্যে দিয়ে পাশ কাটিয়ে যেতে বেশ বেগ পেতে হ'লো স্টিমারকে। নোঙর-করা ছোটো-ছোটো জাঙ্ক বা শাম্পানগুলোর মধ্য দিয়েই স্টিমার চালিয়ে যেতে বিন্দুমাত্র ইতস্তত করলেন না কাপ্তেন—নোঙর ছিঁড়ে শাম্পানগুলি ভেসে গেলো। যদি বন্দরপাল ব'লে কেউ থাকতেন, তাহ'লে এই বিশৃঙ্খলাকে আরো বাড়িয়ে তুলেছেন ব'লে হয়তো টেরটা পাইয়ে দিতেন।

ক্রেগ আর ফ্রাই কিন্তু স্থির করেছিলো যে কিন-ফোর পাশ থেকে কখনো একচুলও নড়বে না। অবস্থা পরিবর্তনের ফলে দায়িত্বটা আরো বেড়ে গেছে ব'লেই তারা বোধ করেছিলো। ওয়াংকে তবু চোখে দেখলে চিনতে পারতো—তাকে দেখতে পেলেই আরো সাবধান হ'তে পারতো। কিন্তু এই লাও-শেন—এই নৃশংস ও ভয়ংকর তাই-পিংটিকে কস্মিনকালে চোখেও ভাখেনি তারা—জাহাজের যাত্রীদের মধ্যে যে-কেউই সে হ'তে পারে—যে-কোনো মুহূর্তে ছুরি সে বসাতে পারে। যথেষ্ট সাবধান আছে তো তারা? চোখ কান খোলা আছে তো ঠিকমতো? আক্ষরিকভাবেই আহারনিদ্রা ত্যাগ ক'রে বসলো তারা। খাবার জন্যেও সময় দেবার জো নেই তো ঘুমোবার সময় পাবে কোত্থেকে?

সুন তো প্রথম থেকেই চঞ্চল ও ব্যাকুল হ'য়ে আছে, তার অস্থিরতার কারণ কিন্তু সম্পূর্ণ ভিন্ন, সমুদ্রযাত্রার কথা ভেবেই তার হাত-পা ঠাণ্ডা হ'য়ে আসছে। নদীর জল শান্ত ও নিস্তরঙ্গ হ'লে কী হবে, সমুদ্র যতই এগিয়ে এলো, ততই তার মুখ-চোখ শুকিয়ে আমশি হ'য়ে গেলো।

'সমুদ্রে তাহ'লে যাওনি কোনো দিন?' ক্রেগ জিগেশ করলো তাকে।

'জীবনে না—,' সুন জানালে।

ফ্রাই বললো, 'তোমাকে দেখে তো মনে হচ্ছে না সমুদ্র তোমার ভালো লাগবে।'

'মোটেই ভালোলাগে না।'

'মাথা ঠিক রেখো কিন্তু,' ক্রেগ বললো।

'আর মুখ বন্ধ রেখো সকলরাম,' ক্লাই উপদেশ দান শেষ করলো।

বেচারা মনকে দেখে বোঝা গেলো যে মুখ বন্ধ রাখতে তার কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু করুণ বিস্তীর্ণ-হ'য়ে-আসা জলের দিকে এমন ঘোরমান চোখে তাকিয়ে রইলো যাতে অবশ্যম্ভাবী ও আসন্ন সমুদ্রপীড়ায় যাবতীয় শঙ্কা ও ভয় জেগে উঠলো। কোনো কথা না-ব'লে সে একেবারে স্টিমারের ঠিক মাঝখানটিতে গিয়ে বসলো।

ইতিমধ্যে নদীতীরের দৃশ্য ঈষৎ বদলে গেছে। বামতীরের চেয়ে ডানতীর বেশ খানিকটা উঁচু—বামতীর শুধু নিচু নয়, জলোচ্ছ্বাসে জীর্ণ ও ভাঙাচোরা। দূরে বিস্তীর্ণ প্রান্তর জুড়ে গম, যব, জনারের খেত—কোটি-কোটি অধিবাসীকে খেতে দিতে হয় ব'লে চিন যে একটুকরো জমিও অনাবাদী ফেলে রাখতে পারে না, খেতগুলো যেন এ-কথাই বোঝাতে চাচ্ছে পথিকদের। সমস্ত জমির মধ্যে খাল কেটে কেটে সেচের জল নিয়ে যাওয়া হয়েছে, বাঁশবেতের তৈরি কলকৌশল দিয়ে জল তুলে-তুলে সব দিকে ছড়িয়ে দেবার ব্যবস্থা দেখা গেলো। ইতস্তত ছড়িয়ে আছে হলদে মাটি দিয়ে তৈরি ছোটো ছোটো ঘর বাড়ি—বাড়ির সামনে আপেলের বাগান—নর্ম্যাণ্ডির বিখ্যাত আপেলের চেয়ে এ-আপেল কোনোদিক দিয়ে খাটো নয়। তীরে কোথাও-কোথাও দেখা গেলো একদল লোক পোষা করমোরান্ট পাখি দিয়ে মাছ ধরছে, সমুদ্রের পাখি করমোরান্ট—প্রভুর ইঙ্গিতে ছোঁ মেরে জলে প'ড়ে ডুব দেয়, যখন উঠে আসে জল থেকে ঠোঁটের ফাঁকে জ্যান্ত মাছ ছটফট করে—পাখিদের গলায় এমন এক ধরনের আংটা পরানো তাতে বেচারারা অতিভোজী হ'লেও মৎস্যশাবকটিকে নিজেরা গিলে ফেলতে পারে না। স্টিমারের শব্দ আর ধোঁয়া দেখে লম্বা হ'য়ে পড়া ঘাসের ডগা থেকে পেয়ে উড়ে-উড়ে পালিয়ে যাচ্ছে ছোট্ট পাখিরা: ঘুঘু, হাড়িচাচা, মছুয়ে চড়ুই, কাক।

কিন্তু নদীতীর আশ্চর্য শান্ত আর নিরালা হ'লে কী হবে, নদীতে শশব্যস্ত সাম্পান, ডিঙি, স্টিমারের অভাব নেই। যত ধরনের জলপোত সম্ভব, সব দেখা যাবে এই নদীতে। অবতল ছাত দিয়ে কামান বন্দুক আড়াল ক'রে-রাখা লড়ুয়ে-জাঙ্ক, তাদের কোনো-কোনোটার জন্য আবার দুইসারি বৈঠা রয়েছে—কোনোটার আবার রয়েছে হাতে-ঠেলা চাকা; আছে শুল্ক বিভাগের বিশাল জাঙ্ক—গলুইয়ে সব ভয়ংকর কাল্পনিক জানোয়ারের মুণ্ড-আঁকা, আর পিছন দিকটা সেই জানোয়ারেরই ল্যাজের মতো, আর আছে ব্যবসায়ীদের পেল্লায় সব জাঙ্ক—দেশের দামি-দামি মালপত্র-সমেত এই জাঙ্কগুলোই প্রতিবেশী

সমুদ্রের ভীষণ টাইফুনের সঙ্গে পাল্লা দেয়। যাত্রীবাহী জাহাজগুলো উজানে যেতে গুন টেনে যায়, আর ভাটির টানে যখন তরতর ক'রে এগোয় তখন বৈঠা চালায় মাল্লারা—একমাত্র তাদেরই ভাড়া সবচেয়ে কম। আর আছে মান্দারিনদের প্রমোদতরী—মস্ত সব বজরা—পিছনে ল্যাংবোটের মতো ডিঙিনৌকো বাঁধা। উপরন্তু কত ধরনের যে সাম্পান রয়েছে, তার ইয়ত্তা কে দেবে। পাল তুলে যাচ্ছে সাম্পানগুলো—আর সত্যি, 'তিনটে তক্তা দিয়েই তৈরি হয় সাম্পান, নাম থেকে যা বোঝা যায়। এমনকি পিঠে বাচ্চা বেঁধে মেয়েরা হুক, ছোটো সাম্পানগুলো চালায়। মাঝে-মাঝে চোখে পড়ে ভেলায় কাঠের ভেলা—মাঙ্গুরিয়ার কাঠুরেদের সম্পত্তি—ভেসে চলে আসলে ছোটোখাটো ভাসন্ত গ্রাম যেন—উপরে কেবল কুটিরই তৈরি করা হয় না, এমনকি মস্ত সব মাটির জালায় শাকসব্জি ফলানো হয়।

তীরে কিন্তু গ্রামের সংখ্যা বেশি নয়। তিয়েন-ৎসিন থেকে তাকু অবধি নদীতীরে মাত্র কুড়িটা পাড়া-গাঁ আছে কি না সন্দেহ। মাঝে-মাঝে আগুন ধরানো ইটের পাঁজা চোখে পড়ে—তার ধোঁয়া আর পেই-হো-এর চোঙ দিয়ে বেরোনো জোলো হাওয়া কখনো চারপাশে ঝাপসা ক'রে দেয় ধোঁয়াশায়। সন্ধেবেলায় মাঝে-মাঝে চোখে পড়ে শাদা-শাদা লম্বাটে মূর্তি। খুব সুন্দর ক'রে সাজানো এই শ্বেত প্রতিভাস সন্ধ্যালোকে যেন জ্বলজ্বল করে। আশপাশের খনির লবণের স্তূপ নাকি এগুলো। এই ফাঁকা ও বিমর্ষ জেলার মধ্য দিয়ে পেই-হো ব'য়ে যাচ্ছে—যার আশপাশে কেবল ধূ-ধূ করে 'বালি আর তৃণ, ধুলো আর ছাই'—অন্তত মঁসিয় অ বোভোআ-র বর্ণনায় তা-ই পাওয়া যাবে।

সূর্যোদয়ের আগেই তাকু পৌঁছালো ছোটো স্টিমারটি। উত্তরে-দক্ষিণে কেবল দুর্গপ্রাচীরের ভগ্নস্তূপ প'ড়ে আছে: ১৮৬০ সালের ২৪শে অগস্ট যখন জেনারেল কোলিনোর নেতৃত্বে যুদ্ধজাহাজ নিয়ে ইংরেজ আর ফরাশি বাহিনী নদীর মোহানা দিয়ে ঢুকে পড়ে, তখন প্রতিরোধ করতে গিয়ে কামানের মুখে দুর্গপ্রাচীর উড়ে গিয়েছিলো। ছোট্ট সরু একটুকরো জমি প'ড়ে আছে ফাঁকা—তার মালিক নাকি ফরাশিরা—এখনো সেখানে রাশি-রাশি স্মৃতিস্তম্ভ দেখা যাবে—সেই যুদ্ধে যাদের মৃত্যু হয়েছিলো তাদের সম্মানে এই স্মৃতিফলকগুলো প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

নদীর মুখটাতেই মস্ত এক বালির চড়া। সেইজন্য বাধ্য হ'য়ে পেইতাং তার যাত্রীদের তাকুতে নামিয়ে দিলে। ছোটো হ'লেও তাকু বেশ নামজাদা শহর

—মাকাব্রিনরা যদি রেললাইন বসাতে দেন তাহ'লে তার কদর আরো বেড়ে যাবে, উন্নতিও হবে দ্রুত ক'রে।

ছু-নিন-এর জাহাজটা সেদিনই ছেড়ে যাবে ব'লে নষ্ট করার মতো সময় ছিলো না মোটেই। জাহাজটার নাম 'স্যাম-ইয়েপ', তীরে থামকা সময় নষ্ট ক'রে কী হবে ভেবে একটা শাম্পান ভাড়া ক'রে কিন-কো তক্ষুণি 'স্যাম-ইয়েপে' গিয়ে থাকবার বন্দোবস্ত করলে।

১৭

জাহাজের নাম স্যাম-ইয়েপ

সপ্তাহ খানেক আগে একটি চিনা-ক্যালিফর্নিয়ান কম্পানির ভাড়া-করা মার্কিন জাহাজ তাকু বন্দরে নোঙর ফেলেছিলো। সান ফ্রান্সিসকোর লরেল হিল সমাধিস্থলে তিং-তং কোম্পানির হেড আপিশ, আমেরিকায় যে-সব চৈনিক মারা যায় তাদের মৃতদেহ চিনমুলুকে ফিরিয়ে আনাই ছিলো এই কম্পানির কাজ—আর ব্যাবসাটা যে-বেশ ফেঁপে উঠছিলো তার কারণ ছিলো এই যে চিনেরা শাস্ত্রের অনুশাসন মেনে স্বদেশের মাটিতেই শেষ আশ্রয় চাইতো। জাহাজটা ভাড়া করেছিলো এই তিং-তং কম্পানিই। গন্তব্যস্থল: কোয়াংতুং, ২৫০টা কফিন ছিলো জাহাজে—কিন-কোরা যে-জাহাজে আশ্রয় নিলে মার্কিন জাহাজটা থেকে ৭৫টা কফিন খালাশ ক'রে সেটায় তোলা হয়েছে—এই কফিনগুলো আরো উত্তরে প্রদেশে যাবে। সত্যি-যে, এই আবহাওয়ায় ও এই সময়ে কোনো বজরাই উত্তরে যেতে ছ-দিনের বেশি লাগে না জলপথে—আর এই মুহূর্তে সিয়াও-তং-এর উদ্দেশে অন্য-কোনো জাহাজেরও যাবার কথা নেই—এই দুই কারণেই এই জাহাজটিতে কফিনগুলো তোলা হয়েছে, না-হ'লে কখনো ঠিক এ-ধরনের জাহাজ কম্পানি বাছতো না।

'স্যাম-ইয়েপ' আসলে একটি সিন্ধুগামী জাঙ্ক—মাত্র তিনশো টন ওজন হবে সবসমেত। কোনো-কোনো হাজার-টনি জাঙ্ক মাত্র ছ-ফিট জল টানে ব'লে নদীর চড়ার উপর দিয়েও চ'লে যেতে পারে। দৈর্ঘ্যের তুলনায় প্রস্থ বেশি হয় জাঙ্কের, তলার কাঠের ফ্রেমের তুলনায় উপরের কড়ি আর নোঙরের ভাঁটি হয় এক-চতুর্থাংশ। হাওয়া না-থাকলে খুব-একটা তাড়াতাড়ি চলতে পারে না কোনো জাঙ্ক, কিন্তু লাট্টুর মতো নিজেদের কীলকের উপর ঘুরতে পারে সে—

এই একটা সুবিধে তার আছে। হালগুলি মস্ত হয়, আর ছোটো-ছোটো ছ্যাদা থাকে তাতে—চিনদেশে এই প্রথার খুব চল আছে, কিন্তু তার ফলে মাল্লাদের কোনো সুবিধে হয় কি না, সে-সম্বন্ধে মতভেদ আছে। তা যা-ই হোক না কেন, এটা বলতেই হয় যে এই জাঙ্কগুলোই সাহসে ভর ক'রে জলঝড়ের মধ্যে দিয়ে নদীর মোহানায় বা সমুদ্রের মধ্যে চলাফেরা করে—আর এ-রকম একটি তথ্যও পাওয়া গেছে যে ক্যোয়াংতুঙের একটি মার্কিন প্রতিষ্ঠান একটি জাঙ্ক ভাড়া ক'রেই সান ফ্রান্সিসকোয় চা আর চিনেমাটি পাঠিয়েছিলো—তারা যে ঝড়-দরিয়াতেও হিমশিম খায় না, এটা তারই এক নজির। তাছাড়া চিনেরা যে মাল্লা হিশেবে ভালো হয় এ-কথাও যোগ্য ব্যক্তিরা ব'লে থাকেন।

'স্যাম-ইয়েপ' আসলে আধুনিক জাঙ্ক: জাহাজের খোল আর কাঠামোটা ইওরোপীয় কেতায় তৈরি। বাঁশ জুড়ে-জুড়ে খোলটা তৈরি তার, ভিতরে যাতে জল চুঁইয়ে না-ঢোকে সেইজন্যে দুই বাঁশের মধ্যেকার ফাঁকা জায়গায় দড়ি, গলন্ত আলকাৎরা, শন, আর রজন দিয়ে আঁটা—তার ফলে ভিতরে কিছুতেই জল ঢুকতে পারে না। জল সেঁচার জন্য কোনো পাম্প নেবার দরকার নেই ব'লেই বরং মনে করা হয়। সে ভেসে থাকে যেন হালকা কর্ক, কাঠের নোঙর হ'লেও বেশ মজবুত আর টেঁকসই, জাহাজের পাল আর দড়িদড়া তালপাতার তন্তু দিয়ে তৈরি ব'লে অত্যন্ত নমনীয়, মাস্তুল আছে দুটি,—অর্থাৎ সব দিক দিয়েই ছোটোখাটো সমুদ্রযাত্রার পক্ষে 'স্যাম-ইয়েপ' খুব উপযোগী।

বাইরে থেকে দেখে এটা বোঝবার উপায় নেই যে আপাতত 'স্যাম-ইয়েপ' একটি বিপুল শবাধানে পরিণত হয়েছে। বাক্স-বাক্স চা, গাঁট-গাঁট রেশমি কাপড়, চৈনিক গন্ধদ্রব্যের প্যাকেটের বদলে এখন যে এই জাহাজ কতগুলি বিমর্ষ শবাধার বহন ক'রে নিয়ে যাচ্ছে, বাইরে থেকে দেখে তা বোঝবার উপায় নেই। অন্য সময়ে যে-রকম জমকালো সাজ থাকে, তা যে এবার ত্যাগ করা হয়েছে, তা নয়, জাহাজের গলুয়ে আর পিছনে তেমনি ঝলমলে নিশেন আর ফিতে উড়ছে হাওয়ায়, গলুয়ের গায়ে মস্ত একটা লাল চোখ আঁকা, যেন কোনো একচোখা সমুদ্রদানবের অপলক দৃষ্টি, মাস্তুলের ডগায় উড়ছে চৈনিক পতাকা, পাটাতনে দুটো কামানে রোদ প'ড়ে চকচক করছে। জাহাজকে দেখলেই মনে হয় যেন কোনো উৎসবে এক্ষুনি যোগ দিতে যাবে। যে-হতভাগ্যরা শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করবার সময় স্বদেশের পাঁচ হাত মাটিই কেবল চেয়েছিলো, তাদের মৃতদেহ বহন ক'রে নেবার মতো বিষণ্ণ ও শোকাহত দায়িত্বই কি সে পালন করছে না? কিন-ফো আর সুনের কাছে কিন্তু এই শবাধান মোটেই মনখারাপ-

করা বিষয় ব'লে মনে হ'লো না। মার্কিন গোয়েন্দা ছুটি অবশ্য অন্য-কোনো জাহাজে উঠতে পেলেই খুশি হ'তো—কিন্তু কিন-ফোর গায়ে লেপ্টে-থাকা ছাড়া তাদের আর-কোনো কাজ নেই ব'লে তারাও 'স্যাম-ইয়েপে' উঠতে বাধ্য হ'লো।

ক্যাপ্টেন, আর ছ-জন মাল্লা—জাহাজ চালাতে এই ক-জন লোকই মোটে লাগে। শোনা যায়, চিনদেশেই নাকি নাবিকদের দিগ্‌দর্শিকা আবিষ্কৃত হয়েছিলো, এ-কথা সত্যি কিনা কে জানে, তবে এটা ঠিক যে চিনে মাল্লারা কদাচ এই দিগ্‌দর্শিকা ব্যবহার করে না, আর 'স্যাম-ইয়েপে'র হর্তাকর্তা ক্যাপ্টেন ইনও কোনোকালে তাঁ'র চশিশ হারাবেন না ব'লে ওই সাধারণ নিয়মের কোনো ব্যতিক্রম ছিলেন না।

ক্যাপ্টেন ইন ছোট্ট হাসিখুশি বাচাল মানুষটি—হাসি লেগেই আছে মুখে—এক চিরন্তন আন্দোলনের জলজ্যান্ত উদাহরণ। এক মুহূর্তও সুস্থির থাকতে পারেন না তিনি, হাত-পা-চোখ সবই কেবল এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে, আর তাঁর মুখ যেমন দ্রুত চলে, তারাও তেমনি। সব সময় মাল্লাদের ধ'রে ধমকাচ্ছেন, এ-কাজে ও-কাজে পাঠাচ্ছেন অথচ আসলে কিন্তু নাবিক হিশেবে তাঁর জুড়ি সহজে পাওয়া যাবে না—সব সময় জাহাজ তাঁর নিয়ন্ত্রণে থাকে, উপকূলের প্রত্যেকটা বালি তাঁর নখদর্পণে, এখানকার জল তো তাঁর প্রিয় বন্ধু। কিন-ফো যে বিপুল অর্থ জাহাজভাড়া হিশেবে দিয়েছিলো, তা তাঁর ফুর্তিকে এক ফোঁটাও কমাতে পারেনি—ষাট ঘণ্টার কোনো যাত্রায় দেড়শো তায়েল পাওয়া—এমন ভাবে নিত্য ছপ্পর ফোঁড়ে না।

কিন-ফো আর তার দেহরক্ষীদের জায়গা হ'লো জাহাজের পিছন দিকে, আর সুন জায়গা পেলো সমুদ্রের কাছে। জাহাজের ক্যাপ্টেন আর মাল্লাদের অত্যন্ত তীক্ষ্ণ চোখে নিরীক্ষণ ক'রে ক্রেগ আর ফ্রাই এই সিদ্ধান্তে এলো যে অন্তত এদের সন্দেহ করার কোনো কারণ নেই। লাও-শেনের সঙ্গে এদের দহরম-মহরম আছে ব'লে মনে হয় না, কারণ কিন-ফো নিতান্তই দৈবাৎ এসে উঠেছে এই জাহাজে। যে-কোনো সমুদ্রযাত্রাতেই কতগুলো বিপৎপাতের সম্ভাবনা থাকে—তা ছাড়া আর-কোনো বিশেষ বিপদের সম্ভাবনা আছে ব'লে তাদের মনে হ'লো না, ফলে কড়াকড়ি খানিকটা হ্রাস করায় তারা অসংগতি কিছু দেখলে না।

আর তারা কড়াকড়ি খানিকটা কমানোতে কিন-ফো একলা হ'তে পেয়ে যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচলো। নিজের কামরায় গিয়ে সাত-পাঁচ ভাবতে লাগলো সে, তার নিজের মতে সবই অবশ্য 'দর্শন-চিন্তা'। যখন কোনো উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা

ছিলো না, যখন ছিলো ইয়ামেনের বিলাসপ্রাচুর্যে, তখন সুখ কাকে বলে জানতো না। এখন যত ঝামেলা বাড়ছে, বিঘ্ন বিপত্তিতে যত নাজেহাল হচ্ছে তত তার মন বদলে যাচ্ছে: এখন যদি একবার ওই মারাত্মক চিঠিটা হাতে পায় তাহ'লে হয়তো অবশেষে জানতে পারবে সুখ কাকে বলে। ওই নিদারুণ চিরকুটটি যে সে ফিরে পাবেই এ-বিষয়ে তার কোনো সংশয়ই নেই। প্রশ্নটা কেবল টাকার: লাও-শেনকে পঞ্চাশ হাজার ডলার দিয়ে দিলেই কিন-ফোর জীবন-মরণ লাও-শেনের কাছে অর্থহীন ঠেকবে, বরং কিন-ফোকে হত্যা করলে লাও-শেনের ঝামেলা বাড়বে বৈ কমবে না—শাংহাই যেতে হবে তাকে তাহ'লে, সেন্টেনারিয়ানের আপিসে ধন্না দিতে হবে, আর সরকার এখন তার সম্বন্ধে তেমন কৌতূহলী না-হ'লেও কোনো প্রাক্তন বিদ্রোহী'র পক্ষে তবু তাতে যথেষ্ট ঝুঁকি থেকে যাবে। সেদিক থেকে সে রেহাই পাবে যদি সে কিন-ফোকে চিরকুটটা বেচে দেয়। একমাত্র গণ্ডগোল হ'লো তাইপিংটি যদি তাকে আচমকা আক্রমণ ক'রে বসে—সে কোনো রকমে টের পাবার আগেই। লাও-শেনের গতিবিধি কিছুই তার জানা নেই, অথচ উলটো দিকে লাও-শেন হয়তো তার সব ক্রিয়া-কলাপের উপরই কড়া নজর রেখেছে—সেদিক থেকে লাও-শেনের নিজের এলাকায় পা ফেলবামাত্র তার বিপদের আশঙ্কা আরো অনেক বেড়ে যাবে। তবু কিন-ফো যথেষ্ট আশা পোষণ করলো মনে-মনে—সব বিপত্তি চুকে গেলে কী করবে না-করবে তার একটা ঝলমলে খশড়া তৈরি করলো মনে-মনে, যার মধ্যে পিকিংয়ের সেই তরুণী বিধবাটির ভূমিকা নেহাৎ নগণ্য হ'লো না।

সুন কিন্তু তখন একেবারেই অন্য কথা ভাবছিলো। নিজের কুঠুরিটায় চিৎপাত হ'য়ে শুয়ে সে পে-চি-লি উপসাগরের জলদেবতাদের কাছে তার শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করলো। চিন্তাসূত্রকে বিভ্রস্ত ক'রে যে তার প্রভু কিংবা ওয়াং কিংবা দস্যু লাও-শেনকে অভিশাপ দেবে, সে-ক্ষমতাও তখন তার ছিলো না। আই-আই-ইয়া! আহাম্মকের হদ্দ সে, নির্বোধ, মাথা-মোটা, এমনকি ধ্যানধারণাতেও উজবুক্‌খোর চূড়ান্ত! চায়ের পেয়ালা কিংবা ভাতের থালা ছাড়া আর-কিছুই ভাবার তার ক্ষমতা নেই! আই-আই-ইয়া! সমুদ্দুরে যেতে চায় এমন লোকের চাকরি নেয়ার চেয়ে আহাম্মুকি আর কী-ইবা হ'তে পারে! আস্ত বেণীটাই মানৎ করলো সে—মস্তকমুণ্ডন ক'রে শ্রমণ হ'য়ে যাবে সে, ঘুরে-ঘুরে বেড়াবে, আর চাকরিবাকরি ক'রে কাজ নেই—কেবল একবার এখন ডাঙায় পা দিতে পারলে হয়! হলদে কুত্তা—হ্যাঁ, হ্যাঁ, একটা হলদে কুত্তা এখন তার নাড়িভুঁড়ি ছিঁড়ে খাচ্ছে! আই-আই-ইয়া!

অনুকূল দক্ষিণে হাওয়ায় পূর্ব-পশ্চিমে ছড়িয়ে থাকা বালুতীর ধ'রে তিন-চার মাইল এগিয়ে গেলো 'স্যাম-ইয়েপ'। পেরিয়ে গেলো পে-তাং-এর মোহানা যার কাছে একদা ইওরোপীয় সামরিক বাহিনী অবতরণ করেছিলো; যথা সময়ে পেরিয়ে এলো ভাট নদীর মোহনায় শান্তুং, ৎচিয়াং-হো আর হাই-তে-ৎসে। উপসাগরের এদিকটা একেবারেই পরিত্যক্ত, সাই-হোর কুড়ি মাইল এ-পাশে আর জাহাজ টাহাজ খুব-একটা আসে না — কেবল কয়েকটা সদাগরি জাহাজ মাঝে-মাঝে অল্প দূরে কোথাও যাবার জন্ত পাড়ি দেয়। আর আসে গোটা বারো জেলে-ডিঙি, তাছাড়া তীরের কাছে জনমানবের সাড়া মেলে না — আর বার দরিয়ার দিকে তাকালে দেখা যায় অনন্ত দিগন্ত — কোথাও কোনো জাহাজের চিহ্নও নেই।

ক্রেগ আর ফ্রাই যখন দেখলে যে পাঁচ ছ টনি জেলেডিঙিগুলোতেও দু-একটা কামান রয়েছে, তখন কাপ্তেন ইনকে সবিস্ময়ে তার কারণ জিগেস করলে। জলদস্যুদের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্তই কামান থাকে নৌকোয়, এ-কথা শুনে ক্রেগ কি-রকম বিচলিত হ'য়ে উঠলো। 'জলদস্যু? পে-চি-লি উপসাগরে নিশ্চয়ই জলদস্যু উপদ্রব নেই?'

'কেন? পে-চি লি উপসাগরে চিনের অন্তান্ত সমুদ্রের চেয়ে বোম্বেটেদের উপদ্রব কম হবে কেন?' ধবধবে শাদা দু-পাটি দাঁত বের ক'রে হেসে উলটে জিগেস করলেন কাপ্তেন।

'আপনি দেখছি বোম্বেটেদের ভয়ে মোটেই কম্পিত নন?' বললো ফ্রাই।

'কেন? হতভাগারা যাতে কাছে ভিড়তে না-পারে সে-জন্তে দুটো কামান নেই আমার?' বললেন ইন।

'কামানগুলোয় গোলাভরা আছে তো?' ক্রেগ জানতে চাইলো।

'সাধারণত থাকে — তবে এখন অবশ্যি নেই।'

'এখন নেই কেন?' ফ্রাই জিগেস করলে।

'কারণ এখন জাহাজে কোনো গোলাবারুদ নেই,' শান্ত স্বরে বললেন কাপ্তেন।

'তাহ'লে আর ও-কামান কোন কাজে আসবে?' ক্রেগ আর ফ্রাই একযোগে বিস্ময় প্রকাশ করলো।

আবার হেসে ফেললেন কাপ্তেন। 'জাহাজে যদি আফিং কিংবা চা থাকতো, তাহ'লে না-হয় বোম্বেটেদের বাধা দেবার একটা মানে হ'তো; কিন্তু এখন যে-মাল নিয়ে যাচ্ছি, তাতে—' কথাটা সম্পূর্ণ না-ক'রেই তাচ্ছিল্যের ভঙ্গিতে

তিনি কাঁধ ঝাঁকালেন। 'আপনারা দেখছি জলদস্যুর ভয়ে থরহরি কম্পমান,' কাপ্তেন হৈন বললেন, 'অথচ আপনাদের সঙ্গে কোনো দামি জিনিশই তো দেখছি না।'

ক্রেগ আর ফ্রাই জানালে যে বোম্বেটেদের হাতে আক্রান্ত না-হ'তে চাইবার একটা বিশেষ কারণ আছে তাদের। তারপর জানতে চাইলো কী মাল যাচ্ছে না-যাচ্ছে তা বোম্বেটেরা টের পায় কী ক'রে। কাপ্তেন হৈন হাত তুলে মাস্তুলের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন: অর্ধনমিত একটি শাদা নিশেন উড়ছে মাস্তুলে। বললেন, 'এর মানে কী, তা বোম্বেটেরা জানে। ফক্কিন ভর্তি একটা জাহাজে খামকা চড়াও হ'য়ে কী লাভ?'

'কিন্তু,' ক্রেগ তবু যুক্তি উপস্থাপিত করলো। 'বোম্বেটেরা তো এটা ভাবতে পারে যে ওই শাদা নিশেনটা কেবল একটা ধাপ্পা মাত্র—হয়তো নিজের চোখে দেখে নিশ্চিন্ত হবার জন্যই আক্রমণ ক'রে বসলো—'

'তাহ'লে করুক গে আক্রমণ,' হৈন তার কথা হেসেই উড়িয়ে দিলেন, 'যেমন খালি হাতে আসবে, তেমনি খালি হাতে ফিরে যাবে।'

ক্রেগ আর ফ্রাই আর-কোনো কথা বললো বটে, কিন্তু কাপ্তেনের মতো অতটা নিশ্চিন্ত হ'তে পারলো না। একটা তিনশো টনি জাহাজে যদি কিছুই না-থাকে, তবু শুধু সেটাই বোম্বেটেদের কাছে এমন কী মন্দ ঠেকবে। কিন্তু এখন কেবল শান্ত হ'য়ে আসন্ন দুঃসময়ের জন্য অপেক্ষা করা ছাড়া কীই বা করার আছে তাদের। তেমন নিদারুণ কিছু ঘটবে না—এই আশাটাই কেবল করা যেতে পারে।

কাপ্তেন অবিশ্যি যাত্রা যাতে নির্বিঘ্ন ও শুভ হয় তার জন্য কোনো দিকে কোনো ত্রুটি রাখেননি। জাহাজ ছাড়বার আগে সমুদ্রদেবতার নামে একটা মোরোগ উৎসর্গ করেছেন, এখনো সামনের মাস্তুলটায় তার পালক ঝুলছে, মোরোগটার রক্ত ছিটিয়ে দেয়া হয়েছে জাহাজটার পাটাতনে—সেই সঙ্গে এক পেয়ালা মদ উপুড় ক'রে দেয়া হয়েছে খোলে—অর্থাৎ পুজোয় কোনো ত্রুটি রাখতে চাননি তিনি।

কিন্তু মোরোগটা যথেষ্ট হৃষ্টপুষ্ট ছিলো না ব'লেই হোক বা মদটা খুব ভালো জাতের ছিলো না ব'লেই হোক—জলের দেবতা কিন্তু পুজোয় মোটেই তুষ্ট হননি। সেই দিনই হঠাৎ আবহাওয়া স্বচ্ছ ও জ্যোতির্ময় হওয়া সত্ত্বেও হুম ক'রে এলো বিষম ঘূর্ণিহাওয়া—চিন সমুদ্রে এই ঝড় এমন আচমকা আসে যে জগতের শ্রেষ্ঠ নাবিকেরও সাধ্য নেই তা আগে থেকে আন্দাজ করে।

সন্ধ্যা আটটা নাগাদ 'স্নাম-ইয়েপ' অন্তরীপ পেরিয়ে উত্তর-পুব উপকূল ধ'রে দ্বিগুণ বেগে চ'লে যেতে চেয়েছিলো, অন্তরীপ পেরোলে হয়তো অনুকূল হাওয়া পেতো জাহাজটি — আর ক্যাপ্টেন ইনের আন্দাজ মতো চব্বিশ ঘণ্টার আগেই ফু-নিন পৌঁছে যেতে পারবে।

পৌঁছোবার সময় যতই এগিয়ে এলো, ওই চিঠিটা হাতে-পাবার জন্য কিন-ফোর অস্থিরতাও ততই বেড়ে যেতে লাগলো। আর জুন যে তীরে পৌঁছুতে চেয়ে একেবারে খেপেই গেলো। ক্রেগ আর ফ্রাই মনে মনে হিশেব ক'রে দেখলো আর তিন দিন পরেই সেন্টেনারিয়ানের এই মক্কেলের পাহারাদারির দায়িত্ব শেষ হ'য়ে যাবে। ৩০শে জুন মধ্যরাত্রে কিন-ফোর বীমার মেয়াদ উত্তীর্ণ হবে — আর কোনো কিস্তি না-দিলেই তখন সব উৎকণ্ঠার অবসান হ'য়ে যাবে।

কিন্তু যেই 'স্নাম-ইয়েপ' 'স্যাং-তু' উপসাগরের মুখে পৌঁছুলো, অমনি হঠাৎ উত্তর-পুবে দিক বদলালো হাওয়া, একটু পরেই আবার দিক পালটে উত্তর থেকে এলো হাওয়া — দু-ঘণ্টা পরেই হাওয়া এলো আবার উত্তর-পশ্চিম থেকে। ক্যাপ্টেন ইনের কাছে যদি কোনো তাপমান যন্ত্র থাকতো, তাহ'লে দেখা যেতো পারদ হঠাৎ অনেকটা নেমে গেছে আর বাতাসের এই আকস্মিক অনুভবন দেখে বোঝা যেতো যে টাইফুন আসন্ন, বায়ুমণ্ডল আলো ক'রে যার আন্দোলন এখন শুরু হ'য়ে গেছে। প্যাডিংটন আর মোরির পর্যবেক্ষণের সঙ্গে যদি তাঁর পরিচয় থাকতো, তাহ'লে তিনি তক্ষুনি জাহাজের দিক-পরিবর্তন ক'রে উত্তর পুব দিকে গিয়ে সেই ঘূর্ণি হাওয়ার হাত এড়াবার চেষ্টা করতেন। কিন্তু তাপমান যন্ত্রের ব্যবহার জানা ছিলো না — সাইক্লোনের রীতি-প্রকৃতিও তাঁর অজ্ঞাত ছিলো। একটা মোরগ তো উৎসর্গই করেছেন — সব তাণ্ডবের হাত থেকে বাঁচাবার রক্ষাকবচ নয় কি সেটা? কিন্তু যতই কুসংস্কার থাক না কেন, বিপদের মুখে তিনি যেভাবে নির্ভয়ে হাল ধ'রে দাঁড়ালেন, তাতে বোঝা গেলো তিনি কত বড়ো নাবিক — একজন ইওরোপীয় ক্যাপ্টেন বিজ্ঞানের যাবতীয় আবিষ্কারের সাহায্য নিয়ে যা করতেন, স্বজ্ঞা ও সহজাত শক্তির বলেই তিনি ঠিক তাঁর সঙ্গে পাল্লা দিলেন।

টাইফুনটা আসলে বেশি জায়গা জুড়ে শুরু হয়নি ব'লেই তার বেগ ছিলো ভয়ংকর, চরকির মতো পাক খাচ্ছে হাওয়া, আর সেই ঘূর্ণির বেগ কম ক'রে ঘণ্টায় ষাট মাইল। ভাগ্যিস, হাওয়া 'স্থাম-ইয়েপ'কে পুব দিকে তাড়িয়ে নিয়ে গেলো, না-হ'লে তীরে আছড়ে প'ড়ে জাহাজটা একেবারে চূর্ণ হ'য়ে যেতো।

এগারোটার সময় ঝড় একেবারে তুমুল আকার ধারণ করলে। কাপ্তেন ইনের মুখের হাসি তখন মিলিয়ে গেছে—কিন্তু তাই ব'লে তিনি কাণ্ডজ্ঞান ও উপস্থিত বুদ্ধি হারিয়ে বসেননি। হাল ধ'রে আশ্চর্য কৌশলে এই হালকা জলযানটিকে তিনি চালিয়ে নিতে লাগলেন—ঢেউয়ের মাথায় এক-একবার অনেক উঁচুতে ভেসে ওঠে জাহাজটা, আর সেই অবস্থাতেই তিনি যে-সব হুকুম দেন, টাল সামলাতে-সামলাতে মাল্লারা বিনাবাক্যব্যয়ে তাই পালন করে।

কিন-ফো তার কামরা থেকে বেরিয়ে দেয়াল ধ'রে দাঁড়িয়ে আকাশ আর সমুদ্রের চেহারা পর্যবেক্ষণ করছিলো। বাতাসের তোড়ে মেঘগুলো যেন ছিঁড়ে যাচ্ছে তখন, পাঁজা-পাঁজা মেঘ নেমে এসেছে পাক খেতে-খেতে—এত নিচে নেমে এসেছে যে বুঝি এক্ষুনি ঢেউ ছোঁবে। আর কালো রাতের মধ্যে শাদা ঢেউগুলো যেন কোন গোপন অনর্থের রাগে ফুলে-ফুলে উঠতে চাচ্ছে। কিন-ফোর মোটেই অবাক লাগছিলো না একটুও। দুর্ভাগ্য তার জন্য যে-সব ভয়ংকর বিপত্তি সাজিয়ে রেখেছে, এই ঝড় তো তারই একটা অংশ মাত্র। এই গ্রীষ্মকালে ষাট ঘণ্টার রাস্তা অন্য-কেউ হ'লে দিব্যি নির্বিঘ্নে পেরিয়ে যেতো—কিন্তু সেই কপাল কি আর তার হবে?

ক্রেগ আর ফ্রাই বরং অনেক বেশি অস্বস্তি ভোগ করছে তখন—নিজেদের প্রাণের মায়া তারা করে না, কিন্তু সেণ্টেনারিয়ানের স্বার্থের কথা ভেবে তাদের অস্বস্তির সীমা নেই। কেবল তিরিশে জুন মাঝরাত অবধি কোনোমতে বেঁচে থাকলেই হ'লো—তারপরে তাদের বা কিন-ফোর কী হয় না-হয় তা তারা মোটেই পরোয়া করে না।

সুন তো প্রথমেই প্রাণ হাতে ক'রে নিয়ে জাহাজটায় উঠেছিলো—কাজেই এই ঝড়ে তার কাছে অবস্থার কোনো উনিশ-বিশ ঘটেছে ব'লে বোধ হ'লো না। আবহাওয়া ভালো কি মন্দ, ঝড়তুফান কি নিস্তরঙ্গ সমুদ্র—সবই তার কাছে সমান। আই-আই ইয়া! ওই কফিনগুলোয় যারা শুয়ে আছে, তারাই দিব্যি আছে—সমুদ্রের এই চণ্ড রূপে তাদের কিছুই এসে-যাচ্ছে না, ঈশ্বরে! সেও যদি তাদের মতো কফিনে শুয়ে থাকতে পারতো! আই-আই ইয়া!

জাহাজটা কিন্তু তিন ঘণ্টা ধ'রে সত্যি বিষম অবস্থায় ছিলো। একটু যদি

বেকায়দায় বাজে খোচড় পড়ে, তাহ'লেই আর দেখতে হ'তো না—পাটাতনের উপর দিয়েই সমুদ্র ছুটে ব'য়ে যেতো। বালতির মতো ডিগবাজি খেয়ে উলটে যেতো না বটে, কিন্তু আস্ত খোলটায় জল ভর্তি হ'য়ে ডুবে যেতে পারতো। ঢেউয়ের মাথায় যেমন ভাবে বারে-বারে উৎক্ষিপ্ত হচ্ছে, তাতে তাকে যেমন কোনো নির্দিষ্ট দিকে চালানো অসম্ভব, তেমনি এটাও বোঝা দুষ্কর সত্যি কোনদিকে সে ভেসে যাচ্ছে।

ভাগ্য সুপ্রসন্ন ছিলো ব'লেই বুঝি শেষটায় বিশেষ জখম না-হ'য়েই জাহাজটা ওই ভীষণ টাইফুনের ঠিক মাঝখানটায় গিয়ে পড়লো—ষাটমাইল জোড়া এই প্রচণ্ড তাণ্ডবের মাঝখানটা কিন্তু রাগি সমুদ্রের মাঝখানে কোনো শান্ত হ্রদের মতো নিস্তরঙ্গ হ'য়ে আছে—কেন্দ্রস্থলের দু-তিন মাইল জায়গার মধ্যে ঢেউও যেমন নেই, বাতাসের প্রতাপও তেমনি ঢের কম।

কুটো গাছটির মতো জলে পাক খেতে-খেতে এখানে এই নিরাপদ জায়গায় এসে পৌঁছেছে জাহাজটি। তিনটে নাগাদ হঠাৎ যেন জাদুবলে ওই ঘূর্ণিঝড়ের তেজ ক'মে এলো, আর ওই ছোট্ট হ্রদের চারপাশের গর্জে-ওঠা জলস্তম্ভ যেন বেমালুম কোথায় মিলিয়ে গেলো। কিন্তু সকাল যখন হ'লো, তখন আশপাশে কোথাও ডাঙার কোনো চিহ্নই দেখা গেলো না। 'স্যাম-ইয়েপ' যেন কোনো বিপুল নীল মরুভূমিতে দাঁড়িয়ে আছে একা: যেমন ফাঁকা অন্তরিক্ষ, সমুদ্রও ঠিক তেমনিই।

১৮

অবাধ্যদের জাগরণ

'এ আমরা কোথায় এলাম, কাপ্তেন হন?' সব বিপদ কেটে যাবার পর কিন-ফো জিগেস করলো।

'কী ক'রে বলবো?' ততক্ষণে কাপ্তেনের মুখে আবার হাসি ফুটে উঠেছে। 'কিছুই তো বুঝতে পারছি না!'

'পে-চি-লি উপসাগরে আছি তো?'

'অসম্ভব নয়।'

'না কি হাওয়ার টানে লিআও-তুং উপসাগরেই চ'লে এসেছি?'

'তাও খুবই সম্ভব!'

'আমাদের জাহাজ কোথায় গিয়ে ঠেকবে তাহ'লে ?'

'হাওয়া যেখানে নিয়ে যাবে !'

'কখন ?'

'তা আমি আপনাকে বলি কী ক'রে ?'

কিন-ফোর মেজাজ খারাপ হ'তে আরম্ভ করলো। 'খাঁটি চিনেম্যান জানে,' সে একটি চৈনিক প্রবচন আওড়ালো, 'সে কোথায় আছে।'

'ওঃ, ও-কথা! ও-সব ডাঙাতেই খাটে, সমুদ্দুরে নয়,' আকর্ণ দন্তবিকাশ করলেন কাপ্তেন।

কিন-ফো অধীর হ'য়ে উঠলো। 'এ-কথায় এত হাসির কী আছে ?'

'কাঁদবার কিছু তো দেখছি না,' অমনি ইনের কথা শোনা গেলো।

সত্যি, হয়তো তেমন বিপজ্জনক হ'য়ে ওঠেনি অবস্থাটা, কিন্তু এটা তো অস্বীকার করবার জো নেই যে কাপ্তেন ইন নিজেই জানেন না জাহাজটা এখন বারদরিয়ার কোনখানে ভেসে আছে, দিগ্দর্শিকা ছাড়া কেমন ক'রেই বা বুঝবেন ঝড় 'স্যাম-ইয়েপ'কে কোথায় তাড়িয়ে নিয়ে এসেছে। হাওয়া তো আর একদিক থেকে বয়নি, বারে-বারেই দিক পালটেছে: গোটানো পাল আর অকেজো হাল তো আস্ত জাহাজকে ঝড়ের হাতে খেলনাজাহাজ বানিয়ে তুলেছিলো।

কিন্তু জাহাজটা ঝড়ের হাতে প'ড়ে যে-সমুদ্রেই এসে পড়ুক না কেন, তাকে পশ্চিমমুখো চালানো ছাড়া আর-কোনো উপায় নেই বোধহয়—অন্তত সে-বিষয়ে দ্বিধা করা উচিত নয়, কেননা একমাত্র সেদিকে গেলেই শেষ পর্যন্ত ডাঙার দেখা পাবার সম্ভাবনা থাকবে। আকাশে এখন আবার সূর্য উঠেছে, যদিও আলো আর তেমন প্রখর নয়, সাধ্য থাকলে কাপ্তেন হয়তো তক্ষুনি সব পাল খাটিয়ে সূর্যের পিছন-পিছন ছুটে যেতেন—কিন্তু হাওয়ার নামগন্ধও নেই কোথাও—টাইফুনের পরে প্রকৃতি যেন অবসন্ন হ'য়ে আছে—একটু নড়াচড়ার ক্ষমতাও যেন আর-কার নেই: শুধু মসৃণ জল আর ফেনার মধ্যে স্থির হ'য়ে ভেসে আছে জাহাজ, এক চুলও নড়ছে না। সমুদ্রের উপর ভারি একটা বাষ্পের আস্তরণ ঝুলে আছে যেন: আগের রাতের তাণ্ডবের একেবারে উলটো আবহাওয়া, দেখে কে ভাববে যে একটু আগেই জল আর বাতাস অমন ক্ষিপ্ত ও উৎক্ষিপ্ত হ'য়ে উঠেছিলো। সমুদ্র যখন এমনি অদ্ভুতভাবে শান্ত হ'য়ে যায়, চিনে মাঝারা তাকে 'শ্বেত শান্তি' বলে।

'কতক্ষণ থাকবে এ-অবস্থা ?' কিন-ফো জিগেস করলো।

'কে জানে !' কাপ্তেনকে একটুও উদ্বিগ্ন দেখালো না। 'এরকমকালে সাধারণত কয়েক হপ্তা ধ'রে এই শান্ত অবস্থা থাকে সমুদ্রের।'

'কয়েক সপ্তাহ!' কিন-ফো ধাঁৎকে উঠলো, 'আপনি কি ভেবেছেন আমি সপ্তাহের পর সপ্তাহ এখানে এইভাবে প'ড়ে থাকবো?'

'কী করবো বলুন? গুন টেনে নিয়ে না-গেলে তো যাবার কোনোই উপায় নেই।'

'গোল্লায় যাক জাহাজটা। কেন যে মরতে এটায় উঠেছিলুম!'

'আপনাকে ছুটো ছোট্ট পরামর্শ দিলে কিছু মনে করবেন না তো? অন্তরের মতো মেনেই নিন না অবস্থাটা।—এ-রকম গজগজ ক'রে কী লাভ—আবহাওয়া তো আর আপনি বদলাতে পারবেন না? বরং আমি যা করতে যাচ্ছি, তা-ই করুন: বিছানায় শুয়ে নাক ডাকিয়ে নিন খানিকটা।' এই দার্শনিক বচন ওয়াংকেই মানাতো, কাপ্তেন এই পরম তত্ত্বকথাটি আউড়ে নিজের কামরায় চ'লে গেলেন; ডেকের উপর কেবল দু-তিনজন মাল্লা রইলো তদারক করার জন্য।

কী করবে বুঝতে না-পেরে কিন-ফো মিনিট পনেরো পায়চারি করলো ডেকে, তারপর চারপাশে তাকিয়ে ওই পরিত্যক্ত ও নিদারুণ দৃশ্যটিকে আরেক বার ভালো ক'রে দেখে নিয়ে সে মনস্থির ক'রে ফেললো। ক্রেগ আর ফ্রাই তখন জাহাজের পিছন দিকের রেলিঙে হেলান দিয়ে চুপচাপ দাঁড়িয়েছিলো—বোধহয় কোনো বাক্যবিনিময় না-ক'রেও পরস্পরের ভাবনা তারা বুঝতে পারছিলো। কিন-ফো তাদের কিছু না-ব'লেই ডেক ছেড়ে চ'লে গেলো। কাপ্তেনের সঙ্গে এতক্ষণ কিন-ফোর কী কথাবার্তা হয়েছে, তা সবই তারা দুজনে শুনেছিলো, কিন্তু দেরি হবে শুনে কিন-ফো অত্যন্ত উত্ত্যক্ত ও অস্থির হ'য়ে উঠলেও তারা কিন্তু মোটেই চঞ্চল হয়নি। সময় যত নষ্ট হবে, কিন-ফোর জীবনও ততই নিরাপদ হবে, কারণ যতক্ষণ সে 'স্যাম-ইয়েপে' থাকবে, ততক্ষণ অন্তত লাও-শেন কর্তৃক আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা কম। তাছাড়া তাদের দায়িত্বের মেয়াদও শেষ হ'য়ে এসেছে—আর দুদিন কাটাতে পারলেই—বাস,—তারপরে যদি আস্ত একটা তাই-পিং বাহিনীও তাকে বধ করতে আসে, তাহ'লেও তাকে রক্ষা করার জন্য চুলের ডগাটি পর্যন্ত বিসর্জন দেবার কথা ওঠে না। কাণ্ডজ্ঞানওলা ইয়াঙ্কি তারা—সেন্টেনারিয়ানের এই মক্কেলের দাম যদ্দিন দু-লাখ ডলার থাকবে, তদ্দিনই কেবল তাদের দায়িত্ব—তারপরে কিন-ফো যে-চুলোতেই যাক না কেন তাতে তাদের কোনো কৌতূহল নেই।

এই অবস্থায় প্রচণ্ড খিদে নিয়ে মধ্যাহ্নভোজে বসলে তাদের বাধা দেবে কে? আর খাওয়াও চমৎকার : একই রেকাবি থেকে খেলো তারা, দুজনেই সমান-সমান রুটি আর মাংস খেলো, বিড়ুলফের স্বাস্থ্য কামনা ক'রে একই পরিমাণ মদ্য পান করলো তারা, আর শেষে সিগারেট যখন ধরালো, তখনও সিগারেটেরও সংখ্যা রইলো দুজনেরই সমান। জন্মের দিক থেকে জমজবৈশী যমজ না-হ'তে পারে, রুচি আর অভ্যেসের দিক থেকে কিন্তু তা-ই।

সারা দিন কেটে গেলো অঘটন দুর্ঘটন ছাড়াই এক ভাবে; আকাশ তেমনি 'পশমিনা' রইলো সর্বক্ষণ, সমুদ্র তেমনি মসৃণ ও নিস্তরঙ্গ—আর একঘেয়ে আবহাওয়ায় কখনোই কোনো চাঞ্চল্য দেখা গেলো না।

বিকেল চারটে নাগাদ স্নন ডেক-এ দেখা দিলে। টলছে সে; মাতালের মতো বেসামাল ও টলটলায়মান, যদিও এমন ব্রহ্মচর্য ও সংযম তার মধ্যে কখনো দেখা যায়নি। গাত্রবর্ণ নীল আর সবুজের মাঝামাঝি—হলদেটে হবার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে—হয়তো পুনর্বার ডাঙায় পা দিলে আবার আগের মতো কমলা রঙের হ'য়ে যাবে। রেগে যখন তিনটে হয়েছিলো তখন সমস্ত শরীর রক্তবর্ণ ধারণ করেছিলো—ফলে অতি অল্প সময়েই বুঝি সে ইন্দ্রধনুর সব রঙ ফোটাতে পারে শরীরে। অর্ধমুদিত তার নয়ন, রেলিঙের ওপাশে তাকাবার সাহস তার নেই, স্খলিত চরণে ক্রেগ আর ক্রাইয়ের কাছে এসে সে জিগেশ করলে, 'তাহ'লে পৌঁছে গেলুম ব'লে?'

'উঁহু,' তারা উত্তর দিলে।

'এখনো পৌঁছোবার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না?'

'উঁহু।'

'আই-আই-ইয়া,' কাৎরে উঠলো সে, মাথা ঘুরে প'ড়ে গেলো মাস্তুলের তলায়, এমনভাবে ছটফট করতে লাগলো যেন বিকারের ঘোরে আছে, আর তার ছোট্ট অর্ধছিন্ন বেণীটা কুকুরের ল্যাজের মতো ন'ড়ে-ন'ড়ে উঠলো।

সকালবেলাতেই কাপ্তেন ইন অত্যন্ত বিচক্ষণভাবে বলেছিলেন যে পাটাতনে নামবার জন্য খোলের গায়ে যে-সব ঘুলঘুল রয়েছে তা খুলে দেবার জন্য: খোলের মধ্যে টাইফুনের সময় জল ঢুকেছিলো, রোদ প'ড়ে তা শুকিয়ে যেতে পারে। ক্রেগ আর ক্রাই অনেকক্ষণ থেকে ডেক-এ পায়চারি করছিলো, মাঝে-মাঝে গিয়ে থেমে প'ড়ে নিচে উঁকি দিয়ে দেখছিলো—শেষকালে কৌতূহল যখন চরম হ'য়ে উঠলো, তারা নিচে গিয়ে সব দেখে আসবে ব'লে ঠিক করলো।

উপর থেকে যে-জায়গাটা দিয়ে আলো আসে, তা ছাড়া পুরো খোলটাই ঘুটঘুটে অন্ধকারে ঢাকা ; কিন্তু কিছুক্ষণ পরে অন্ধকার চোখে স'য়ে গেলে ওই অদ্ভুত মাল-ভরা খোলের মধ্যে পথ খুঁজে পেতে অসুবিধে হয় না।

অন্যান্য জাহাজের মধ্যে খোলগুলোর মধ্যে খুপরি করা থাকে—এটা কিন্তু সে-রকম নয়, পুরোটাই খোলা, আর পুরো খোলটা ওই অদ্ভুত মালে ভরা—মাল্লাদের শোবার জায়গা জাহাজের সামনের দিকটায়। পাশে একটার উপর আরেকটা ক'রে ছু নিন-গামী পঁচাত্তরটা কফিন সাজিয়ে-রাখা : প্রত্যেকটা কফিন ভালো ক'রে বেঁধে-রাখা আংটার সঙ্গে যাতে জাহাজের দুলুনিতে ওগুলো প'ড়ে না-যায়, আর দু-পাশের কফিনের মধ্য দিয়ে গেছে পথ—যার শেষ প্রান্ত ঘুলঘুলি থেকে অনেক দূরে ব'লে অন্ধকারে ঢেকে প'ড়ে আছে।

আস্তে পা টিপে-টিপে এগোলো ক্রেগ আর ক্রাই, যেন কোনো মস্ত সমাধি-ভবনের মধ্য দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। তাদের কৌতূহলের সঙ্গে কিঞ্চিৎ ভয় আর রোমাঞ্চ মেশানো। কফিনগুলোর মাপ নানারকম, অল্প কয়েকটিই কেবল দামি ও কারুকাজ করা, বাকিগুলো নিরাভরণ ও অতি সাধারণ। দারিদ্র্য যাদের প্রশান্ত মহাসাগরের ওপারে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে, তাদের মধ্যে অল্প কয়েক জনই কেবল ভাগ্য ফেরাতে পারে ; নেভাদা, কলোরাডো আর ক্যালিফরনিয়ার খনিতে কাজকর্ম ক'রে বড়োলোক হয় কেবল অল্প লোকেই ; প্রায় সবাই যেমন কে তেমন সেই অবিচ্ছিন্ন দারিদ্র্যেই মারা যায়, কিন্তু গরিব-বড়োলোক নির্বিশেষে সবাইকেই ব্যতিক্রমহীনভাবে সমান সযত্নে মৃত্যুর পর স্বদেশে ফেরৎ পাঠিয়ে দেয়া হয়।

এর মধ্যে গোটা দশেক কফিন দামি কাঠে তৈরি : চৈনিক কল্পনা যে কত ভাবে কোনো কফিনকে সজ্জিত করতে পারে, এ-ক-টা কফিন তারই জমকালো নজির। বাকিগুলো কেবল হলদে রং-করা চার টুকরো তক্তা জুড়ে বদখৎ ভাবে তৈরি ; প্রত্যেকটার গায়ে মৃত ব্যক্তির নাম ধাম লেখা। ক্রেগ আর ক্রাই যেতে-যেতে কফিনগুলোর নাম পড়তে লাগলো : ইয়ুন-পিং মুন্নু সিয়েন-কো, ছু-নিন-এর নান-লুন, কিন-কিয়াং শেন-কিন, কুঠি-লি কোআর লুং-আং। অত্যন্ত সুশৃঙ্খলভাবে প্রত্যেকটি মৃতদেহ ফেরৎ পাঠানো হয়, যাতে চৈনিক প্রান্তর, বিতান কি সমভূমিতে এই হতভাগ্যরা তাদের শেষ আশ্রয়টুকু খুঁজে পায়।

'খুব ভালো ক'রেই বাঁধাছাঁদা রয়েছে,' ফিশফিশ ক'রে বললো ক্রেগ। ক্রাই ফিশফিশ ক'রে পুনরাবৃত্তি করলো, 'খুব ভালো ক'রে বাঁধা—'

সান ফ্রান্সিসকো বা নিউইয়র্ক থেকে-আসা কোনো মালের গাঁট দেখে যে-ভাবে মন্তব্য করতো, তেমনি শান্ত গলায় তারা তাদের মত ব্যক্ত করলো।

শেষ প্রান্তটায় ঘুটঘুটে আঁধার, এখানে এসে তারা ফিরে তাকিয়ে দেখলো ও-পাশ থেকে সাময়িক গোরস্থানে বাপশাভাবে আলো এসে পড়ছে ডেকের দরজা দিয়ে, ফিরে যাবে ভাবছে, এমন সময় খুট ক'রে একটা শব্দ হ'তেই তারা থমকে দাঁড়ালো।

'ইঁদুর বোধহয়,' বললো তারা। তারপরে ক্রেগ প্রথমে বললো, 'কিন্তু ইঁদুররা তো চালের বস্তাই পছন্দ করবে বেশি—,' আর ক্লাই বললো, 'কিংবা রুটির গাঁটরি—'

খুটখুট আওয়াজটা কিন্তু মোটেই থামেনি। শব্দটা অনেকটা নখ বা থাবা দিয়ে কাঠের গায়ে আঁচড়ানোর মতো। আওয়াজটা উঠছে ডান দিক থেকে, ঠিক তাদের মাথার কাছেই—অর্থাৎ একেবারে উপরের কফিনগুলো থেকে।

শ্‌-শ্‌ শ্‌-শি ক'রে আওয়াজ ক'রে ইঁদুরকে তারা ভয় দেখাতে চাইলো। আঁচড়ের শব্দ কিন্তু তবু থামলো না। রুদ্ধশ্বাসে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে কান খাড়া ক'রে রইলো তারা।

আওয়াজটা যে কোনো কফিনের মধ্য থেকে আসছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

'নিশ্চয়ই ম'রে যাবার আগে কাউকে কফিনে পুরে দিয়েছে,' বললে ক্রেগ।

'কিংবা হয়তো ম'রে গিয়েছে ব'লে ভেবেছিলো—এখন আবার বেঁচে উঠেছে,' ক্লাই তার মত ব্যক্ত করলো।

কফিনটার কাছে গিয়ে তারা ডালায় হাত দিলে, ভিতরে যে কারু নড়াচড়ার শব্দ শোনা যাচ্ছে, তাতে আর কোনো সন্দেহই নেই এখন।

দুজনেই মৃদু স্বরে ব'লে উঠলো, 'কোনো অনিষ্ট ছাড়া আর কী হ'তে পারে এর মানে!'

একই সঙ্গে দুজনের মধ্যে একটি ভাবনার উদয় হয়েছে—নিশ্চয়ই কোনো নতুন বিপদের কবলে পড়বে কিন-ফো, তাদেরই জিম্মাদারিতে যে আছে, আর মৃতের পুনর্জীবনলাভ নিশ্চয়ই তারই ইঙ্গিত।

কফিনের ডালাটা আস্তে-আস্তে ভিতর থেকে খুলে যাচ্ছে দেখে তারা হাত সরিয়ে নিলো। একটুও চাঞ্চল্য প্রকাশ না-ক'রে তারা দেখতে লাগলো এর

পর কী হয়। একচুলও নড়লো না তারা। অন্ধকার অত্যন্ত গাঢ় ব'লে স্পষ্ট ক'রে কিছু দেখা যায় না, এটা ঠিক; কিন্তু তা সত্ত্বেও বাঁয়পাশের আরেকটা কফিনের ডালাকে তারা যে উত্তোলিত হ'তে দেখলো, তা মোটেই তাদের চোখের ভুল নয়। পরক্ষণেই কার গলা যেন ফিশফিশ ক'রে কথা ব'লে উঠলো—অন্য আরেকটি মৃদু স্বর তার সাড়া দিলে।

'কলো? তুমি?'

'তুমি তো, কা-কিয়েন?'

'আজ রাত্তিরেই তো হবে ব্যাপারটা?'

'হ্যাঁ, আজ রাত্তিরেই।'

'চাঁদ ওঠবার আগেই?'

'হ্যাঁ, ঠিক দ্বিতীয় প্রহরে।'

'অন্য সবাই এ-কথা জানে তো?'

'হ্যাঁ, সবাইকেই ব'লে দেয়া হয়েছে!'

'ঝামেলাটা চুকে গেলে বাঁচতুম।'

'সে তো আমরাও বাঁচতুম!'

'ছত্রিশ ঘণ্টা ধ'রে একটা কফিনে শুয়ে-থাকা মোটেই ইয়ার্কি নয়।'

'ঠিক বলেছো।'

'কিন্তু কী আর করা—লাও-শেনের হুকুম, তামিল করতেই হবে

'শ-শ-শ—চুপ! ও কিসের আওয়াজ?'

লাও-শেনের নাম শুনেই অজান্তেই আপনা থেকে ক্রেগ আর ফ্রাই ন'ড়ে উঠেছিলো—ওই শেষ অস্ফুট কথাটুকু তারই জের। কিন্তু পরক্ষণেই তারা সামলে নিলে—টুঁ শব্দটি না-ক'রে পাথরের মতো স্থির দাঁড়িয়ে রইলো।

একটুক্ষণ সবই চুপচাপ রইলো, তারপর কফিনের ডালাগুলো আবার আস্তে বন্ধ হ'য়ে যেতেই সেখানে নিরেট স্তব্ধতা নেমে এলো।

চুপি-চুপি হামাগুড়ি দিয়ে ক্রেগ আর ফ্রাই ফিরে এলো; ডেকে উঠেই কোনো কথা নয়, সোজা নিজেদের কামরায় গিয়ে ভিতর থেকে দরজা বন্ধ ক'রে দিলো তারা। এখানে কথা বললে আর কারু কানে পৌঁছুবার সম্ভাবনা নেই।

'যে-মড়া কথা বলে,' ক্রেগ বাক্যটা শুরু করলো, আর ফ্রাই ছেদ টেনে বললো, 'সে এখনো সত্যি মরেনি।'

এই ভৌতিক পরিবেশে লাও-শেনের নাম শোনবামাত্র পুরো ব্যাপারটা তাদের কাছে স্পষ্ট হ'য়ে গেছে। কাজ হাসিল করার জন্য তাই-পিং সর্দাররা

যে লোক লাগিয়েছে, আর তারা যে কাপ্তেনের অজ্ঞাতসারেই জাহাজে এসে উঠেছে—এটা বুঝতে বেশি সময় লাগে না। মার্কিন জাহাজ থেকে কফিনগুলো নামাবার পর দু-তিন দিন প'ড়ে ছিলো বন্দরে—'স্তাম-ইয়েং'-এর আগমনের অপেক্ষা করছিলো কফিনগুলো, আর সেই অবসরে কতগুলো কফিন থেকে মৃতদেহ সরিয়ে ফেলে লাও-শেনের অনুচরেরা গিয়ে লুকিয়ে থেকেছে। কিন-ফো যে 'স্তাম-ইয়েং'-এর যাত্রী হবে, এটা তারা আগে থেকেই কী ক'রে জানতে পারলো সে-একটা রহস্য বটে, কিন্তু এখন তাদের মনে পড়লো যে জাহাজঘাটায় তারা কয়েকটি সন্দেহজনক লোককে আশেপাশে ঘুরঘুর করতে দেখেছিলো। শেষকালে যদি সেন্টেনারিয়ান তাদের নিয়োগ করা সত্ত্বেও এমনভাবে দু-লাখ ডলার হারিয়ে বসে, তাহ'লে তাদের আর বদনামের সীমা থাকবে না।

কিন্তু তাই ব'লে হাল ছেড়ে দিয়ে উপস্থিত বুদ্ধি হারিয়ে ফেলার পাত্তর তারা নয়, একটা অপ্রত্যাশিত ও বিষম বিপদের মুখোমুখি পড়েছে হঠাৎ, এমনকি ভেবেচিন্তে যে একটা ভালো ফন্দি আঁটবে তারও কোনো অবসর নেই যা করতে হয় রাত দ্বিতীয় দণ্ডের আগেই—খুব-একটা আলোচনা ক'রে দেখার সুযোগও এখন নেই, আর তাছাড়া একটাই তো পথ খোলা আছে সামনে—রাত দ্বিতীয় দণ্ডের আগেই কিন-ফোকে এই জাহাজ থেকে সরিয়ে ফেলতে হবে।

কিন্তু কথাটা বলা যত সহজ সোজা, কাজে খাটানো মোটেই তা নয়। জাহাজে মাত্র একটা নৌকো আছে—জরুরি অবস্থার জন্য; সেটাও আবার এমনি ভারি আর বিতিকিচ্ছি যে জাহাজসুদ্ধু সব মাল্লা লেগে যাবে সেটাকে জলে নামাতে গেলে। তাছাড়া কাপ্তেন নিজেই যদি এই চক্রান্তের সাহায্যকারী হ'য়ে থাকেন তো মাল্লারা যে মোটেই সাহায্য করবে না তা তো বলাই বাহুল্য। কাজেই নৌকো ক'রে পালাবার কথাই ওঠে না।

সাতটা বেজে গেলো। কাপ্তেন এখনও তাঁর কামরা থেকে বেরোননি। এখনও তো হ'তে পারে যে তিনি স্বচক্ষে এই ভীষণ কর্মটি দেখতে চান না—নিরিবিলি নিজের কামরায় ব'সে অপেক্ষা করছেন কখন নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হ'য়ে যায় আর সব ল্যাঠা চুকে যায়। জাহাজটা বাতাসে আর ঢেউয়ে তাড়িত হ'য়ে ভেসে বেড়াচ্ছে, কোথাও কোনো পাহারার ব্যবস্থা নেই: কেনই বা থাকবে? শুধু গলুইয়ের কাছে রেলিঙে হেলান দিয়ে ব'সে-ব'সে একটি মাল্লা ঢুলছে। যদি কোনো ডিঙি বা সাম্পান থাকতো, তাহ'লে এর চেয়ে ভালো পালাবার সুযোগ পাওয়া যেতো না। জাহাজে আগুন লেগে গেলেও বুঝি

তারা পালাবার জন্ত এত ব্যস্ত ও উত্তেজিত হ'তো না। হঠাৎ হুম ক'রে একটা ভাবনা খেলে গেলো মাথায়; আলোচনা ক'রে সময় নষ্ট করার আর অবসর নেই; এক্ষুনি, এই মুহূর্তেই, কাজে খাটাতে হবে এটা।

কিন-কোর কামরার দরজা খুলে ভিতরে ঢুকে আস্তে-আস্তে গিয়ে ধাক্কা দিলো তাকে। কিন-ফো তখন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। আবার তাকে ধাক্কা দিলো তারা।

ধড়মড় ক'রে উঠে বললো সে, 'আপনারা আবার কী চান?'

যত কম কথায় পারে পুরো ব্যাপারটা তারা খুলে বললো, কিন-ফো কিন্তু সব শুনে মোটেই ভীত হ'লো না, একটু ভেবে সে বললে, 'গুণ্ডাগুলোকে জলে ছুঁড়ে ফেললেই হয়—'

'তার কোনো প্রশ্নই ওঠে না,' তক্ষুনি তারা ব'লে উঠলো।

'তাহ'লে আমরা কি কিছুই করবো না,' জিগেশ করলো কিন-ফো।

'যা বলি তা-ই করুন,' ক্রেগ বললো, 'আমরা ফন্দি এঁটে ফেলেছি।'

'শুনি কী ফন্দি,' কিন-ফো যেন কিঞ্চিৎ বিস্মিত হ'লো।

'টুঁ-শব্দটি না ক'রে এই পোশাকটি নিয়ে প'রে ফেলুন—চটপট তৈরি হ'য়ে নিন—কোনো প্রশ্ন করবেন না!'

হাতে একটা মোড়কে জড়ানো পুলিন্দা ছিলো—সেটা খুললো তারা। কাপ্তেন বোয়াতঁ-কর্তৃক সত্ত আবিষ্কৃত চার প্রস্থ সাঁতারের পোশাক রয়েছে ভিতরে। কিন-ফোকে এক প্রস্থ দিয়ে বললে, 'দুটি আমাদের দুজনের ও আর একটা সুনের'

'যান, গিয়ে সুনকে নিয়ে আসুন,' কিন-ফো বললে।

সুন এমন ভঙ্গিতে এলো যেন সে হঠাৎ চলৎশক্তি হারিয়ে পঙ্গু হ'য়ে পড়েছে।

কিন-ফো বললো, 'এটা প'রে নে—'

কিন্তু সুনের তখন নিজে থেকে ও-পোশাক পরার কোনো ক্ষমতাই নেই। সে কেবল 'আই-আই-ইয়া' ব'লে কাৎরাতে লাগলো। আর অন্যরা তাকে ধরাধরি ক'রে ওই জলনিরোধী-পোশাকে ঢুকিয়ে দিলে।

ততক্ষণে আটটা বেজে গেছে, সবাই তারা প্রস্তুত, চারটে মস্ত নীল মাছ যেন তারা, এক্ষুনি বরফ-জমা জলে ঝাঁপিয়ে পড়বে যেন,—অবশ্যি সুনকে এমন টিলেঢালা ও অলবড়ো দেখাচ্ছিলো যে নীল মাছের মতো অমন নমনীয় জীবের সঙ্গে তার কোনো তুলনাই হয় না।

আকটি তখন নিবাত-নিকম্প সমুদ্রে স্থির ভেসে আছে, কেন আর ক্রাই কামরার একটা ঘুলঘুলি খুলে আস্তে ধাক্কা দিয়ে কোনো গড়িমিশি না-ক'রে প্রথমে ডুনকে সমুদ্রে ফেলে দিলে। কিন-কোও সাবধানে নেমে পড়লো, কেন আর ক্রাই নামলো সব শেষে—ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে চারপাশে তাকিয়ে নিশ্চিত দেখে নিলো সব নলটল জোড়াতাড়া ঠিক আছে কি না।

এত সাবধানে ও নিঃশব্দে তারা জলে নেমে পড়লো যে 'স্নাম-ইয়েং' থেকে যে চারজন যাত্রী কেটে পড়েছে, এটা কেউ জানতেই পেলো না।

১১

অকূল পাথারে

ক্যাপ্টেন বোয়াতোঁর পোশাকটা নানা গাছের আঠা জমিয়ে তৈরি: পাটাক জামা, ঢিলে পাত্রবাস, আর টুপি—এই তিন প্রস্থে পোশাকটা সম্পূর্ণ। নিরন্ধ এই পোশাকে জল ঢোকে না বটে, কিন্তু ঠাণ্ডার কাছে তা মোটেই অভেদ্য হ'তো না—যদি-না দুটো আলাদা স্তরে খানিকটা হাওয়া জমিয়ে রাখার ব্যবস্থা থাকতো। এই বাতাসই আসলে এটাকে জলের উপর ভাসিয়ে রাখে আর ঠাণ্ডার হাত থেকে বাঁচায়—না-হ'লে অনেকক্ষণ খোলা জলে প'ড়ে থাকলে ঠাণ্ডা লাগতো।

পোশাকের ভিন্ন-ভিন্ন অংশ এমনভাবে জোড়া দেয়া হয়েছে, যাতে জল-নিরোধ করতে পারে। গোড়ালির তলায় পাজামা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে পায়ের চেটোর নিচে ভারি সোল রয়েছে জুতোর মতো, কোমর পর্যন্ত উঠে এসেছে এই পাজামা, ধাতুর কোমরবন্ধ দিয়ে আটকানো থাকে—আর পোশাকটা এত ঢিলে যে হাত-পা নাড়তে কোনো অসুবিধে হয় না। ছোট্ট বুক-ঢাকা জামাটা ওই কোমরবন্ধের সঙ্গেই আটকানো থাকে, গলাবন্ধটি নিরেট, আর শিরস্ত্রাণটি আটকানো থাকে তারই সঙ্গে—আঁটোভাবে কপাল গাল আর চিবুকের উপর স্থিতিস্থাপক দিয়ে আঁটা থাকে টুপিটা—শুধু চোখ, মুখ, আর নাকই খোলা থাকে।

জামার সঙ্গে গোটা কয়েক ওই গাছের আঠার নল লাগানো থাকে—যাতে ভিতরে হাওয়া খেলতে পারে, হাওয়ার ঘনতা এমনভাবে নিয়ন্ত্রিত করা যায় যে কেউ ইচ্ছে করলে গলা বা কোমর ডুবিয়ে খাড়া ভেসে থাকতে পারে—কিংবা

কখনো চিৎ হ'য়ে শুয়ে থাকতে পারে জলের উপরে — কখনোই আশঙ্কার কিছু থাকবে না — সব সময় ইচ্ছে মতো হাত-পাও নাড়তে পারবে।

এই জামা-কাপড়ের ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তা ইতিমধ্যেই এমনভাবে প্রমাণিত হয়েছে যে আবিষ্কর্তা আমাদের কাছে যথেষ্ট সাধুবাদ দাবি করতে পারেন। পোশাকটাকে সম্পূর্ণ ক'রে-তোলার জন্য সেই সঙ্গে আরো কতগুলো জিনিশ থাকে : কাঁধে ঝোলানো থাকে একটি জলনিরোধ থলি, দরকারি জিনিশপত্তর রাখা যায় যাতে ; আর থাকে ছোট্ট একটা লাঠি - পায়ের চেটোর নিচে তাকি সোলের গায়ে একটা একটা ছোট্ট খাপে সেটা বসাবার ব্যবস্থা আছে - একটা ছোট্ট পাল তুলে দেয়া যায় ইচ্ছে করলে ওই লাঠির গায়ে টাঙিয়ে, আর আছে হালকা একটা বৈঠা — দরকার-মতো সেটাকেই হাল হিশেবে ব্যবহার করা যায়, অন্য সময়ে দাঁড়ের কাজই করা যায় ওটা দিয়ে।

এই সব সরঞ্জাম নিয়ে প্রস্তুত হ'য়ে কিন-ফো, ক্রেগ, ফ্রাই আর সুন অকূল পাথারে ভেসে পড়লো : দাঁড় টেনে কিছুক্ষণের মধ্যেই জাহাজটি থেকে অনেক দূরে চ'লে এলো তারা। ঘুটঘুটি কালো রাত : কাপ্তেন ইন বা তাঁর কোনো স্যাঙাৎ যদি তখন ডেকে উপস্থিত থাকতো, তাহ'লে তারা কিছুতেই পলাতকদের দেখতেই পেতো না : তারা যে পালাচ্ছে, সেই অন্ধকারে এটা কেউ ভুলেও সন্দেহ করতে পারতো না।

ছদ্মবেশী লবটি যে-দ্বিতীয় প্রহরের কথা বলেছিলো, তা আসলে মধ্যরাতেই শুরু হবে, সুতরাং কিন-ফোদের হাতে কয়েক ঘণ্টা অতিরিক্ত সময় আছে, যার ফলে 'স্যাম-ইয়েপ' থেকে বেশ কিছু মাইল দূরে চ'লে যাবার সুযোগ পাবে তারা। তখন অত্যন্ত মৃদু হাওয়া বইছে, জল ছলছল ক'রে উঠছে, কিন্তু তবু দূরে যেতে হ'লে এই দাঁড় টানা ছাড়া আর কিছুর উপরই নির্ভর করার উপায় নেই।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই কিন-ফো, ক্রেগ আর ফ্রাই এই অদ্ভুত পোশাকে অভ্যস্ত হ'য়ে গেলো : এত চটপট তারা নৈপুণ্য অর্জন ক'রে ফেললো যে মুহূর্তে ইচ্ছেমতো যে-কোনো ভঙ্গিতে যে-কোনো দিকে যেতে তাদের কোনো অসুবিধে হ'লো না। সুনকে অবিশ্যি গোড়ার দিকে টেনে নিয়ে যেতে হ'লো, কিন্তু সেও শিগগিরই তার হৃত শক্তি ফিরে পেলো : জাহাজে যখন ছিলো তার চেয়েও অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করছে সে জলের মধ্যে। সমুদ্রপীড়ার কষ্ট আর মাথা-ঘুরুনি তার আর নেই : জাহাজের মধ্যে ছিটকে প'ড়ে গড়াগড়ি খাওয়া কিংবা ঠোকাঠুকি হওয়ার চেয়ে সমুদ্রে দিব্যি বুক পর্যন্ত ডুবিয়ে ভেসে থাকতে পেরে তার স্বস্তি আর আহ্লাদের সীমা ছিলো না।

কিন্তু সমুদ্রপীড়া আর না-থাকলে কী হবে, ভয়ে তার হাত-পা তবু ভিতরে সেঁধিয়ে যাচ্ছিলো। হাঙরেরা গিলে খাবে, ছিঁড়বে তাকে টুকরো-টুকরো ক'রে—এই ভয় এমনভাবে তার বুকের মধ্যে হানা দিচ্ছিলো যে বারে-বারে সে পা দুটি টেনে দেখছিলো হাঙরগুলো ছিঁড়ে খেয়ে গেলো কি না। এটা অবশ্যই বলতে হয় যে তার এই আতঙ্ক মোটেই ভিত্তিহীন ছিলো না।

কিন-ফোকে নিয়ে যেন লোফালুফি খেলছে তার অদৃষ্ট। এই আশ্চর্য ভাগ্যের জন্যেই একেবারে চিৎ হ'য়ে শুয়ে দাঁড় টেনে-টেনে এগোচ্ছে তারা—যখনই ক্লান্ত লাগে, বিশ্রামের জন্য শখের মতো উঠে দাঁড়ায়, না-হ'লে চিৎ-সাঁতারই দেয় সর্বক্ষণ। জাহাজ ছেড়ে আসার পর এক ঘণ্টা কেটে গেছে, আর তারা এসেছে আধ মাইল দূরে। বিশ্রাম নেবার জন্য বৈঠার গায়ে হেলান দিয়ে সোজা হ'য়ে দাঁড়ালো তারা, ফিশফিশ ক'রে কী কর্তব্য তা-ই নিয়ে আলোচনা করতে লাগলো।

'পাজির পাঝাড়া ওই কাপ্তেনটা!' অনেকক্ষণ ধ'রে মন্তব্যটা করতে চাচ্ছিলো ক্রেগ, এবার প্রথম সুযোগেই ব'লে ফেললো।

'লাও-শেনটাই বা কী কম পাজি, শুনি?' ফ্রাই যোগ ক'রে দিলো।

'আপনারা এতে অবাক হয়েছেন নাকি?' কিন-ফো বললে, 'আমি আর এখন কিছুতেই অবাক হই না।'

'একটা কথা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না,' ক্রেগ বললো, 'ওই হতভাগাগুলো কী ক'রে আগেভাগেই জানতে পেরেছিলো যে আপনি ওই জাহাজে গিয়েই উঠবেন?'

কিন-ফো শান্তগলায় বললে, 'তা, ওদের হাত থেকে যখন বেঁচে গেলাম, তখন আর এ-কথা জেনেই বা কী হবে!'

'বেঁচে গেলেন?' ক্রেগ যেন স্তম্ভিত: '"স্যাম-ইয়েপ" যতক্ষণ কাছাকাছি থাকবে, ততক্ষণ আমরা মোটেই নিরাপদ নই।'

'কী করবো তাহ'লে বলুন,' কিন-ফো জানতে চাইলো।

'কিঞ্চিৎ জলযোগ ক'রে নবোদ্যমে আবাদের রওনা হ'তে হবে আবার, যাতে সকাল হবার আগেই "স্যাম-ইয়েপে"র দৃষ্টিসীমার বাইরে চ'লে যেতে পারি।'

ফ্রাই তার পোশাকে আরো-কিছু হাওয়া ঢুকিয়ে দিয়ে আরো ভেসে উঠতে লাগলো, শেষটায় যখন কোমর পর্যন্ত ভেসে উঠলো তখন কাঁধের জলনিরোধী থলিটা খুলে তার ভিতর থেকে একটা গেলাশ আর বোতল বার ক'রে আনলো।

ব্যান্ডি দিয়ে ক'রে কিন-কোর হাত তুলে দিলে সে গেলাশটা, আর কিন-কোকে বিশেষ অনুরোধ-উপরোধ করার আগেই গেলাশটা সে গলায় একেবারে উপুড় ক'রে দিলো। ক্রেগ আর ফ্রাই নিজেরাও ব্যান্ডি খেলে—সুনের কথাও ঘোটেই ভুললো না।

গেলাশটা শূন্য ক'রে ফেলতেই সুনকে জিগেশ করলো ক্রেগ, 'এখন কেমন লাগছে ?'

'ধন্যবাদ—আগের চেয়ে অনেক ভালো,' বললে সুন, 'কিন্তু কিঞ্চিৎ নিরেট খাবার পেলে ভালো হ'তো।'

'আলো ফুটলেই আমরা ছোটো চাজরি সেরে নেবো—তখন তোমাকে চা-ও দেয়া হবে।'

সুন মুখ বেঁকালো। 'ঠাণ্ডা চা ?

'না, না, গরম—' বললে ক্রেগ।

এবার সুনের চোখমুখ ঝলমল ক'রে উঠলো। 'কিন্তু সে আপনি পাবেন কোত্থেকে ?' সে জানতে চাইলো।

'কেন, আগুন জেলে গরম ক'রে নেবো।'

'তাহ'লে আর সকাল অবধি অপেক্ষা করার কী দরকার ?' সুন যুক্তি উত্থাপন করলো।

'ওরে আহাম্মক, আমাদের আলো কাপ্তেন হিন আর তাঁর স্যাঙাৎদের চোখে পড়ুক, এটাই তুমি চাও না কি !'

'না, না—'

'তাহ'লে বরং ধৈর্য ধ'রে উপযুক্ত সময়ের জন্য অপেক্ষা করো।'

এই কথোপকথন চলাকালীন কিন-কোর দলের অবস্থা অত্যন্ত হাস্যকর দেখাচ্ছিলো, ঢেউয়ে তারা একরাশি কর্কের মতো উঠছে নামছে—কিংবা বলা যায় পিয়ানো বাজাবার সময় রিডগুলো যেমন ওঠে-নামে, তাদের দশাও তখন ছিলো তেমনি।

এবার কিন-কো বললো, 'একটু-একটু হাওয়া আসছে বোধহয়।'

'তাহ'লে পাল টাঙিয়ে দিই বরং এবার—' ব'লে উঠলো ক্রেগ আর ফ্রাই।

কিন্তু তারা যেই তাদের ছোটো মাস্তলগুলো খাড়া করার চেষ্টা করছে, সুন হঠাৎ বিষম আতঙ্কে প্রচণ্ড আর্তনাদ ক'রে উঠলো।

'চুপ কর, আহাম্মক !' তীব্র রাগে ফিশফিশ ক'রে উঠলো কিন-কো, 'তুই কি চাস আমরা ওদের হাতে ধরা পড়ি ?'

'মনে হ'লো—' তোৎলালো স্থন, 'মনে হ'লো যেন একটা রাক্ষস—একটা ভীষণ হাঙর—দেখলাম কাছে। আমার গায়ে তার গা ঠেকে গেলো পর্যন্ত!'

তন্নতন্ন ক'রে দেখলো ক্রেগ আশপাশে, তারপর জানালো নিশ্চয়ই স্থন ভুল ক'রেছে, হাঙরের ল্যাজের ডগাটি পর্যন্ত নেই কোথাও।

কিন-ফো তার প্রিয় ভৃত্যটির কাঁধে হাত রাখলো। 'শোন, স্থন, ভিতুর মতো চ্যাচামি না অমন—যদি তোর ট্যাংছুটোও ছিঁড়ে খায়, তবু চীৎকার করবি না, বুঝলি?'

'ফের যদি চ্যাচাবে তো,' ক্রাই যোগ করলো, 'তোমার জামা ছুরি দিয়ে টুকরো ক'রে দিয়ে তোমায় সাগরের তলায় পাঠিয়ে দেয়া হবে: সেখানে তুমি যত ইচ্ছে চেঁচিয়ো, কেউ বারণ করবে না।

এ-রকম ধাতানি খেয়ে বেচারা স্থন বিন্দুমাত্র সান্ত্বনা না-পেলেও আর টুঁ শব্দটি করতে সাহস করলো না। মনে হ'লো তার দুঃখকষ্ট বুঝি আর কোনোদিনও শেষ হবে না: এ-রকমভাবে আতঙ্কে বুক ঢিপঢিপ ক'রে মরার চেয়ে সমুদ্রপীড়ার কষ্ট আর এমন কী মন্দ ছিলো!

কিন-ফো ভুল বলেনি—সত্যি হাওয়া আসছিলো তখন। অনেক সময় মৃদু হাওয়া দেয় মাঝরাতে, সকালবেলাতেই আবার চ'লে যায়: এটা যদি সে-রকম কোনো হাওয়াও হয়, তবু 'স্যাম-ইয়েপে'র সঙ্গে তাদের ব্যবধান বাড়িয়ে তোলবার জন্য একে পূর্ণ মাত্রায় কাজে খাটিয়ে নিতে হবে। লাও-শেনের শাগরেদরা যখন আবিষ্কার করবে যে কিন-ফো আর তার কামরায় নেই, তখন তারা যে তার সন্ধানে চারপাশ তোলপাড় ক'রে ফেলবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই, যদি তাদের একজনকেও তারা দেখতে পায়, তাহ'লে জাহাজের ছোট ভারি শাম্পানটা মুহূর্তে তাদের বন্দিত্ব আরো সহজসাধ্য ক'রে তুলবে। সেই জন্যেই সকাল হবার আগে যতদূরে যেতে পারবে, ততই তাদের মঙ্গল।

ভাগ্যিস হাওয়া বইছিলো পুব দিক থেকে। ওই টাইফুন তাদের কোথায় নিয়ে এসেছে, কে জানে? এটা কি লি আও-তুং উপসাগর, না কি পে-চি-লি উপসাগর—না কি ভয়ংকর পীত সমুদ্র? কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। তবে হাওয়া যদি তাদের তাড়িয়ে পশ্চিমে উপকূলের দিকে নিয়ে যায়, তাহ'লে পাই-হো নদীর মুখে কোনো সদাগরি জাহাজ হয়তো তাদের দেখতে পেয়ে তুলে নেবে—কিংবা তীরের কাছে যে-সব জেলেডিঙি দিনরাত শশব্যস্ত ঘুরে বেড়াচ্ছে, তারাও হয়তো উদ্ধার করতে পারে তাদের। কিন্তু হাওয়া যদি পশ্চিম থেকে আসতো, আর 'স্যাম-ইয়েপ' যদি সেই হাওয়ায় কোরিয়ার দক্ষিণে এসে পড়তো,

তাহ'লে তিন জনের উদ্ধারের কোনো আশাই থাকতো না। তাহ'লে হয়তো কালক্রমে বার-দরিয়ায় ভেসে চ'লে যেতো, কিংবা শেষটায় জাপানের উপকূলে গিয়ে ঠেকতো তাদের মৃতদেহ—পবনের এই পোশাকের জন্য ম'রে-যাবার পরেও ডুবতো না, ভেসে প'চে চ'লে যেতো ওই সূর্যোদয়ের দেশে।

এখন রাত দশটা, তবে বোধহয়। চাঁদ উঠবে মাঝরাতের একটু আগে: নষ্ট করবার মতো এক মুহূর্তও সময় নেই। ক্রেগ আর ক্রাই যেমনভাবে ব'লে দিলো, তেমনিভাবে পাল তুলে দেবার সব ব্যবস্থা করা হ'লো। ব্যবস্থাটা অবশ্যি খুবই সহজ: প্রত্যেকটা পোশাকের ডান পায়ের তলায় একটা ক'রে খাপ-মতো গর্ত রয়েছে, ওই ছোটো লাঠিটা হাতে ওখানে ঢুকিয়ে মাস্তুলের মতো তুলে দেয়া যায়। প্রথমে তারা চিৎ হ'য়ে শুয়ে হাঁটু মুড়ে ডান পাটা হাতের নাগালে এনে ওই মাস্তুলটা আন্দাজমতো বসালো। তার আগেই অবশ্য ছোটো পালটা তারা মাস্তুলে টাঙিয়ে দিয়েছিলো। ক্রাই আর ক্রেগের সংকেতে তারা একসঙ্গে দড়ি টেনে তেকোণা পালটার উপর দিক একেবারে মাস্তুলের ডগায় নিয়ে গেলো, তারপর দড়িটা আঁটো ক'রে ওই ধাতব কোমরবন্ধে বেঁধে নিলো, আর পালের তলার দিকের দড়িটা হাতে শক্ত ক'রে ধ'রে থেকে ছোটো একটা নৌবহরের মতো ভেসে চললো।

দশ মিনিটের মধ্যেই তারা স্বচ্ছন্দে ও নিরাপদে ভেসে-যাওয়ার কৌশল আয়ত্ত ক'রে ফেললো। একে অন্যের মধ্যে সমান ব্যবধান রেখে তারা সহজেই ভেসে চ'লে গেলো. গাংচিলেরা যেমন ক'রে হাওয়ায় ডানা ছড়িয়ে আলগোছে ভেসে যায়, তেমনিভাবেই এগিয়ে গেলো তারা। কোনো ঢেউ ছিলো না ব'লে তাদের এগিয়ে যেতে আরো সুবিধে হ'লো: জল ছলকে উঠে বা ঢেউ উঠে-নেমে তাদের চলায় কোনো ব্যাঘাত সৃষ্টি করলো না।

জন অবিশ্যি দু-তিনবার ক্রেগ আর ক্রাইয়ের নির্দেশ ভুলে গিয়ে বোকার মতো ঘাড় ফিরিয়ে দেখতে গিয়েছিলো পিছনে, আর তার ফলে কয়েক ঢোঁক লবণ জল গিলেছিলো। অভিজ্ঞতা থেকেই, অবিশ্যি, পরে সে অনেকটা শিখে ফেললো। তবু ওই হাঙরের ভয় সে কিছুতেই কাটিয়ে উঠতে পারছিলো না। তাকে অবিশ্যি ব্যাখ্যা ক'রে বোঝানো হ'লো যে চিৎ হ'য়ে শুয়ে থাকলে বিপদের সম্ভাবনা অনেক কম থাকে, কারণ হাঙরের হাঁ এমনভাবে তৈরি যে শিকারের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ার আগে তাকে চিৎ না-হ'লে চলে না, সেই জন্যই কোনো ভাসমান বস্তুকে কামড়ে ধরা তার পক্ষে কঠিন, তাকে আরো বলা হ'লো যে-সব আমিষখোর জীবই সাধারণত সচল কোনো-কিছুর চেয়ে নিজের

বা নিষ্প্রাণ দেহই বেশি পছন্দ করে। সুন তো শুনেই ঠিক ক'রে ফেললো যে আর কখনো সে স্থির হ'য়ে প'ড়ে থাকবে না। আর এই সংকল্প করার সঙ্গে-সঙ্গেই আগের চেয়ে অনেক ভালো বোধ করলো সে।

প্রায় ঘণ্টা খানেক ধ'রে ভেসে চললো এই অদ্ভুত বহর। এর চেয়ে কম সময়ে জাহাজের পাল্লা পেরিয়ে যাওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব ছিলো না—আবার এর চেয়ে বেশি দূর গেলে হয়তো একেবারে অবসন্ন হ'য়ে পড়তো। এর মধ্যেই তো ওই পালের দড়ি টেনে ধ'রে থাকার জন্য হাতদুটো টনটন করতে শুরু ক'রে দিয়েছে।

থামার সংকেত করলো ক্রেগ আর ফ্রাই। তক্ষুনি পালগুলো ঢিলে ক'রে গুটিয়ে ফেলা হ'লো, তার সবাই—কেবল সুন ছাড়া অ'বাস্তু—খাড়া হ'য়ে সাবধানি অবস্থায় ফিরে এলো আবার।

'বিশ্রামের সময় পাঁচ মিনিট,' ক্রেগ বললো কিন-ফোকে।

'আরেক গেলাশ ব্র্যাণ্ডি পাবেন এবার,' জানালো ফ্রাই।

দুটো প্রস্তাবেই কিন-ফো সাগ্রহে সম্মতি জানালো। উত্তেজক কোনো-কিছু এখন সত্যি ভীষণ দরকারি। জাহাজ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ার কিছু আগেই সাণ্ড্যুইচ চুকিয়ে ফেলেছিলো ব'লে আপাতত সকাল পর্যন্ত কোনো খাদ্য না-পেলেও চলবে। ঠাণ্ডাও লাগছে না মোটেই: জল আর তাদের দেহ—এই দুয়ের মধ্যে বাতাসের একটা আস্তর রয়েছে ব'লে ঠাণ্ডা লাগছেই না, জলে ঝাঁপিয়ে পড়ার পর থেকে গাত্রতাপ এখনো এক ফোঁটাও কমেনি।

'স্যাম ইয়েপ কে দেখা যাচ্ছে নাকি এখনো?' ফ্রাই তার থলি থেকে একটি দূরবিন বার ক'রে পুব দিকে দিগন্তের দিকে তাকালো কিন্তু আকাশের ঝাপসা বাতাবরণে জাহাজটির কোনো চিহ্নই দেখা যাচ্ছে না। একটু কুয়াশা পড়েছিলো সে রাতে আকাশে তেমন বিশেষ তারা নেই, অনেক দূরে মিটমিট ক'রে জ্বলছে কয়েকটি। ক্ষীণ পাণ্ডুর চাঁদ অবিশ্যি উঠে আসবে একটু পরে—হয়তো তখন কুয়াশা স'রে যাবে।

'পাজিগুলো নিশ্চয়ই এখনো ভোঁস-ভোঁস ক'রে নাক ডাকাচ্ছে,' বললে ফ্রাই।

'বাতাসের সুবিধে নিলো না তো ওরা,' ক্রেগ বললো।

কিন-ফো দড়ি টেনে পালটাকে টানটান ক'রে মেলে দিলে, আর দেরি না-ক'রে এক্ষুনি আবার রওনা হওয়া উচিত, অন্যরাও তাকে অনুসরণ করলে তক্ষুনি—হাওয়া এখন আগের চেয়েও অনেক ক'মে গেছে।

তারা যাচ্ছিলো পশ্চিমমুখো, তাই পুব দিকে যখন চাঁদ উঠবে তখন হাওয়া দেখতে পাবে না। তবে জ্যোৎস্নায় অবশ্য বিপরীত দিকও উজ্জ্বল উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠবে : আর পশ্চিম দিগন্তটাই ভালো ক'রে দেখা দরকার তাদের। সমুদ্র আর আকাশের মিলনরেখার কোনো স্পষ্ট গোল দাগের বদলে যদি ভাঙা-ভাঙা আলোছায়া আঁকাবাঁকা দাগ দেখা যায়, তবেই বুঝতে পারে যে ডাঙা দেখা যাচ্ছে। আর উপকূল যেদিকে যেহেতু খোলা ও খাড়িহীন, সেইজন্য অনায়াসে ও নির্বিঘ্নেই তারা তীরে গিয়ে উঠতে পারবে।

বারোটা নাগাদ মাথার উপরে ভিজে ও স্যাঁৎসেঁতে জলীয় বাষ্পের উপর ক্ষীণ আলো ছড়িয়ে পড়লো একটু : সমুদ্রের তলা থেকে প্রায়-বর্তুল এক চাঁদ উঠে আসছে, এটা তারই ইঙ্গিত। কিন-ফো বা তার সঙ্গীরা কেউই ঘাড় ফিরিয়ে পিছনে তাকাবার চেষ্টা করলো না। এদিকে আবার হাওয়াও এলো নবোদ্যমে, আর যেমন এই কুয়াশার আবরণকে ছিঁড়ে উড়িয়ে নিয়ে গেলো, তেমনি তাদের পালেও ধাক্কা দিলো সজোরে – আর তার ফলে ফেনিল রেখা এঁকে তারা বেশ জোরেই এগিয়ে চললো। আবহাওয়া ক্রমেই স্বচ্ছ হ'য়ে আসছে, তারাগুলো আরো স্পষ্টভাবে ঝিকমিক করছে আকাশে আর তামাটে-লাল চাঁদটি আস্তে আস্তে উজ্জ্বল রুপোলি হ'য়ে উঠে চারপাশ আলো ক'রে দিলো।

আর তক্ষুনি ক্রেগ তীব্র স্বরে একটি শিস্ দিয়ে ব'লে উঠলো। চেঁচিয়ে বললো, "ওই যে, জাহাজ—

'পাল খাটিয়ে এগোচ্ছে হুড়মুড় ক'রে,' ফ্রাই অস্ফুট স্বরে ব'লে উঠলো।

তক্ষুনি পাল চারটে নামিয়ে নিলো তারা, মাস্তুলগুলো খুলে ফেলা হ'লো পায়ের তলার খোপ থেকে। সোজা হ'য়ে তারা পিছনে তাকিয়ে দেখলো সত্যি, চাঁদের আলোয় দেখা গেলো জাহাজটি কোনো মস্ত প্রেতের মতো সবগুলো পালের বাহু বাড়িয়ে দিয়ে মাইলখানেক এগিয়ে এসেছে।

কাপ্তেন হল যে অবশেষে কিন-ফোর পলায়নের সংবাদ শুনে ফেলেছেন, তাতে সন্দেহ নেই। আর তক্ষুনি বেরিয়ে পড়েছেন তাদের সন্ধানে। পলাতকেরা যদি এবার আলো পড়া জলতল থেকে চোখে না-পড়ার কোনো উপায় বের করতে না পারে, তাহ'লে মিনিট পনেরোর মধ্যেই কাপ্তেন ও তাঁর স্যাঙাৎদের হাতে ধরা প'ড়ে যাবে।

'মাথা নামিয়ে নিন!' ক্রেগ ব'লে উঠলো।

তার নির্দেশের মর্মার্থ অনুধাবন করতে কোনো অসুবিধে হ'লো না। পোশাকের ভিতর থেকে আরো-কিছু হাওয়া বার ক'রে দেয়া হ'লো, জলের

আরো তলায় চ'লে গেলো চারজন—কেবল মুখটা ভেসে রইলো জলের উপর। নিঃশব্দে কোনো নড়াচড়া না-ক'রে তারা রুদ্ধশ্বাসে অপেক্ষা করতে লাগলো।

'স্যাম-ইয়েপ' তখন দ্রুত এগিয়ে আসছে—সবচেয়ে উঁচু আর বড়ো পালটা কালো ছায়া ফেলেছে সমুদ্রে। পাঁচ মিনিটের মধ্যেই জাঙটি তাদের আধ-মাইলের মধ্যে চ'লে এলো। মাল্লাদের ছোটাছুটি স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তখন, কাপ্তেন ইন দাঁড়িয়ে আছেন সারেঙের খুপরিতে, হাল ধ'রে। হঠাৎ এমন সময় ভীষণ শোরগোল উঠলো জাঙে, একদল লোক ছুটে এলো ডেকের উপর, মাল্লাদের আক্রমণ ক'রে। ভয়ানক চ্যাচামেচি উঠলো 'স্যাম-ইয়েপে': রক্ত-জল-করা ক্রুদ্ধ ও রুষ্ট গর্জন, মার-মার কাট-কাট আওয়াজ, আর তারই সঙ্গে মেশা যন্ত্রণা আর হতাশা-মেশানো আর্তনাদ। তার পরেই হঠাৎ সব স্তব্ধ হ'য়ে গেলো একসময়, সব হৈ-চৈ থেমে গেলো মুহূর্তে, শুধু ঝপাং-ঝপাং আওয়াজ হ'তে থাকলো জাঙের পাশে—বোঝা গেলো ডেক থেকে মৃতদেহ ছুঁড়ে ফেলা হচ্ছে জলে।

তাহ'লে কাপ্তেন ইন আর তার মাল্লারা লাও-শেনের স্যাঙাৎ নন? বেচারা! ওই বোম্বেটেগুলো কফিনের মধ্যে জাহাজে উঠেছিলো কেবল জাঙটা একসময় দখল ক'রে নেবার জন্যে। যাত্রীদের মধ্যে যে কিন-ফো-ও আছে, তা দস্যুগুলো মোটেই জানতো না। কিন্তু যদি এখন জাঙে তাকে তারা দেখতে পেতো তাহ'লে এ-বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে দস্যুগুলো তাদের এক ফোঁটাও দয়া করতো না।

'স্যাম-ইয়েপ' কিন্তু এগিয়েই এলো। চট ক'রে প্রায় তাদের উপর এসে পড়লো, ভাগ্য নেহাৎই সদয় ছিলো ব'লে পালের ছায়া পড়লো তাদের উপর। তবু তারা চট ক'রে ডুব দিলো জলের তলায়। আবার যখন মাথা তুললো জাঙটি তখন পাশ কাটিয়ে চ'লে গেছে—আর তাদের কোনো ভয় নেই এখন।

জাঙটির দিকে তাকিয়েছিলো ব'লে প্রথমে ভেসে-আসা মৃতদেহটা তাদের চোখে পড়েনি, হঠাৎ চোখে পড়তেই জাগে কাপ্তেন ইনের মৃতদেহ—বুকে একটা ছোরা বেঁধা। তাঁর ঢিলে পোশাকের অসংখ্য ভাঁজই তাঁকে এতক্ষণ ভাসিয়ে রেখেছে। শেষকালে যখন পোশাকটা সম্পূর্ণ ভিজে গেলো, তিনি ডুবে গেলেন চিরদিনের মতো—আর কোনো দিনই ভেসে উঠবেন না এই সলিলশয্যা থেকে। সেই সৌম্য সদাহাস্যময় মানুষটি নেহাৎই দুর্ভাগ্যবশত চিন সমুদ্রের নৃশংস ও দুর্ধর্ষ বোম্বেটেদের হাতে নিহত হ'য়ে গেলেন।

দশ মিনিট পরেই জাঙটি পশ্চিম দিগন্তে মিলিয়ে গেলো—আর সেই ধূ-ধূ জলের মধ্যে বিপুল সমুদ্রে ভেসে চললো তারা চারজন: কিন-ফো, ক্রেগ, ফ্রাই আর অবশ্যই সুন।

২০

সাগরের দেকছে

তিন ঘণ্টার আগেই সকাল হ'য়ে এলো, আর ভালো ক'রে আলো ফোটবার আগেই জাহাজটি পুরোপুরি অদৃশ্য হ'য়ে গেলো দিগন্তে। যদিও তারাও সেই দিকেই যাচ্ছিলো, তবু আগেই ন-দশ মাইল এগিয়ে গিয়েছিলো ব'লে 'স্যাম-ইয়েপে'র সঙ্গে পাল্লা দিয়ে চলা তাদের পক্ষে সম্ভব হ'লো না।

সুতরাং সেই দিক থেকে বিপদ আসার সম্ভাবনা আপাতত অন্তত নেই; তাই ব'লে অবস্থাটা মোটেই কিন্তু সন্তোষজনক নয়। যতদূরে চোখ যায় ডাঙার কোনো চিহ্নও চোখে পড়ে না, কোথায় যে আছে—পে-চি-লি উপসাগরে, না পীত সমুদ্রে—তাও এখনো ঠিক ক'রে বুঝে উঠতে পারেনি তারা।

অবশ্য জাহাজটা যে-দিকে গেছে, সেই দিকে গেলেই যে এক সময় না এক সময় ডাঙা পাওয়া যাবে তাতে অন্তত সন্দেহ নেই, অল্প-অল্প হাওয়ায় কেঁপে উঠছে এখন সমুদ্র, কাজেই ওই পশ্চিম দিকেই পাল টাঙিয়ে এগোতে থাকা ভালো।

দশ ঘণ্টা ধ'রে কোনো খাদ্য পড়েনি পেটে, এবার এই তীব্র ক্ষুধার কিঞ্চিৎ উপশম ক'রে নেয়াও উচিত।

'প্রাতরাশটা ভালোই হবে আমাদের,' ক্রেগ আর ফ্রাই জানালো।

ছোটোহাজরির প্রস্তাবে সানন্দে সম্মতি দিলে কিন-ফো। সুন তো আহ্লাদে জিভ দিয়ে ঠোঁট দুটো একটু চেটেই নিলে' ছোটোহাজরির কথায় এবার কিংকণের জন্যে হাঙরের খাদ্য হবার ভয়টা তার চ'লে গেলো।

আবার সেই জলরোধক থলিটার প্রয়োজন পড়লো। ফ্রাই তার ব্যাগ থেকে খানিকটা রুটি আর কিঞ্চিৎ শুকনো মাংস বের ক'রে আনলো: খাদ্য-তালিকা অবিশ্যি কোনো নামজাদা চিনে রেস্তোরাঁর মতো বিপুল ও বিচিত্র নয়, তবু পরমানন্দে তা-ই তারা গলাধঃকরণ করলে।

ওই থলির মধ্যে আরো-একদিনের উপযোগী খাবার ছিলো ছিলো: ক্রেগ আর ফ্রাইয়ের ধারণা তার মধ্যেই তারা তীরে পৌঁছে যাবে। কিন-ফো অবিশ্যি তাদের এই অতি-আশার কারণটি জানতে চাইলো; উত্তরে তারা

বললে যে আবার কপাল ফিরে যাচ্ছে ব'লেই নাকি তাদের মনে হচ্ছে : ওই ভয়ংকর জাহের হাত থেকে তারা অনায়াসে রেহাই পেয়েছে। আর কিন-ফো প্রহরায় নিযুক্ত হবার সম্মান লাভ করার পর থেকে এ-রকম নিরাপদ অবস্থায় নাকি কোনো দিনই তারা ছিলো না। 'জগতের সব তাই-পিংও যদি একযোগে চেষ্টা ক'রে, তাহ'লেও তারা এখানে আপনাকে খুঁজে পাবে না,' বললো ক্রেগ। 'আর আপনি যে দু-লাখ ডলারের সমান, এ-কথাটা মনে রাখলে বলতে হয় আপনি বেশ ভালোই ভেসে যাচ্ছেন জলে,' যোগ করলো ফ্রাই।

কিন-ফো হেসে ফেললো। 'আমি যে ভেসে যেতে পারছি, সে তো আপনাদেরই সৌজন্যে। আপনারা না-থাকলে কাপ্তেন ইনের মতোই দুর্দশা হ'তো আমার।'

মস্ত এক টুকরো রুটি গিলতে-গিলতে সুন বললে, 'আমার অবস্থাও কি তার চেয়ে খুব কিছু ভালো হ'তো?'

'কিন্তু আপনাদের এত কষ্ট বৃথা যাবে না,' কিন-ফো বললে, 'আপনাদের কাছে আমার যে কত ঋণ তা আমি কিছুতেই ভুলবো না।'

'আমাদের কাছে আপনার কোনো ঋণই নেই,' বললে ক্রেগ, 'আমরা সেন্টেনারিয়ানের ভৃত্য মাত্র।'

'আর আমাদের একমাত্র আশা এই যে,' ফ্রাই যোগ ক'রে দিলে, 'সেন্টেনারিয়ান যাতে কোনোকালে আপনার কাছে ঋণী না-থাকে।'

কিন্তু স্বার্থ বা উদ্দেশ্য যা-ই থাক না কেন কিন-ফো তাদের জলন্ত প্রবল অনুগত্য দেখে মুগ্ধ না-হ'য়ে পারলো না। 'এ-বিষয়ে আমরা বরং পরে আলোচনা করবো,' সে বললে, 'লাও-শেনের কাছ থেকে একবার চিঠিটা ফেরৎ পেয়ে নিই—'

ক্রেগ আর ফ্রাই কেবল মুচকি হেসে নিজেদের মধ্যে চোখ চাওয়াচায়ি ক'রে নিলে, কোনো কথা বললো না।

ঠাট্টা ক'রে সুনকে চা নিয়ে আসতে বললে কিন-ফো। 'এই-যে, দিচ্ছি,' সুন তার প্রভুর রসিকতার উত্তরে কিছু ব'লে-ওঠবার আগেই বললে ফ্রাই।

আবার তার থলি খুলে সে ছোট্ট একটা যন্ত্র বার ক'রে আনলো—বোয়া-ভোঁর পোশাকের অচ্ছেদ্য অংশ ব'লে যন্ত্রটা গণ্য হ'তে পারে—যুগপৎ বাতি আর ছোট্ট স্টোভের কাজ চলে এটা দিয়ে। একটা কর্কের গায়ে বসানো উপরে-নিচে ছিপি লাগানো পাঁচ-ছ ইঞ্চি লম্বা একটা ফাঁপা নলচে—অনেকটা হামাম-জলোর যে ভাসন্ত তাপমান যন্ত্র দেখা যায়, তার মতো দেখতে। জলের উপর

সেটা রেখে, ক্রাই দু-হাতে দুটো ছিপি ঘুরিয়ে দিতেই নলচেটার ভিতর থেকে নীল রঙের অগ্নিশিখা বেরিয়ে এলো—বেশ বড়ো শিখাটা, মন্দ তাপ ছড়ায় না। 'এই রইলো আপনার উনুন,' বললে ক্রাই।

হুন তার চোখ দুটোকে বিশ্বাস করতে পারছিলো না। বলতে দিয়ে ভালো ক'রে দেখে ব'লে উঠলো, 'আরে! আপনি দেখছি জলেই আগুন জ্বালিয়ে দিলেন!'

'হ্যা, জল আর ক্যালশিয়াম কসফায়েট (প্রস্ফুরক খড়ি) মিশিয়েই এই আগুন বানিয়েছে ও,' বললে ক্রেগ।

যন্ত্রটা আসলে এমনভাবে তৈরি হয়েছে যাতে প্রস্ফুরক খড়ির অনন্ত বৈশিষ্ট্যটি কাজে লাগানো যায়: জলের সংস্পর্শে এলেই প্রস্ফুরক খড়ি প্রস্ফুরক উদ্‌যানের জন্ম দেয় আর এই গ্যাস স্বতঃস্ফূর্তভাবে জ্ব'লে ওঠে: জলে বা বাতাসে এই জলন্ত গ্যাস কিছুতেই নেভে না। সেইজন্যই আজকাল উন্নত মানের সব জীবন-তরীতেই আলো জ্বালাবার জন্য এই গ্যাস ব্যবহার করা হয়—জল ছোঁবার সঙ্গে-সঙ্গেই দীপ্ত অগ্নিশিখা জ্ব'লে ওঠে জীবন-তরীতে—আর তার ফলে কোনো মিশকালো রাতেও কেউ জাহাজ থেকে জলে প'ড়ে গেলেও তক্ষুনি সেই শিখা দেখে তার উদ্ধারের ব্যবস্থা করা যায়।

সেই জলন্ত উদ্‌যানের উপর ক্রেগ পানীয় জলে-ভরা একটা ছোটো সসপ্যান ধ'রে রইলো: এই সবও ওই থলি থেকেই পাওয়া। জল ফুটে উঠতেই চায়ের কেৎলিতে ঢেলে দিলে সে, আগেই অবশ্য কিছু চা-পাতা সেখানে ছেড়ে দেয়া হয়েছিলো। সবাই এবার চা-পাতা ভিজোনো জল পান করলে: এমনকি কিন-ফো আর হুনও, চিনে কায়দায় প্রস্তুত না-হওয়া সত্ত্বেও, এই চায়ে কোনো দোষ খুঁজে পেলে না। বরং এই চা যেন তাদের ছোটো হাজরিকে একেবারে সম্পূর্ণ ও পূর্ণাঙ্গ ক'রে দিলে। এখন কোথায় আছে তারা, সেটাই কেবল জানতে হবে এবার। অদূর ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই এই বোয়াটো-পোশাকে একটি ক'রে সেক্সটান্ট ও ক্রনোমিটার থাকবে: তখন হয়তো জাহাজডুবির পরে তারা কোথায় আছে নাবিকদের এটা বুঝতে কোনো অসুবিধেই হবে না।

ছোটো হাজরির পর দলটা আবার পাল তুলে দিয়ে এগিয়ে চললো। হাওয়া আর বন্ধ হ'লো না, কয়েক ঘণ্টা ধ'রে ক্রমাগত ব'য়ে চললো, হাল ধ'রে দিক-নিয়ন্ত্রণ করার কোনো চেষ্টাই করতে হ'লো না তাদের—বাতাসই তাদের পশ্চিম দিকে নিয়ে চললো। এই ভাবে চিৎ হ'য়ে শুয়ে ভেসে-ভেসে যাচ্ছে ব'লে বজ্জ ঘুম পাচ্ছিলো তাদের: কিন্তু এ-অবস্থায় ঘুমের কথা চিন্তা করাও

উচিত নয়—ঘুম-ঘুমভাবটা কাটিয়ে ওঠবার জন্ত ক্রেগ আর ক্রাই শৌখিন গাঁজাখুরদের মতো চুরুট ধরিয়ে টানতে লাগলো।

বেশ কয়েকবার নানা রকম জলজন্তুর লম্ফঝম্ফ ঘুনকে একেবারে জরে আধমরা ক'রে রেখে গেলো, তাদের বেশির ভাগই অবশ্ত নিরীহ শুশুক, পিঠ বাঁকিয়ে জলের উপর ধনুকের ছিলার মতো উঠেই আবার ঝুউশ ক'রে ডুবে গেলো তারা—বোধহয় তাঁদের দেশে এই অদ্ভুত আগন্তুকদের দেখে কিঞ্চিৎ ভীত আর বিস্মিতই হ'লো তারা। শুশুকরা কখনো একা থাকে না, ঝাঁক বেঁধে তারের মতো ছুটে আসে তারা, আর তাদের মস্ত চিক্কণ-মসৃণ দেহ জলের তলায় পোকরাজের মতো চকচক ক'রে ওঠে, কখনো-বা জলের উপর পাঁচ-ছ ফিট লাফিয়ে উঠছে তারা, শূন্যেই ডিগবাজি খাচ্ছে সার্কাসের জীবের মতো—আর তাতেই তাদের পেশির নমনীয়তা স্পষ্ট হ'য়ে চোখে পড়ছে। প্রচণ্ড তাদের বেগ, দ্রুতগতিসম্পন্ন কোনো জাহাজের চেয়েও অনেক বেশি—দেখে কিন-কে। মনে-মনে ভাবলে এই লম্ফঝম্ফ ঝাঁকুনি ও ডিগবাজি সত্ত্বেও এরা যদি তাকে গুন টেনে নিয়ে যেতো, তাহ'লে বেশ ভালোই হ'তো।

দুপুরবেলার দিকে হাওয়া যেন দম-দম করলো খানিকক্ষণ, তারপর একেবারেই বন্ধ হ'য়ে গেলো। ছোটো পালগুলি ঝুলে লেপ্টে গেলো মাস্তুলের গায়ে, পালে কোনো টানটানভাব রইলো না, পিছনে রইলো না কোনো ফেনিল শাদা রেখা।

'ভারি মুশকিল হ'লো তো', বললে ক্রেগ।

'হ্যাঁ, মস্ত ঝামেলায় পড়া গেলো,' সায় দিলে ক্রাই।

শেষটায় তারা একেবারে নিশ্চল হ'য়ে গেলো। নামানো হ'লো মাস্তুল গোটানো হ'লো পাল, আর তারা সবাই এবার খাড়া হ'য়ে দাঁড়িয়ে দিগন্তের দিকে তাকালো।

এখনো দিগন্তরেখা একেবারেই ফাঁকা। না দেখা গেলো কোনো উড্ডীন পাল, না বা ধোঁয়ার রেখা। প্রখর সূর্য জ্বলছে মাথার উপরে, হাওয়া থেকে সব আর্দ্রতা শুষে নিয়েছে সে—শাংলা ও ভস্মীভূত হ'য়ে গেছে হাওয়া: জমাট আঠার তরল আস্তরণ না-থাকলেও এই জলে তাদের মোটেই ঠাণ্ডা লাগতো না।

পর-পর যা ঘ'টে গেছে সম্প্রতি, তাতে ক্রেগ আর ক্রাই মনে-মনে বেশ উৎফুল্ল হ'য়েই উঠেছিলো, কিন্তু এবার খানিকটা অস্বস্তি বোধ না-ক'রে পারলো না। গত বোলো ঘণ্টায় তারা কতদূর এসেছে, তা তারা কিছুই জানে না: কোথাও কোনো ডাঙা বা চলন্ত জাহাজের চিহ্নও কেন দেখা যাচ্ছে না, এই

ব্যাপারটা কেমন যেন রহস্যময় ও ব্যাখ্যাতীত হ'য়ে উঠছে। তবু তারা—অর্থাৎ কিন-কো এত সহজে হাল ছেড়ে দেবার পাত্র নয়। আরেকটি দিন চালিয়ে দেবার মতো খাদ্য আছে সঙ্গে। আবহাওয়াও বেশ ভালোই—হঠাৎ ঝড় ওঠবার কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। তারা ঠিক করলে দাঁড় বেয়েই এবার এগোবে। যাত্রার সংকেত করা হ'লো—কখনো চিৎ সাঁতার দিয়ে কখনো বুক সাঁতার দিয়ে ওই দাঁড়ের সাহায্যে তারা পশ্চিমদিকে এগিয়ে চললো।

জোরে কিন্তু এগোতেই পারলো না। প্রথমত কায়িক শ্রমের অভ্যেস নেই তাদের, দ্বিতীয়ত ওভাবে বৈঠা চালানোও খুব ক্লান্তিকর। সুন বেচারার তো নাকালের অবধি রইলো না। সে এতই পিছিয়ে পড়লো যে সে যাতে তাদের ধ'রে ফেলতে পারে অন্যদের বারে-বারে থেমে গিয়ে তার জন্য অপেক্ষা করতে হ'লো। কিন-কো তাকে ধমকালে, গালি-গালাজ দিলে, এমনকি ভয়ও দেখালো—কিন্তু সবাই বৃথা হ'লো। ওই টুপির তলায় তার বেশী নিরাপদ, এটা সুন জানে, কিন্তু তবু পাছে যদি তাকে ফেলেই চ'লে যায় এই ভয়ে সে খুব-একটা পিছিয়ে পড়তেও অবশ্য সাহস করলো না কক্ষনো।

দুটো নাগাদ কয়েকটা গাংচিল দেখতে পেলো তারা। এটা ঠিক যে মাঝে মাঝে গাংচিলেরা সমুদ্রের উপর অনেক দূর উড়ে চ'লে আসে, তবু তাদের দেখে খানিকটা ভরসা পেলো তারা। ডাঙা হয়তো কাছেই আছে, গাংচিলের আগমন হয়তো তারই পূর্বাভাস।

ঘণ্টাখানেক পরে তারা একরাশ সিন্ধু-শৈবালের জালে জড়িয়ে পড়লো। অনেক চেষ্টাচরিত্র ক'রে তবে তার হাত থেকে উদ্ধার পেলে তারা। মাছ জালে পড়লে যেমন ছটফট ক'রে চারদিকে চেষ্টা ক'রে দ্যাখে কোনো দিক দিয়ে বেরোনো যায় কি না, তাদের অবস্থাও অনেকটা সেই রকমই হ'লো। শেষটায় মুক্তি পাবার জন্য ছুরি ব্যবহার করতে হ'লো তাদের। আর এই অভাবিত গোলযোগে আধঘণ্টা সময় নষ্ট হ'লো তাদের, আর মাঝখান থেকে খামকা আরো ক্লান্ত হ'য়ে পড়লো।

চারটের সময় অবসাদে নির্জীব হ'য়ে তাদের আরেকবার থামতে হ'লো। হঠাৎ হাওয়া এলো আবার সজোরে, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত বাতাস এবার এলো দক্ষিণ দিক থেকে। যেহেতু পালকে নিয়ন্ত্রণ করার কোনো উপায় নেই, সেই জন্য তারা পাল খাটাতেই সাহস পেলে না। কে জানে, শেষকালে উত্তরমুখো যেতে-যেতে পশ্চিমদিকে যতটুকু এগিয়েছে তাও হয়তো জলাঞ্জলি হ'বে।

থেমে রইলো তারা অনেকক্ষণ। অবশ্য হাত-পাকে বিশ্রাম দেয়া ছাড়াও

কিঞ্চিৎ খাদ্যগ্রহণ করলে তারা, কিন্তু প্রাতরাশের মতো তেমন উৎফুল্ল হ'লো না এই খাদ্যাভোজ। গতিক বিশেষ সুবিধের নয় এখন. রাত্রি আসন্ন দক্ষিণা পবনের বেগও বর্ধমান : এই অবস্থায় ঠিক যে কী করা উচিত, তা কেউ বুঝে উঠতে পারলো না।

কিন-ফো বিরস বদনে তার বৈঠায় হেলান দিয়ে জেগে রইলো : মুখ বোজা, ভ্রূ কুঞ্চিত, বিপদের আশঙ্কার চেয়েও বিমূঢ় ভাবটাই তাতে বেশি। সুন ক্যাচক্যাচ ক'রে নাকি সুরে জগৎসংসারের বিরুদ্ধে নালিশ জানিয়ে চললো—হাঁচির দমক শুরু হ'লো তার—যেন ইনফ্লুয়েনজা হয়েছে। ক্রেগ আর ফ্রাই বুঝতে পারছিলো যে এই ঝুলি থেকে আশু কর্তব্য নির্ধারণ ক'রে একটা-কিছু বার ক'রে ফেলা উচিত—কিন্তু এ-অবস্থায় কী করবে তা-ই বুঝতে পারছিলো না।

এমন সময়ে দৈবাৎ তাদের সব বিমূঢ়তার অবসান হ'য়ে গেলো। পাঁচটা নাগাদ দক্ষিণ দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ ক'রে তারা দুজনেই একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠলো : 'পাল দেখা যাচ্ছে! পাল!'

তাদের ভুল হয়নি। সত্যি, প্রায় মাইল তিনেক দূরে থেকে একটা পাল-তোলা জাহাজ তাদেরই দিকে এগিয়ে আসছে—যদি হঠাৎ গতিপথ না-বদলায় তাহ'লে একেবারে তাদের গা ঘেঁসেই যাবে জাহাজটা। আর এক মুহূর্তও নষ্ট করা চলবে না, এক্ষুনি তার দিকে ধাবমান হ'তে হবে। কিছুতেই মুক্তির উপায় ফশকে ফেলা চলবে না। তক্ষুনি দাঁড় বেয়ে-বেয়ে তারা রওনা হ'য়ে পড়লো : আর নতুন হাওয়ায় ক্রমশ কাছে এগিয়ে আসতে লাগলো ওই জাহাজ। আসলে জাহাজ নয়, মস্ত বড়ো একটা জেলে ডিঙি, কিন্তু তা থেকে একটা জিনিশ স্পষ্ট বোঝা যায় যে ডাঙা আর খুব দূরে নয়, কারণ চৈনিক মৎস্যজীবীরা কদাচিৎ দূর সমুদ্রে মাছ ধরতে আসে।

অন্যদের তাড়াতাড়ি আসতে ব'লে কিন-ফো সর্বশক্তি দিয়ে বৈঠা চালাতে লাগলো, ছোটো নৌকোর মতো দ্রুত ছিটকে যেতে লাগলো যেন সে, সুনও—সবাই যাতে তাকে ফেলে রেখেই না চ'লে যায় এই ভয়ে—এত জোরে তার দাঁড় ব্যবহার করলো যে বেগে প্রভুকে বুঝি ছাড়িয়েই গেলো সে।

আর আধমাইল গেলেই জেলে-নৌকোর কাছে গিয়ে পৌঁছোবে তারা : এখনো যদি জেলেদের কেউ তাদের লক্ষ ক'রে না-থাকে, তখন তাদের হাঁক-ডাক কানে যাবে নিশ্চয়ই। একটা ভয় অবশ্য আছে : জলের মধ্যে এমন কিম্ভুত দর্শন চারমূর্তিকে দেখে তারা না আবার ভয় পেয়ে অন্য দিকে নৌকো ছুটিয়ে

বের! কিন্তু চেষ্টা তো তাদের করতেই হবে—হাল ছেড়ে দিলে তো চলবে না।

প্রায় যখন কাছে এসে পড়েছে, তখন হুন—সে-ই উৎসাহে ও ভয়ে সকলের আগে ছিলো তখন—বিষম আতঙ্কে চেঁচিয়ে উঠলো : 'হাঙর! হাঙর!'

এবার আর এটা কোনো মিথ্যে আশঙ্কা নয়। দশ-বারো হাত দূরেই হাঙরের পাখনা দেখা গেলো : যে সে হাঙর নয়, নেকড়ে হাঙর বলে একে; 'চীন সমুদ্রের এই হিংস্র জীবটির নাম যে মোটেই বেমানান নয় তা সমুদ্রের এই ভীষণ নেকড়েটিকে দেখেই বোঝা গেলো।

'ছুরি বার করো, ছুরি বার করো,' চেঁচিয়ে উঠলো ক্রেগ আর ফ্রাই।

তৎক্ষণাৎ সবাই ছুরি বার ক'রে নিলে, কিন্তু হুন বিচক্ষণতাকেই সাহসের অঙ্গ নাম ভেবে চটপট পিছিয়ে এসে সকলের পিছনে চ'লে গেছে। হাঙরটা তখন দ্রুত এগিয়ে আসছে তাদের দিকে, এক মুহূর্তের জন্য তার সম্পূর্ণ দেহটা জলের উপর ভেসে উঠলো সবুজ ফুটফুটওলা, সেই বিকট দেহটা মুহূর্তের জন্য পুরো দেখতে পেলে তারা। অন্তত বোলো ফুট হবে সে লম্বায়—সে যে জলের ভীষণ রাক্ষস, তাতে আর কারু কোনো সন্দেহ রইলো না।

ধনুকের ছিলার মতো পিঠটা বাঁকিয়ে কিন-ফোর দিকে ছিটকে আসার উদ্যোগ করলে হাঙরটা, কিন-ফো কিন্তু মাথা গরম করলে না মোটেই, অত্যন্ত শান্তভাবে দাঁড়টার ভর দিয়ে যেন লাফিয়ে তার সামনে থেকে চ'লে গেলো। ইতিমধ্যে ক্রেগ আর ফ্রাইও কাছে এসে পড়েছে : আত্মরক্ষা বা আক্রমণ—দুয়েরই জন্য তৈরি তারা তখন।

হাঙরটা ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো ততক্ষণে, কিন্তু আবার সে শিকারের উপর লাফিয়ে পড়ার জন্য তৈরি হ'য়ে নিলো। তার বিকট ও প্রকাণ্ড মুখে নিষ্ঠুর দাঁতগুলো হিংস্র ক্ষুধায় চকচক ক'রে উঠেছে। কিন-ফো আবারও তার দাঁড়ে ভর দিয়ে লাফাবার চেষ্টা করতে গেলো, কিন্তু হাঙরের চোয়ালে গিয়ে পড়লো দাঁড়টা, আর মটাৎ ক'রে দু-টুকরো হ'য়ে ভেঙে গেলো। আবার পিঠ বাঁকিয়ে হাঙরটা তার শিকারের দিকে ছুটে আসবে, এমন সময় জল রক্তরাঙা হ'য়ে উঠলো। ক্রেগ আর ফ্রাই তাদের তীক্ষ্ণ ও মস্ত মার্কিন ছুরি দিয়ে এই ভীষণ জন্তুর শক্ত চামড়া ভেদ করতে পেরেছে অবশেষে। তার বিকট মুখটা হাঁ হ'লো একবার, তারপর দাঁতের পাটির উপর দাঁতের পাটি এসে পড়লো প্রচণ্ড জোরে। প্রচণ্ড যন্ত্রণায় ছটফট করছে হাঙরটা, ল্যাজ ঝাপটাচ্ছে প্রবল ভাবে, আর তারই এক ঝাপটায় ফ্রাই প্রায় দশ ফুট দূরে ছিটকে পড়লো। ক্রেগ

ব্যথায় আর্তনাদ ক'রে উঠলো, যেন ওই প্রচণ্ড ল্যাজের ঝাপট তারই গায়ে পড়েছে; ক্রাই কিন্তু মোটেই জখম হয়নি: জমাট আঠার পোশাক তাকে আহত হওয়া থেকে বাঁচিয়েছে: দ্বিগুণ উৎসাহে সে আবার ছুরি হাতে এগিয়ে এলো আক্রমণ করতে।

হাঙরটা তখন যন্ত্রণায় বারে-বারে পাক খাচ্ছে। কিন-ফো তার ভাঙা দাঁড়টা হাঙরের চোখে চেপে ধরার চেষ্টা করলো: এত কাছে ছিলো যে আরেকটু হ'লে ছিন্নভিন্ন হ'য়ে যেতো সে, কিন্তু তবু প্রাণপণে দাঁড়টা সে তার চোখে বিঁধিয়ে দিয়ে চেপে রইলো, আর ক্রেগ আর ক্রাই তার বুকে ছুরি বসিয়ে দেবার চেষ্টা করলো আপ্রাণ। অবশেষে তাদের চেষ্টা সফল হ'লো বোধহয়, কারণ একবার প্রচণ্ডভাবে ছটফট ক'রেই হাঙরটা ওই রাঙা জলে ডুবে গেলো।

'হুরে! হুরে!' বিজয়োল্লাসে ছুরি নাচাতে-নাচাতে চেঁচিয়ে উঠলো ক্রেগ আর ক্রাই।

'ধন্যবাদ!' রুদ্ধশ্বাস কিন-ফো কেবল তার কৃতজ্ঞতা জানাতেই পারলে, 'ধন্যবাদ!'

'ধন্যবাদের কোনো দরকারি নেই,' বললে ক্রেগ, 'ওই রাক্ষুসে জানোয়ারের মুখে দু-লাখ ডলার চ'লে যাক, এটা কে চায়!'

ক্রাই সোৎসাহে তার কথা সমর্থন করলে।

কিন্তু সুন তখন কোথায়? ভিতুর ডিম, সবেগে বৈঠা চালিয়ে সে তখন জেলেডিঙির অতি কাছে গিয়ে পৌঁছেছে। কিন্তু তার এই সাবধানতা বুঝি ক্রন্দনেই শেষ হয়!

ধীবরেরা হঠাৎ নৌকোর কাছে অমন অদ্ভুত একটা জলজন্তু দেখে ধরবার জন্য শশব্যস্ত হ'য়ে উঠলো, কোনো নীল মাছ বা শুশুক যেভাবে ধরে, সেইভাবেই তারা ওপর থেকে মস্ত বঁড়শিওলা একটা দড়ি ফেলে দিলে জলে, বঁড়শিটা সুনের কোমরবন্ধে আটকে গেলো, তারপর একটু পিছলে গিয়ে তার ওই জমাট আঠার পোশাক চিরে পিঠ খাঁচড়ে দিলো। কেবল ওই পাজামাটাই আছে তখন তার: মুণ্ডু রইলো জলের তলায়, পা-দুটো শূন্যে, আর ওই অবস্থায় বঁড়শি-বেঁধা সুন ডিগবাজি খেলো জলে।

কিন-ফো, ক্রেগ আর ক্রাই ততক্ষণে কাছে পৌঁছেছে; স্পষ্ট সুবোধ্য চিনে ভাষায় তারা ধীবরদের ডাকতে লাগলো। 'কথা-কওয়া' নীল মাছ দেখে ধীবরদের মধ্যে তো বিষম আতঙ্কের সাড়া প'ড়ে গেলো। প্রথমে তারা পাল খাটিয়ে চম্পট দেবার মৎলব করলে, কিন্তু অবশেষে কিন-ফো ছোটোখাটো

বক্তৃতা দিয়ে যখন তাদের বোঝাতে পারলে যে সে আসলে একজন চৈনিক মাত্র তবেই ধীবরেরা তাকে আর ওই দুই মার্কিনকে নৌকোয় তুলে নিলে। তারপর সুনকে আস্তে-আস্তে টেনে তোলা হ'লো দড়ি টেনে, আর একটি ধীবর তাকে তুলে নেবার জন্ম তার বেণী ধ'রে টান দিলে সজোরে। আর বেণীটাই খ'লে চলে এলো তার হাতে, আর সুন অমনি আবার ঝপাৎ ক'রে জলে গিয়ে পড়লো। অবশেষে নানা কসরৎ করে তার কোমরে দড়ি জড়িয়ে ধীবরেরা তাকে নৌকোয় তুলে আনতে পারলে।

পেটের সব জবণজল ওয়াক-ওয়াক ক'রে বের করে দেবার সময় দিলো না কিন-ফো, সুনের কাছে গিয়ে বললে, 'তাহলে তোর এটা নকল বেণী? পরচুলা?'

'হ্যাঁ, হুজুর,' বললে সুন, 'আপনা'র মেজাজ তো জানতাম আসল বেণী নিয়ে আপনার কাছে চাকরি করার সাহস ছিলো না কি আমার!

এমন করুণ ও কাতর গলায় সে কথাটি বললে যে কিন-ফো আর হাসি চাপতে পারলে না অক্তদের সঙ্গে হো-হো করে হেসে উঠলো

ধীবরদের ডেরা নাকি ফু-নিন-এই, যেখানে যাবার জন্ম কিন-ফো ব্যাকুল হয়েছিলো ব'লেই এত কাণ্ড। ফু-নিন বন্দর নাকি আর বড়ো পাঁচ মাইল দূরে, জানতে পারলো তারা।

সেদিনই সন্ধে আটটা নাগাদ তারা নিরাপদে ফু-নিন-এ অবতরণ করলে। বোয়াটো পোশাক ছেড়ে আবার সাধারণ পোশাকে জেটিতে এসে পা দিলে তারা।

২১

গোয়েন্দাগিরিতে ইস্তফা

'এবার ওই তাই-পিংটির খোঁজ নেয়া যাক!' এত ধকল স'য়ে রাতটা কিন-ফো সমস্ত বিশ্রামেই কাটিয়েছিলো, কিন্তু পরদিন সকালবেলায় ঘুম থেকে উঠেই প্রথম কথা সে বললে, 'এবার ওই তাই-পিং-এর পালা!' লাও-শেনের এক্তিয়ারের মধ্যেই আছে এখন তারা, আজ ত্রিশে জুন, পুরো ব্যাপারটা চরম সংকটে পৌঁছেছে একেবারে। এই দ্বন্দ্বের মধ্য থেকে কিন-ফো অটুট, অক্ষত ও বিজয়ী বেরিয়ে আসবে তো? ওয়াং-এর এই নির্মম প্রতিনিধি

তার বুকে চরম আঘাত হানিয়ে দেবার আগেই সে কি ওই চিঠিটা ফিরে পাবার প্রস্তাব উত্থাপন করতে পারবে?

ক্রেগ আর ফ্রাই নিজেদের মধ্যে অর্থপূর্ণ দৃষ্টি বিনিময় ক'রে প্রতিধ্বনি তুললো: 'এবার এই ভাই-পিঙের পালা!'

আগের দিন সন্ধেবেলায় যখন ছোটো দলটি ফু-নিন-এ পদার্পণ করেছিলো, তখন তাদের এই অদ্ভুত পোশাক ছোট্ট বন্দরটিতে বেশ সাড়া তুলে দিয়েছিলো। লোকের কৌতূহলের সীমা ছিলো না তাদের দেখে, সরাইখানার দরজা অবধি ছোটোখাটো একটা ভিড় তাদের অনুসরণ করেছিলো, ক্রেগ আর ফ্রাই তাগিদ তাদের জাদুকরের ঝুলি ওয়োকে জল-নিরোধী থলিতে টাকাকড়ি রাখতে ভোলেনি,—না-হ'লে এই অবস্থার সঙ্গে খাপ খায় এমন পোশাক তারা কিনতো কী ক'রে? আর চারপাশে অমন বিষম ভিড় জ'মে না-গেলে বিশেষ একটি চৈনিককে হয়তো লক্ষ করতে পারতো তারা, যে একবারের জন্যও তাদের পিছন ছাড়েনি তাদের বিস্ময় হয়তো আরো বিপুল পর্যায়ে পৌঁছুতো যদি তারা জানতে পারতো যে সেই চৈনিকটি সারারাত ওই সরাইখানার দরজায় ব'সে পাহারা দিয়েছে, এবং শুধু তা-ই নয়, সকালবেলাতেও কাঠ-পুত্তলিকাবৎ ওই চৌকাঠের সামনে দাঁড়িয়ে আছে।

যেহেতু তারা এ-সবের কিছুই জানতো না, সেইজন্য তারা সরাইখানা ছেড়ে বেরিয়ে পড়লো তখন। যখন লোকটি এসে বললে সে এই অচেনা মুলুকে তাদের পথপ্রদর্শকের কাজ করতে চায়, তখন তাদের মনে কোনো সন্দেহই জাগলো না। চৈনিকটির বয়েস হবে ত্রিশের মতো, দেখলে মনে হয় ভাজা মাছটি উলটে খেতে জানে না এমনি নিরীহ ও নির্বিরোধী এক সাধুপুরুষ। ক্রেগ আর ফ্রাই অবশ্য জানে যে সাবধানের মার নেই, সেই জন্য তারা জিগেশ করলো কেন এবং কোথায় সে তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে চাচ্ছে।

'একেবারে চিনের প্রাচীর অবধি, বলাই বাহুল্য—' বললে লোকটা, 'ফু-নিন-এ যাঁরাই বেড়াতে আসেন, তাঁরা সবাই চিনের প্রাচীর দেখতে যান—আর এখানকার পথঘাট যেহেতু আমার নখদর্পণে রয়েছে, সেইজন্য আমি ভাবলুম পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবার জন্য আমাকে নিয়োগ করতে আপনাদের হয়তো কোনো আপত্তি থাকবে না।'

কিন-ফো মাঝে-প'ড়ে জিগেশ করলো, 'এ-অঞ্চলটা কেমন? নিরাপদ তো ভ্রমণকারীদের পক্ষে?' পথপ্রদর্শকটি বললে যে এখানে ভয়ের কিছু নেই—খুবই নিরাপদ জায়গা।

'লাও-শেন ব'লে একটা লোক নাকি এখানে থাকে—তুমি তার হদিশ দিতে পারবে?' কিন-কো জিগেস করলে।

'ও! তাই-পি' লাও-শেনের কথা বলছেন?' উত্তর করলো পথপ্রদর্শক, 'কিন্তু চিনের প্রাচীরের এ-পাশে তো তাকে ভয় করবার কিছু নেই। চিন মুলুকে পা দেবার সাহস তার আদৌ হবে না: সে তার স্যাঙাৎদের নিয়ে মোঙোল এলাকায় লুঠতরাজ ক'রে বেড়ায়।'

'শেষ কোথায় দেখা গিয়েছিলো তাকে?' জিগেস করলে কিন-কো।

'ৎচিন-তাং-হোর আশপাশে—প্রাচীর থেকে মাইল কয়েক দূরে।'

'আর কু-লিন থেকে ৎচিন-তাং-হো কদ্দুর?'

'তা প্রায় পঁচিশ মাইল হবে।'

'বেশ, আমাকে লাও-শেনের ডেরায় নিয়ে যাবে, এই জন্য তোমাকে নিয়োগ করলুম।'

লোকটা চমকে উঠলো।

'মোটা টাকা দেয়া হবে তোমাকে এ-জন্য—ইনাম পাবে,' কিন-কো যোগ করলো তক্ষুনি।

কিন্তু পথপ্রদর্শকটি ঘাড় নাড়লো। স্পষ্ট বোঝা গেলো সীমান্ত পেরিয়ে এক পা যাবার মতো বুকের পাটা তার নেই। 'চিনের প্রাচীর পর্যন্ত যদি বলেন তো যেতে পারি—তার একচুলও ওদিকে নয়। প্রাণ হাতে ক'রে ওপাশে যাবার দুঃসাহস আমার নেই।'

যত টাকা চায়, দেবে—কিন-কো তাকে জানালো, শেষকালে অনেক উপরোধের পর হাত কচলাতে-কচলাতে লোকটার কাছ থেকে একটা অনিচ্ছুক সম্মতি আদায় করা গেলো।

মার্কিন গোয়েন্দাদের দিকে ফিরে এবার কিন-কো বললে যে ইচ্ছে করলে তারাও সঙ্গে যেতে পারে, আবার না-ও যেতে পারে—যা তাদের মন চায়।

'আপনি যেখানে যাবেন—' শুরু করলো ক্রেগ।

'আমরাও সেখানে যাবো,' শেষ করলো ফ্রাই, 'এখনো সেন্টেনারিয়ানের মক্কেলের দাম দু-লাখ ডলার।'

পথপ্রদর্শকটি যে শেষ অবধি বিশ্বস্ত থাকবে, এ-বিষয়ে গোয়েন্দা দুজনের আর-কোনো সংশয় ছিলো না। মোঙোল দস্যুদের হাত থেকে নিজেদের বাঁচাবার জন্য চিনেরা যে বিরাট প্রাচীর তুলেছে, তার এ-পাশে অন্তত কোনো

বিপদের সম্ভাবনা আছে ব'লেও তাদের মনে হ'লো না। সুনকে অবশ্য এ কথা কেউ জিগেসই করলে না সে যাবে কিনা — তাকে তো যেতে হবেই।

যাত্রার প্রস্তুতি শুরু হ'লো; এই ছোট্ট শহরটিতে না পাওয়া গেলো কোনো ঘোড়া, না-বা কোনো খচ্চর বা কোনো যানবাহন। তবে উট পাওয়া গেলো অনেক, মোঙ্গোল ব্যাবসাদারের তাদের বেসাতি নিয়ে যায় উটে ক'রেই। উটের সার নিয়ে এই ব্যাবসাদারেরা পিকিং থেকে কিয়াচতা অবধি ঘুরে বেড়ায়, সঙ্গে যায় তাদের বিপুল মেষপাল। রাশিয়ার সঙ্গে চিনের যোগসাধন ঘটায় এই উটের পালই — যদিও মোঙ্গোলরা কখনো সশস্ত্র বা দলে ভারি না-হ'লে বিশাল স্তেপভূমিতে পা দিতে চায় না। ম'সিয় দ্য মোতোয়া এই মোঙ্গোলদের সম্বন্ধে এই বর্ণনা দিয়েছেন, 'হিংস্র মানুষ এরা, অহংকারী ও দেমাকি — চিনেদের এরা ঘেন্না করে।'

শেষকালে পাঁচটা উটই কিনলে তারা — জিন-টিন সমস্ত দরকার উপকরণ সমেত। খাদ্যসম্ভার নেয়া হ'লো সঙ্গে, অস্ত্রশস্ত্রের ব্যবস্থা করতেও ভুললো না তারা — তারপর সব জোগাড়-যন্ত্র শেষ হ'লে পথ-প্রদর্শকের সঙ্গে তারা বেরিয়ে পড়লো।

জোগাড়-যন্ত্র করতে গিয়ে এত সময় চ'লে গেলো যে বেলা একটার আগে তারা রাস্তায় নামতে পারলে না। পথপ্রদর্শকটি অবশ্য বললো যে মাঝ-রাতের আগেই তারা চিনের প্রাচীরের কাছে পৌঁছে যাবে — সেখানে তারা একটা সাময়িক শিবির করবে ব'লে ঠিক হ'লো, তার পরেও যদি কেউ-কেউ প্রাচীর পেরিয়ে ও-পাশে যেতে চায় তাহ'লে না-হয় কাল সকালে তা'রা সীমান্ত অতিক্রম করবে।

কু-নিন-এর আশপাশে ভূমি ঢেউয়ের মতো বন্ধুর ও অসমতল — রাস্তা গেছে ঘুরে-ঘুরে ক্ষেত খামারের মধ্য দিয়ে: তারা যে এখনো চিন সাম্রাজ্যের সোনার মতো জমি দিয়ে যাচ্ছে, ক্ষেতখামারগুলো তারই ইঙ্গিত, রাস্তা থেকে হলদে ধুলো ওঠে হাওয়ায় — আকাশ পর্যন্ত যেন উঠে যায়।

উটের চলার ভঙ্গি ধীরস্থির, ছন্দোময় — দুই কুঁজের মাঝখানে বেশ আরাম ক'রে ব'সে থাকে আরোহী। এইভাবে যেতে সুনের কোনো আপত্তি নেই, বরং বেশ খুশিই হ'লো সে: এইভাবে একেবারে পৃথিবীর শেষ সীমায় যেতেও তার কোনো আপত্তি নেই। গরম অবিশ্যি প্রচণ্ড পড়েছে; মাটি থেকে প্রতিফলিত হ'য়ে গরম হাওয়া অদ্ভুত সব মরীচিকা সৃষ্টি করেছে, রচনা ক'রে যাচ্ছে দিগ্বিভ্রম; যেমন আচম্বিতে তারা দেখা দিলো তেমনি আচম্বিতেই

তারা মিলিয়ে-মিলিয়ে গেলো দেখে তুনের আহ্লাদের সীমা রইলো না: আরেকটি মরুযাত্রার কথা ভাবলেই আতঙ্কে ও বিভীষিকায় তার রোমকূপগুলি খাড়া হ'য়ে ওঠে।

কু-নিন চিনের একেবারে সীমান্তে অবস্থিত হ'লেও লোকবসতি এখানে মোটেও কম নয়: ক্রমবর্ধমান লোকসংখ্যা এমনকি একেবারে মধ্য-এশিয়ার মরুভূমি পর্যন্ত ছড়িয়ে গেছে। লাল আর নীল পোশাক-পরা তাতার পুরুষ ও রমণীরা খেতে-খামারে কৃষিকর্মে লিপ্ত। এদিক-ওদিক ঘুরে বেড়াচ্ছে হলদে রঙের ভেড়ার পাল — তাদের লম্বা ল্যাজ বেচারা তুনকে বোধহয় ঈর্ষাতুরই ক'রে তুললো। মাথার উপরে ঘুরে বেড়াচ্ছে কালো বাজপাখি, কোনো মেষশাবক দল ছাড়া হ'য়ে তাদের নজরে একবার পড়লেই হ'লো! ব্যস, অমনি এই সমস্ত দুর্দান্ত হিংস্র শিকারি পাখি ভেড়া, হরিণ, শম্বরদের ছোঁ মেরে নিয়ে যায় — মধ্য-এশিয়ার কিরঘিজরা তালকুত্তার বদলে অনেক সময় এ-সব শিকারি বাজ পোষে।

শিকারের কোনো অভাব নেই আশেপাশে, কারু কাছে বন্দুক থাকলে সে বুঝি কোনো অবসরই পাবে না, যদিও কোনো সাত্যিকার শিকারি হয়তো সব জনার আর সন্দেহে পেতে রাখা এ-সব জাল ফাঁদ ও আরো-সব কৌশলকে খুব একটা ভালো চোখে দেখবে না কখনো।

কিন-ফো আর তার সহযাত্রীরা একটানা এগিয়েই চললো ধুলো-ঝড়ের মধ্য দিয়ে: কোনো ছায়া-ভরা গাছতলা, একা খামার বাড়ি বা কোনো গ্রামেই তারা থামলো না। দূর থেকেই গ্রাম চেনা যায়, কারণ সব গ্রামেই বৌদ্ধ শ্রমণদের স্মৃতিস্তম্ভ আছে — দূর থেকেই সেগুলো চোখে পড়ে। উটগুলো একটানা এগিয়ে চললো সার বেঁধে — একটার পিছনে আরেকটা — আর গলায় ঝোলানো গোল লাল ঝুমঝুমির তালে-তালে ছন্দোময় ভঙ্গিতে তাদের পা পড়তে লাগলো।

এ-অবস্থায় কোনো কথাবার্তা সম্ভব ছিলো না। পথপ্রদর্শকটি অত্যন্ত চাপা ও মুখবোজা — সেই সব সময় চললো সকলের আগেভাগে: সব সময়েই সামনে হলদে ধুলোর ঝড়ের পরদা থাকলে কী হবে, কোন পথে যেতে হবে সে-সম্বন্ধে তার কোনো দ্বিধা বা সংশয় দেখা গেলো না: এমনকি চৌমোহানায় এসে কোনো চিহ্ন না-থাকলেও সে ইতস্তত না-ক'রে নিজের পথ চিনে নিতে পারলে। তার সততা সম্বন্ধে ক্রেগ আর ফ্রাইয়ের আর-কোনো সংশয় ছিলো না ব'লে তারা এবার কিন-ফোর দিকেই মনঃসংযোগ করলে। স্বভাবতই সময় যতই কেটে গেলো, তাদের উৎকণ্ঠাও ততই বাড়তে লাগলো। এখুনি একটা

এলপাত্র ওলপায় হ'য়ে যাবে—যে-শঙ্কায় ভয়ে তাদের বুকের ধকধক বেড়ে যায়, এবার নিশ্চয়ই সে একটা হেস্তনেস্ত করার জন্ম এসে হাজির হবে।

কিন-ফো'র কিন্তু এদিকে বর্তমান বা ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনো উদ্বেগই ছিলো না—সে মনে-মনে বরং অতীতকেই নাড়াচাড়া ক'রে দেখছিলো। গত দু-মাসের এই একটানা বিপর্যয়ের কথা মনে পড়তেই কেমন যেন বিমর্ষ হ'য়ে পড়ছে সে। সান ফ্রান্সিসকো থেকে তার প্রতিনিধি তার সব সম্পত্তি হারাবার খবর পাঠাবার পর থেকে তার জীবনে এই-যে একের পর এক দুর্ঘটনা ঘটছে, দুর্ভাগ্য তাকে যে ভ'বে তাড়া ক'রে নিয়ে ফিরছে লাট্টুর মতো, এটা কি একটু অদ্ভুত নয়! যখন সব সুযোগ-সুবিধে ছিলো তখন সে তার মর্যাদা বোঝেনি! এখন সেই হারানো দিনগুলোর কী বিষম বিপরীত তার দশা। ওই চিঠিটা ফিরে পেলেই কি তার দুর্ভাগ্যের অবসান হবে? সত্যি কি শেষে লা-ওকে সে পাবে? মাধুরীর প্রতিমা সে—তার স্নিগ্ধ ও মধুর সান্নিধ্য তাকে কি এই বিষম দিনগুলি ভুলিয়ে দেবে? ভাবনারা তাকে কেমন যেন বিমূঢ় ক'রে দিয়ে গেলো! হায়! এখন আবার ওয়াং-ও নেই যে তাকে দুর্দশায় সান্ত্বনা ও পরামর্শ দেবে—তার যৌবনের বন্ধু ও চিন্তাগুরু তারই জন্ম শেষকালে কিনা স্বেচ্ছামৃত্যু বেছে নিলো!

আরো কত কী সে ভাবতো কে জানে! হঠাৎ তার উটটি পথপ্রদর্শকের উটের গায়ে ধাক্কা খেতেই তার চিন্তাসূত্র ছিঁড়ে গেলো—আরেকটু হ'লেই একেবারে আছড়ে পড়তো সে মাটিতে।

'কী হে? থেমে পড়লে কেন?' জিগেস করলে কিন-ফো।

'আটটা বাজে এখন,' পথপ্রদর্শকটি বললে, 'আমি বলি কি এখানে একটু থেমে আমরা নৈশভোজটা সেরে নিই। তারপর আবার না-হয় যাওয়া যাবে।'

'কিন্তু তখন তো অন্ধকার ক'রে আসবে—,' কিন-ফো আপত্তি জানালো।

'পথ আমি কিছুতেই হারাবো না। চিনের প্রাচীর আর মাইল দশেকের বেশি দূর হবে না। আমরা বরং উটগুলোকে একটু বিশ্রাম দিই এবার।'

এ-প্রস্তাবে কিন-ফো সম্মতি দিতেই পুরো দলটা বিশ্রাম নেবার জন্ম থেমে পড়লো। পথের পাশেই একটা পোড়ো বাড়ি প'ড়ে ছিলো—তার পাশেই ছিলো ছোট্ট একটা ঝরনা—উটগুলো সেখানেই জল পাবে। তখনও অন্ধকার হয়নি। কিন-ফোরা বেশ দেখে-শুনেই ভোজ্যদ্রব্য সাজালো সামনে, বেশ তৃপ্তিসহকারেই উদরপূর্তি করলে তারা অতঃপর।

কথাবার্তা হ'লো ভেঙে-ভেঙে। কিন-ফো দু-তিনবার লাও-শেনের সম্বন্ধে

প্রশ্ন করেছিলো অবিশ্যি, কিন্তু পথপ্রদর্শকটি বারে-বারে কেবল ঘাড় নেড়ে বোঝাতে চাইলো এ-বিষয়ে সে কোনো কথা বলতে চায় না। সে শুধু তার আগের কথারই প্রতিধ্বনি করলে, লাও-শেন কদাচ চিনের প্রাচীরের এ-পাশে আসে না, যদিও তার শাগরেদরা অবিশ্যি মাঝে মাঝে আবির্ভূত হয়। 'ভগবান বুদ্ধ আমাদের ওই তাই-পিং-এর হাত রক্ষা করুন,' এই হ'লো তার শেষ কথা।

পথপ্রদর্শকটি যখন কথা বলছিলো, ক্রেগ আর ফ্রাই তখন ভুরু কুঁচকে ঘড়ি দেখতে-দেখতে ফিশফিশ ক'রে নিজেদের মধ্যে কী যেন বলাবলি করছিলো। শেষকালে তারা জিগেশ করলো, 'কাল সকাল অবধি এখানে থেকে গেলেই হয় না?'

'এই পোড়ো বাড়িতে!' পথপ্রদর্শকটির চোখ যেন কপালে উঠলো 'তার চেয়ে খোলামেলা জায়গা ঢের ভালো। আচমকা কেউ চড়াও হ'তে পারবে না তখন।'

'এ-কথা তো আগেই ঠিক হয়েছিলো যে আজ রাতেই আমরা প্রাচীরের কাছে পৌঁছুবো,' বললে কিন-ফো, 'সেখানেই আমি রাত কাটাতে চাই আজকে।'

তার গলার স্বর শুনে গোয়েন্দা দুজন আর আপত্তি করতে পারলো না। সুন তো ভয়ে একেবারে আমশি হ'য়ে গেছে: প্রতিবাদ করার কোনো ক্ষমতাই তার তখন ছিলো না।

প্রায় নটা বাজে তখন, খাওয়াদাওয়া শেষ ক'রে পথপ্রদর্শক যাত্রার সংকেত করলে। কিন-ফো তার উটে উঠতে যাবে, এমন সময় ক্রেগ আর ফ্রাই তার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। 'আপনি কি লাও-শেনের খপ্পরে পড়বেন ব'লেই প্রতিজ্ঞা করেছেন?'

'প্রতিজ্ঞাই বটে,' বললে কিন-ফো, 'যেভাবেই হোক, ওই চিঠিটা আমায় উদ্ধার করতেই হবে।'

'মস্ত বিপদের ঝুঁকি নিচ্ছেন কিন্তু আপনি –' তারা বোঝাবার চেষ্টা করলো, 'এই যে এভাবে তাই-পিং-এর ঘাঁটিতে যাচ্ছেন, তাতে সমূহ বিপদের সম্ভাবনা।'

'এত দূরে এসে আর ফেরবার কোনো মানে হয় না,' কিন-ফোর গলায় কোনো অনিশ্চিতির আভাস নেই, 'আপনাদের তো আগেই বলেছি যে আপনারা ইচ্ছে করলে আমার সঙ্গে না-ও আসতে পারেন।'

পথপ্রদর্শকটি ততক্ষণে একটা ছোট্ট পকেটলণ্ঠন বার ক'রে জ্বালিয়েছে।

ক্রেগ আর ক্রাই আরো কাছে এগিয়ে এলো, ঘড়ি দেখলো একবার; আবারও বললো, 'কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করলে ঢের বুদ্ধিমানের কাজ করতেন।'

'বাজে কথা!' কিন-ফো ব'লে উঠলো, 'লাও-শেন আজও যেমন, কাল-পরশুও তেমনি বিপজ্জনক থাকবে—রাতারাতি তার বদলে যাবার কোনো সম্ভাবনা নেই। আমি মনস্থির ক'রে ফেলেছি: এক্ষুনি রওনা হ'য়ে পড়তে হবে আমাদের।'

তাদের কথাবার্তার শেষ দিকটা পথপ্রদর্শকটির কানে গিয়েছিলো। আগেও দু-একবার ক্রেগ আর ক্রাই যখন কিন-ফোকে নিষেধ করতে গেছে, তার মুখে অসন্তোষের ভঙ্গি ফুটে উঠেছিলো। এবার যখন তাদের নাছোড়বান্দার মতো পীড়াপীড়ি দেখলো, তখন সে আর তার বিরক্তি চেপে রাখতে পারলে না।

তার এই বিরক্তির ভঙ্গিমাটি কিন-ফোর নজর কিন্তু এড়ায়নি। তার বিস্ময় আরো বেড়ে গেলো যখন তাকে উটের পিঠে উঠতে সাহায্য করতে এসে পথপ্রদর্শকটি তাকে কানে-কানে ব'লে গেলো: 'ওই লোক দুটো সম্বন্ধে সাবধানে থাকবেন!'

এ-কথার অর্থ কী, জিগেস করতে যাচ্ছিলো কিন-ফো, কিন্তু লোকটি মুখে আঙুল দিয়ে তাকে চুপ করতে ব'লে যাত্রার সংকেত করলে। ছোট্ট বহরটি রাতের রাস্তায় রওনা হ'য়ে পড়লো।

পথপ্রদর্শকটির ওই রহস্যময় কথাটিতে কিন-ফোর বড্ড অস্বস্তি ও খটকা লাগলো, অথচ এটাও তার আদৌ বিশ্বাস হচ্ছিলো না যে দু-মাস ধ'রে ছায়ার মতো অচঞ্চল ভাবে তাকে সেবা ক'রে শেষকালে তারা তার সঙ্গে কোনো বিশ্বাসঘাতকতা করবে। কিন্তু তাই-পিংদের ঘাঁটিতে তাকে যেতে দিতে চাচ্ছে না কেন তারা? এই উদ্দেশ্যেই কি তারা পিকিং থেকে বেরোয়নি? চিঠিটা কিন-ফো ফেরত পাক, এটা কি তাদেরও স্বার্থের অন্তর্ভুক্ত নয়! সত্যি, এদের আচরণ ক্রমশই ধাঁধার মতো ঠেকেছে।

এ-সব হিজিবিজি প্রশ্ন কিন-ফো মনে-মনেই চেপে রাখলো। পথপ্রদর্শকটির উটের ঠিক পিছনেই রয়েছে সে, আর ক্রেগ আর ক্রাই রয়েছে তার পিছনে; কোনো কথা না-ব'লেই ঘণ্টা দু-এক একটানা গেলো তারা।

তখন মাঝরাতের আর বেশি বাকি নেই, হঠাৎ পথপ্রদর্শকটি থেমে প'ড়ে আঙুল তুলে দেখালো উত্তর দিকে: আকাশের গায়ে দীর্ঘ একটি মিশকালো রেখা ফুটে উঠেছে উত্তর দিকে—আর ওই কালো রেখার আড়াল থেকে জ্যোৎস্না-

শাদা কতগুলো চকচকে পাহাড়ের চুড়ো দেখা যাচ্ছে: চাঁদ অবশ্যি তখনো ওঠেনি—এখনো দিগন্তের আড়ালে ঢাকা প'ড়ে আছে চাঁদের টুকরো।

'মহাপ্রাচীর!' বললে পথপ্রদর্শকটি।

'আজ রাতেই প্রাচীরটা পেরিয়ে যাবো কি আমরা?' কিন-ফো জিগেশ করলে।

'আপনি যদি বলেন, তাহ'লে যাবো নিশ্চয়ই।

'তাহ'লে তা-ই হোক!'

'আমি তাহ'লে আগে গিয়ে পথঘাট দেখে আসি,' পথপ্রদর্শকটি বললে, 'যতক্ষণ-না ফিরে আসি, ততক্ষণ এখানেই অপেক্ষা করুন।'

উটগুলো সব থেমে পড়লো, মোড় ঘুরে রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো পথপ্রদর্শকটি। ক্রেগ আর ফ্রাই এগিয়ে এসে কিন-ফোর কাছে দাঁড়ালো।

'আপনার দেখাশুনো করবার ভার পাবার পর থেকে আমাদের কাজকর্মে আপনি তুষ্ট হয়েছেন তো?' এক নিশ্বাসে তারা জিগেশ করলে।

'নিশ্চয়ই।'

'তাহ'লে দয়া ক'রে এই মর্মে এই কাগজটায় দস্তখৎ ক'রে দেবেন কি যে আপনার তদারকি করার সময় আমাদের আচার-আচরণে আপনি অতীব সন্তোষ লাভ করেছেন?'

ক্রেগ তার নোট বইয়ের একটা পাতা ছিঁড়ে হস্তদন্ত কিন-ফোর দিকে বাড়িয়ে ধরলো।

'প্রশংসাপত্রটা কর্তাকে দেখালে তিনি নিশ্চয়ই খুশি হবেন,' ফ্রাই বিশদ করলো বক্তব্য।

'আমার পিঠটাকে টেবিল ক'রে এখানে রেখে লিখুন,' ব'লে ক্রেগ কুঁজো হ'য়ে পিঠ বাড়িয়ে দিলো তার সামনে।

'আর আপনার নাম দস্তখত করার জন্য এই যে কালিকলম—' যোগ করলো ফ্রাই।

কিন-ফো হেসে ফেললো, সই করতে-করতে বললো, 'কিন্তু এত রাতে হঠাৎ এই অনুষ্ঠান কেন?'

'কারণ আর দু-এক মিনিটের মধ্যেই আপনার সেন্টেনারিয়ানের বীমার মেয়াদ উত্তীর্ণ হ'য়ে যাবে,' বললে ক্রেগ।

'তখন আপনি আত্মহত্যা করুন বা বধ হ'তে যান—আমাদের তাতে কোনো আপত্তি নেই,' বললো ফ্রাই।

কিন-কো একেবারে স্তম্ভিত। অত্যন্ত মৃদু, স্পষ্ট ও অনুত্তেজিত স্বরে বললেও তাদের কথার এক বর্ণও যেন সে বুঝতে পারছিলো না। হঠাৎ পুব দিকে এমন সময় চাঁদ উঠে এলো।

'ওই যে, চাঁদ উঠেছে!' ব'লে উঠলো ক্রাই।

'আজ তিরিশে জুন ওর মাঝরাতে ওঠার কথা,' বললে ক্রেগ।

'আপনার বীমার মেয়াদ বাড়ানো হয়নি—দ্বিতীয় কিস্তির টাকা দেননি আপনি,' বললে ক্রাই।

'সেই জন্যে,' ক্রেগ বুঝিয়ে বললো, 'আপনি আর সেন্টেনারিয়ানের মক্কেল নন এখন।'

'শুভরাত্রি,' বিনীতভাবে বিদায় জানালো ক্রাই।

'শুভরাত্রি,' ক্রেগও সমান সৌজন্য সহকারে প্রতিধ্বনি তুললো।

তারপরেই গোয়েন্দা দু-জন তাদের উটের মুখ উলটো দিকে ঘুরিয়ে কিন-ফোকে হতবাক, বিমূঢ় ও স্তম্ভিত ক'রে রেখে রাতের অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো।

আর তাদের উটের পায়ের শব্দ মেলাবার আগেই রে-রে ক'রে এসে একদল লোক চড়াও হ'লো কিন-ফোর উপরে, তাদের পুরোভাগে ছিলো স্বয়ং পথপ্রদর্শকটি। সুন অসহায় কিন-ফোকে ফেলে রেখেই পালাতে চাচ্ছিলো, কিন্তু লোকগুলো তাকেও বাদ দিলো না।

পর মুহূর্তেই প্রভু ভৃত্য দুজনকে টেনে নিয়ে নিয়ে যাওয়া হ'লো মহা-প্রাচীরের তলায় একটা ছোটো চোর কুঠারির কাছে: তারা ভিতরে ঢুকতেই তাদের পিছনে দরজাটি সশব্দে বন্ধ হ'য়ে গেলো।

২২

আবার শাংহাই

চিনের মহাপ্রাচীর নির্মাণ করেছিলেন সম্রাট ভিন-চি-হয়াং—সেই তৃতীয় শতাব্দীতে; লম্বায় প্রায় ১৫০০ মাইল—লিয়াও-তং উপসাগর থেকে শুরু হ'য়ে কান-সু প্রদেশ পর্যন্ত গেছে, তারপর ক্রমশ সরু হ'য়ে-হ'য়ে মিলিয়ে গেছে। সারি-সারি গেছে দুর্গপ্রাচীরের ডবল দেয়াল—পঞ্চাশ ফুট উঁচু আর কুড়ি ফুট চওড়া একেকটা অংশ প্রাচীর থেকে ঠেলে বেরিয়েছে; নিচের

দিকটা গ্র্যানাইট পাথরের, উপরের দিকটা ইট দিয়ে তৈরি, চিন-রুশ সীমান্ত ধ'রে যে-গিরিশ্রেণী গেছে, এই প্রাচীর গেছে তারই গা বেয়ে। চিনের দিকে দেয়ালটা এখন জীর্ণ হ'তে চলেছে, কিন্তু যে-পাশটা মাঞ্চুরিয়ার দিকে, তা এখনো সযত্নে রক্ষিত আছে—সেই দুর্গের ঘুলঘুলির সারি এখনো আছে, যার ভিতর থেকে গুলি-গোলা ছোড়া হ'তো।

এই দুর্গপ্রাচীর কেউ রক্ষা করে না আজকাল—না কোনো সেনাবাহিনী, না-কোনো গোলন্দাজ দল। রুশ, তাতার, কিরঘিজ আর চৈনিক—সবাই অবাধে এখান দিয়ে যাতায়াত করতে পারে, তাছাড়া এই দেয়াল যোজোন ধুলোর ঝড়কেও কোনো বাধা দিতে পারে না—কখনো কখনো হাওয়া এমনকি রাজধানী পর্যন্ত রাঙা ধুলো উড়িয়ে নিয়ে আসে।

একরাশ খড়ের উপর একটা হতচ্ছাড়া রাত কাটাবার পর কিন-ফো আর সুনকে পরদিন সকালবেলায় এইসব পরিত্যক্ত ও নিরিবিলি প্রাচীরের থামের তলা দিয়ে জোর ক'রে নিয়ে যাওয়া হ'লো। বারো জনের একটা দল তাদের নিয়ে যাচ্ছে, লোকগুলো যে লাও-শেনেরই স্যাঙাৎ, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। যে-পথপ্রদর্শকটি তাদের অ্যাম্বুশে নিয়ে এসেছে, তার আর কোনো পাত্তা নেই, এটা ক্রমেই স্পষ্ট হ'য়ে উঠলো যে সে চুক্তিমাফিকবশতই তাদের এই বাহিনীর হাতে তুলে দিয়ে গেছে—ব্যাপারটা মোটেই কোনো দৈবদুর্ঘটনা নয়। মহাপ্রাচীরের ওপাশে যাবে না ব'লে যে মারেশর্তটা যে গাইডটি করেছিলো, তা যে আসলে সন্দেহ না-জাগাবার একটা ফন্দি মাত্র—এটা এখন আর বুঝতে অসুবিধে হ'লো না, সেও যে তাই-পিং এর হুকুমই তামিল করছিলো, তাও এখন প্রত্যাতীতরূপে সাত্য।

'তোমরা নিশ্চয়ই আমাকে লাও-শেনের ঘাঁটিতে নিয়ে যাচ্ছো?' বাহিনীর সর্দারকে বললো কিন-ফো।

'ঘন্টাখানেক পরেই সেখানে পৌঁছে যাবো আমরা,' লোকটা উত্তর দিলে।

কিন-ফোর অনুমানই যে ঠিক, এ-কথায় এটাই প্রমাণিত হ'লো, যদিও প্রমাণের কোনো দরকার ছিলো না, তবু কেন যেন এ-কথা জেনে বেশ তৃপ্তি পেলে সে। যেখানে যাবে ব'লে সে রাস্তায় বেরিয়েছিলো, সেখানেই তো এরা নিয়ে যাচ্ছে তাকে—তাই নয় কি? তাছাড়া যে কাগজটার জন্যে তার প্রাণ ছিন্নপ্রায় সূক্ষ্ম রজ্জুতে দোদুল্যমান, এবার তো সেটাই ফিরে পাবার সম্ভাবনা দেখা দিলো অবশেষে। কোনো চাঞ্চল্যই দেখা গেলো না তার, নির্বিকার ও

আবার তার ভঙ্গি—যাবতীয় আতঙ্কের অভিব্যক্তি দেখা গেলো বেচারা সুনেরই হাবভাবে—ভয়ে তখন দাঁতকপাটি লেগে যাচ্ছিলো বেচারার।

দেয়াল পেরিয়ে বাহিনীটা কিন্তু সেই বিখ্যাত মোঙোল সরণি ধরলো না, বরং পার্বত্য অঞ্চলের এক খাড়াই ও বন্ধুর পথ ধ'রে এগিয়ে চললো, বন্দীদের তারা এমনি সাবধানে পাহারা দিচ্ছিলো যে পালাবার সব চেষ্টাই তাদের ব্যর্থ হ'তো—যদি অবিশ্যি তারা পালাবার কোনো মৎলব আঁটতো।

এই উৎরাই দিয়ে যতটা তাড়াতাড়ি যাওয়া যায়, ততটা দ্রুতবেগেই তারা যাচ্ছিলো। ঘণ্টা দেড়েক পরে একটা ঠেলে-বেরোনো চুড়োয় বাঁক ঘুরেই তারা একটা জরাজীর্ণ ও হতশ্রী দালানের কাছে এসে পড়লো, আগে এটা ছিলো একটি বৌদ্ধ বিহার। বৌদ্ধ ভাস্কর্যের অদ্ভুত নিদর্শন দেখা গেলো পাহাড়ের চুড়োয়, এই দালানটিতে। এখন বোধহয় সাধারণের এই ফাঁকা জায়গায় কেউই আর পুজো দিতে আসে না, বরং দস্যুদের আস্তানা গাড়ার পক্ষে এর চেয়ে চমৎকার জুড়ি আর হ'তে পারে না। লাও-শেন যদি এখানেই তার ডেরা বেঁধে থাকে, তাহ'লে সে ঠিকই 'বিচক্ষণতা'র পরিচয় দিয়েছে।

কিন-ফোর প্রশ্নের উত্তরে সর্দার তাকে জানালে যে সত্যি, এটা লাও-শেনেরই ডেরা।

'এক্ষুনি তার কাছে নিয়ে চলো আমাকে,' কিন-ফো বললো।

লোকটা বললে, 'সেই জন্যেই তো আপনাকে আনা হয়েছে।'

প্রথমে কিন-ফো আর সুনের পিস্তলগুলো কেড়ে নিলো তারা, তারপর সেই পুরোনো মন্দিরটার ভেতরের একটা বারান্দায় নিয়ে আসা হ'লো তাদের। দুর্দান্ত দেখতে জনা-বারোক লোক এখানে অপেক্ষা করছিলো: পরনে অস্ত্রশস্ত্র সমেত দস্যুদের পোশাক। কিন-ফো ঢুকতেই তারা দু-সারে সার ক'রে দাঁড়ালো। কিন-ফো বিন্দুমাত্র বিচলিত না হ'য়ে তাদের মধ্যে দিয়ে নির্ভীকভাবে এগিয়ে গেলো, কিন্তু সুনকে ঘাড় ধ'রে টেনে আনতে হ'লো সেখানে। বারান্দাটার শেষপ্রান্তে নিরেট দেয়ালের গায়ে খাঁজ কেটে সারি-সারি সিঁড়ি গেছে একেবারে পাহাড়ের মাঝখান অব্দি—এমন জটিলভাবে গোলকধাঁধার মতো ঘুরে ঘুরে পথ গেছে সেখানে যে, অনভ্যস্ত লোকের পক্ষে পথ চিনে চলাই মুশকিল হ'তো।

মশাল জ্বালিয়ে বন্দীদের পথ দেখিয়ে নিয়ে গেলো তারা, প্রায় তিরিশটা সিঁড়ি নেমে-আসার পরে একটা সংকীর্ণ সুড়ঙ্গ দিয়ে প্রায় দুশো হাত হেঁটে এসে শেষটায় একটা মস্ত হলঘরে এসে পৌঁছুলো তারা, আরো মশাল জ্বালানো

ছিলো সেই ঘরে, কিন্তু তবু ঘরটা মোটেই যেন আলো হয়নি — বাদশা অন্ধকারে ঢাকা প'ড়ে আছে। নিচু ছাত, বিশাল এককটা থাম, থামের গায়ে চৈনিক পুরাণের নানা অতিকায় ও আতঙ্কজাগানো জীবজন্তুর মূর্তি খোদাই-করা, থামগুলো যত উপরে উঠেছে, ততই যেন চওড়া হয়েছে। কিন-ফো ঢুকতেই সারা ঘরে একটা মৃদু মর্মর উত্থিত হ'লো, আর তাইতেই সে বুঝতে পারলো যে ঘরটায় লোক আছে, মানে ঘর সুদ্ধু গিশগিশ করছে লোক — যেন কোনো বিশেষ অধিবেশন বসবে ব'লে রাজ্যসুদ্ধ তাই পিং এসে হাজির হয়েছে।

সেই অর্ধবর্তুল হলঘরের একেবারে শেষ প্রান্তে একটা পাথরের মঞ্চ — আর তার উপরে দাঁড়িয়ে আছে একটি বিশালদেহী মানুষ, কোনো গোপন বিচারসভার সভাপতি যেন সে, তাকে দেখে এটাই মনে হয়, তার পাশে দাঁড়িয়ে আছে তিন চারটি অনুচর, যেন তারা তার উপদেষ্টা পরিষৎ, বিচারপতির ইঙ্গিতে তারা বন্দীদের কাছে এগিয়ে আনার আদেশ দিলে

'ইনিই লাও-শেন,' পাহারাওলাদের সর্দার মঞ্চের উপরকার সেই বিশাল মানুষটিকে দেখিয়ে দিলে।

দৃঢ়পায়ে সামনে এগিয়ে এলো কিন-ফো, একেবারে সরাসরি কাজের কথা পাড়লো সে।

'আমার নাম কিন-ফো,' সে শুরু করলে। 'ওয়াং আপনার পুরোনো বন্ধু ও সহযোগী ছিলেন। ওয়াং কে আমি একটা চিরকুট দিয়েছিলুম — তাতে বিশেষ একটা চুক্তি সম্পাদন করা ছিলো। ওয়াং সেই চিরকুটটা আপনাকে দিয়ে গেছেন। আমি এই কথাটি বলতেই এসেছি যে ওই চুক্তি এখন আর বৈধ নয়। আমি আপনার কাছ থেকে চিরকুটটা ফিরে চাই।'

তাই-পিং-এর একটি পেশিও ঈষৎ কম্পিত হ'লো না, সে যদি ব্রনজ নির্মিত হ'তো তাহ'লেও বোধকরি এত অচঞ্চল থাকতে পারতো না।

'তার বিনিময়ে আপনি যে-কোনো দাম চাইতে পারেন,' ব'লে, কিন-ফো উত্তরের জন্য অপেক্ষা করলো।

কিন্তু কোনো উত্তর এলো না।

কিন-ফো ব'লে চললো, 'যে-ব্যাঙ্কে চান, সেই ব্যাঙ্কের নামে আমি চেক লিখে দিচ্ছি। যাকেই পাঠাবেন, সে-ই যাতে টাকাটা পায়, আমি তার গ্যারান্টি দিচ্ছি। কেবল একবার মুখ ফুটে বলুন কত টাকা পেলে চিরকুটটা আপনি ফিরিয়ে দেবেন।'

তবু কোনো উত্তর এলো না।

কিন-কো আরো স্পষ্ট ক'রে ধীরে-ধীরে তার কথার পুনরাবৃত্তি করলে, 'কত চান? পাঁচ হাজার তায়েল?'

তবু স্তব্ধতা অটুট থেকে গেলো।

'দশ হাজার?'

লাও-শেন আর তার দলবল যেন পাথরের মূর্তি।

কিন-কো উদ্বিগ্ন ও অধীর হ'য়ে উঠলো।

'আমার কথা শুনতে পাচ্ছেন না আপনি?'

লাও-শেন গম্ভীর ভাবে মাথা হেলিয়ে জানালো যে সে শুনতে পেয়েছে।

'তিরিশ হাজার তায়েল দেবো আমি আপনাকে। সেক্টেনারিয়ানদের কাছ থেকে যত টাকা পেতেন, সেই টাকাই আপনাকে দেবো। কাগজটা আমার চাই। বলুন, কত চান, একবার বলুন কেবল।'

তাই-পিং আগের মতোই চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলো।

উত্তেজনায় ও অস্বস্তিতে অধীর হ'য়ে উঠলো কিন-কো। হাত মুঠো ক'রে সবেগে সে ছুটে গেলো মঞ্চের কাছে। 'কত টাকা চান আপনি, কত টাকা?'

'টাকা দিয়ে সে কাগজ তুমি কিনতে পারবে না,' অবশেষে স্পষ্ট, কঠিন ও নির্মম গলায় ব'লে উঠলো তাই-পিং 'তুমি ভগবান বুদ্ধের কাছে দোষ করেছো: তথাগত তোমাকে যে-জীবন দিয়েছেন, সেই জীবনকে তুমি ঘৃণা করতে শুরু করেছিলে। ভগবান বুদ্ধের অবমাননার শাস্তি তোমাকে পেতে হবে। জীবন যে কত বড়ো মহান উপহার, তাকে যে তোমার মতো হালকা-ভাবে নেয়া যায় না, এটা তুমি বুঝতে পারবে কেবল মৃত্যু হ'লে।'

যে-স্বরে এই সিদ্ধান্ত জানানো হ'লো তাতে এটা বোঝা গেলো যে উত্তর দিয়ে কোনো লাভ হবে না, আর তাছাড়া কিন-কো যদি নিজের সপক্ষে কিছু বলতেও চাইতো, তাহ'লে সে সুযোগ সে কিছুতেই পেতো না। লাও-শেন ইঙ্গিত করবামাত্র তাকে ধ'রে সজোরে বের ক'রে নিয়ে একটা খাঁচায় ঢুকিয়ে দিয়ে তার দরজাটা সশব্দে বন্ধ ক'রে দেয়া হ'লো। হাউমাউ ক'রে কান্নাকাটি করা সত্ত্বেও সুনেরও সেই একই দশা হ'লো।

'ভালোই হ'লো!' একা হ'য়ে আপন মনে বললে কিন-কো, 'যারা জীবনকে অপছন্দ করে মৃত্যুই বুঝি তাদের একমাত্র প্রাপ্য।'

কিন্তু মৃত্যু তাই ব'লে মোটেই নিকটবর্তী ছিলো না। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেলো, কিন্তু কেউ তাকে বধ করলে না। তাই-পিং হয়তো তাকে অকথ্য যন্ত্রণা দিয়ে মারতে চায়: কি-কো মনে-মনে ভাবতে চেষ্টা করলো আর

কী নিগ্রহ তার কপালে আছে। একটু পরে তার কেমন যেন মনে হ'লো খাঁচাটা ধরাধরি ক'রে নিয়ে কোনো শকটে তুলে দেয়া হ'লো। বোঝা যাচ্ছে তাকে দূরে-কোথাও নিয়ে যাওয়া হবে। প্রায় আধঘণ্টা ধ'রে একটানা ঘোড়ার খুরের আওয়াজ শোনা গেলো, শোনা গেলো পাহারাওলাদের অস্ত্রশস্ত্রের ঝনঝনানি, আর নির্দয়ভাবে সারাক্ষণ তার খাঁচাটা বারে-বারে ধাক্কা খেলো, নড়ে-চড়ে উঠলো। তারপরে খানিকক্ষণ কোনো সাড়াশব্দ নেই—পরে বোঝা গেলো বুঝি অন্য-কোনো যানবাহনে তোলা হ'লো তার খাঁচাটা, একটা গুঞ্জন উঠলো চাকার, হতাশ বন্দীটি বুঝতে পারলো যে কোনো স্টিমারে তোলা হয়েছে তাকে।

'জাহাজ থেকে জলে ফেলে দিতে চায় নাকি আমাকে?' মনে মনে ভাবলে সে, 'তাহ'লে বলতেই হয় যথেষ্ট দয়া দেখালে—এর চেয়ে ভীষণ-কোনো নিগ্রহের ব্যবস্থা করলো না যখন—'

একে-একে আটচল্লিশ ঘণ্টা কেটে গেলো। দিনে দু-বার খাঁচার দরজা খুলে সামান্য খাদ্য দেয়া হ'তো তাকে, বাড়িয়ে দেয়া হাতটি ছাড়া আর-কিছুই দেখতে পেতো না সে—কে তাকে খাবার দিচ্ছে তাও না, কত প্রশ্ন জিগেশ করেছে সে তখন, কিন্তু কোনো উত্তরই আসেনি।

অঢেল অবসর তার এখন—যতক্ষণ খুশি ভাবতে পারে শুয়ে-ব'সে। বছরের পর বছর কেটে গেছে কোনো মানবিক অনুভূতিই সে বোধ করেনি, কিন্তু মানুষ হ'য়ে জন্মেছে যখন, তখন মানুষের আবেগ-অনুভূতি অনুভব না-ক'রে তার উপায় কী! তাই বুঝি গত কয়েক সপ্তাহে চূড়ান্তই হ'লো সবকিছুর: মানুষের যত রকম অনুভূতি হয়, সব সে অনুভব করলো যথেষ্ট মাত্রায়, জানে যে মরতে তাকে এখন হবেই—কিন্তু একটা তীব্র ইচ্ছে তাকে বেঁধে ফেললো—যেন মরবার আগে দিনের আলো দেখতে পায় সে; আচমকা অজ্ঞাতসারে তাকে যদি গভীর সমুদ্রে ছুঁড়ে ফেলে দেয়, এই ভয়ে এখন তার সর্বাঙ্গে শিহরন খেলে যায়। হায়রে! যদি মরবার আগে অন্তত একবার দেখতে পেতো দা-ওকে, দা ও, তার সর্বস্ব, তার সমস্তকিছু—আর তাকে দেখতে পাবে না সে! এই চিন্তাও যে কী ভয়ানক!

শেষ পর্যন্ত সমুদ্রযাত্রাও শেষ হ'য়ে গেলো। তবু এখনো সে বেঁচে আছে, কিন্তু এবার নিশ্চয়ই তার জীবনের শেষ কটি মুহূর্ত সমাগত, আর এটাই ছিলো তার চরম ভয়। প্রত্যেকটি মিনিট এখন তার কাছে এক বছর ব'লে ঠেকে, এক ঘণ্টাকে একশো বছর ব'লে মনে হয়!

কিন্তু তার বিস্ময় অসীমে পৌঁছে গেলো : হঠাৎ অনুভব করলো আবার তার খাঁচাটি বহন ক'রে নিয়ে যাচ্ছে কারা, কোন-এক অজ্ঞাত জায়গায় নিয়ে গিয়ে রাখলো যেন, বাইরে লোকজনের সাড়া পেলো সে, কয়েক মিনিট পরে দরজা খুলে গেলো খাঁচার, আর চট ক'রে তাকে ধ'রে তার চোখের উপর একটা পট্টি বেঁধে দেয়া হ'লো, তারপর সজোরে তাকে ধাক্কা দিতে-দিতে নিয়ে গেলো পথ দিয়ে। কিছুক্ষণ পরে সে বুঝতে পারলো তার সঙ্গের লোকজনের পায়ের শব্দ থেমে গেছে : এটা যে বধ্যভূমি, তাতে তার আর সন্দেহ রইলো না, সে চেঁচিয়ে উঠলো, 'একটা শেষ অনুরোধ আছে আমার। একটা মাত্র অনুরোধ, আমার চোখ খুলে দাও— দিনের আলো দেখতে দাও আমায়— মানুষের মতো মরতে দাও আমাকে— মরতে আমি যে ভয় পাই না এটা বোঝাতে দাও।'

'দাও, অপরাধীর শেষ প্রার্থনাটা পূরণ ক'রে দাও,' কে যেন তার কানের পাশেই গম্ভীর স্বরে ব'লে উঠলো : 'চোখের উপর থেকে বাঁধন খুলে দাও ওর।'

বাঁধন খুলে দিতেই কিন-ফো অবাক বিস্ময়ে কেঁপে উঠলো। স্বপ্ন দেখছে নাকি সে? অর্থ কী এর?

তার সামনেই সুচারু ভোজ্য-সম্ভারে সাজানো খাবার-টেবিল। পাঁচজন অতিথি ব'সে মৃদু মৃদু হাসছেন, যেন তাঁরা এতক্ষণ তারই আগমন প্রত্যাশা করছিলেন। একটা আসন এখনো ফাঁকা প'ড়ে আছে।

'আমি কি পাগল হ'য়ে গেছি?' কিছুই বুঝতে না পেরে উত্তেজিত স্বরে চেঁচিয়ে উঠলো কিন-ফো।

নিজেকে সামলাতে বেশ কিছুক্ষণ লাগলো তার, চোখ কচলে চার পাশে তাকিয়ে দেখলো সে ভালো ক'রে। তার ভুল হয়নি : এ তো ওয়াং, আর এই তার চার বাল্যবন্ধু, ইন পাং, হুআল, পাও-শেন আর টিম। দু-মাস আগে কোয়াংতুঙের পার্ল রিভারের বজরায় ব'সে যাদের সঙ্গে সে ভোজ খেয়েছিলো। এই তো এটা তার শাংহাইয়ের ইয়ামেনের খাবার ঘর।

'বলো, বলো,' চেঁচিয়ে উঠলো সে। 'এ-সবের মানে কী? ও কি সত্যি তুমি, না তোমার ভূত?'

দার্শনিক মুচকি হাসলো। 'ভয় নেই, আমি সত্যিই ওয়াং!'

কিন-ফো আরো যেন হতভম্ব হ'য়ে গেলো। ওয়াং তখন বোঝালো : 'বেশ শিক্ষা হ'লো তোমার, কী বলো? অবশেষে জীবনের কাছে একটি নির্দয় পাঠ নিয়ে তুমি বাড়ি ফিরে এসেছো। এই পাঠটা অবশ্য আমারই কাছে তুমি

পেলে। তোমাকে যে এত কষ্ট সইতে হ'লো, তার জন্য আমিই দায়ী। কিন্তু সবই করেছি তোমার ভালোর জন্য, কাজেই আমাকে তোমায় ক্ষমা করতে হবে।'

কিন-ফো আরো হতভম্ব হ'য়ে চুপচাপ তার মুখের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

'এক্ষুনি সব বুঝিয়ে দিচ্ছি,' বললে ওয়াং, 'তোমার অনুরোধে তোমাকে হত্যা করতে কেন সম্মত হয়েছিলুম, জানো? যাতে অন্য-কারু হাতে সে-ভার তুমি না-দাও। তোমার আগেই আমি জানতে পেরেছিলুম যে তোমার ওই সম্পত্তি হারাবার খবর সবৈব মিথ্যা, সেই জন্যেই আমি বুঝতে পেরেছিলুম যে এখন মরতে চাইলে কী হবে, একটু পরেই বাঁচবার জন্যে তুমি ব্যাকুল হ'য়ে উঠবে। আমি আমার প্রাক্তন সহযোগী লাও-শেনকে সব খুলে বললুম। লাও-শেন এখন সরকারের অতিবিশ্বস্ত বন্ধুদের একজন: বহু আগেই সে বর্তমান সরকারের আনুগত্য স্বীকার ক'রে নিয়েছে, কিন্তু এই ব্যাপারে সে আমায় সহযোগিতা করতে রাজি হ'লো—আর করলো, গত কয়েকদিনের অভিজ্ঞতা থেকেই তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছো কেমন ক'রে তোমাকে একেবারে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দিয়েছিলো সে। জীবনের মূল্য বোঝবার জন্য এটা তোমার দরকার ছিলো ব'লে আমার মনে হয়েছিলো। যে-নিগ্রহ আর উৎপাত তুমি সহ্য করেছো, যে কষ্ট তুমি পেয়েছো এ-ক'দিন, তাতে প্রতিদিন যেন আমারই বুক ফেটে রক্ত ঝ'রে পড়েছে। এই দুঃখ-কষ্টের মধ্যে তোমাকে একা ছেড়ে দিতে আমার বুক ফেটে যাচ্ছিলো—কিন্তু আমি এটা জানতুম আর কোনো সহজ উপায়ে তোমাকে শেষ অবধি সুখের সন্ধান দেয়া যাবে না।'

ওয়াং আর-কিছু বলবার আগেই কিন-ফো তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলো। 'বেচারা ওয়াং! আমার জন্য কত কষ্টই না-জানি তোমাকে সইতে হয়েছে! আর তাছাড়া তুমি ঝুঁকিও খুব-একটা কম নিয়েছিলে নাকি! পালিকাওর সেতুর উপর সেদিন যা হয়েছিলো, তা আমি কোনোদিনও ভুলবো না।'

দার্শনিক হো-হো ক'রে প্রাণখোলাভাবে হেসে উঠলো। 'সত্যি, কনকনে ঠাণ্ডা ছিলো জলটা—যে-কোনো লোকেরই রক্ত জ'মে যেতো ঠাণ্ডায়; তায় আমি হলুম পঞ্চাশ বছরের বৃদ্ধ। অনেকটা পথ তাড়া খেয়ে খেয়ে একশা হ'য়ে গিয়েছিলুম। আমার দর্শন আর বয়েস—দুয়ের উপরই সেদিন ভীষণ ঝড় গিয়েছে। কিন্তু ভেবো না, তাতে কোনো বিপদ হয়নি। অন্তের উপকার

-করতে গেলে লোকে যত জোরে দৌড়ুতে পারে, তেমন বোধহয় আর কখনো পারে না।'

'অন্যের উপকার? সত্যি, আমার আর এতে কোনো সন্দেহ নেই। অন্যের ভালোর জন্য কাজ করাতেই যে সুখ, তাতে সত্যি বল'ছ আমার আর-কোনো সংশয় নেই।'

আলোচনাটা আরো তত্ত্ববহুল হ'য়ে পড়তো হয়তো যদি না তখন সুনের আবির্ভাব ঘটতো। দু-দিন সমুদ্রযাত্রায় থকলে বেচারা একেবারে কাহিল হ'য়ে পড়েছে। তার গায়ের রঙ কী হ'য়ে পড়েছিলো তা বলা মুশকিল, কিন্তু প্রভুগৃহে পুনঃপ্রবেশ করতে পেয়ে তার আহ্লাদের সীমা ছিলো না।

ওয়াংকে ছেড়ে দিয়ে কিন-ফো এবার ঘুরে-ঘুরে তার বন্ধুদের সঙ্গে একে-একে করমর্দন করলে। 'কী আহাম্মকই ছিলুম এতকাল!' বললো সে সবাইকে।

'কিন্তু এখন থেকে তুমি নিশ্চয়ই পরমজ্ঞানী হ'য়ে উঠবে,' বললে ওয়াং।

'তাহলে আমার প্রথম 'বিচক্ষণতার' পরিচয় দেয়া হবে, যদি এক্ষুনি সব ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করতে পারি। আমার সব বিপত্তির মূল ওই চিরকুটটা না-পেলে আমার কিছুতেই স্বস্তি হবে না। যদি ওটা লাও-শেনের কাছে থেকে থাকে, তাহ'লে ফিরিয়ে দিতে বলো, কারণ কোনো বিবেকহীন লোকের হাতে পড়লে সর্বনাশ হয়ে যাবে।'

ঘরসুদ্ধ লোকের মুখে মুচকি হাসি ফুটে উঠলো।

ওয়াং বললে, 'বন্ধুটির সব রোমহর্ষক অভিজ্ঞতা তার চরিত্রটা একেবারে আমূল বদলে দিয়েছে। আর সেই নির্লিপ্ত মানুষটি নেই।'

কিন-ফো তবু বললে, 'কিন্তু বললে না তো চিরকুটটা কোথায় আছে। চিঠিটা পুড়িয়ে ফেলে তার ছাই উড়িয়ে না দেয়া অবধি আমি কোনো শান্তি পাবো না।'

ওয়াং বললে, 'তোমাকে বড্ড উৎসুক দেখাচ্ছে—'

'উৎসুক হবো না?' বললে কিন-ফো, 'কিন্তু চিরকুটটা কই? লাও-শেন ফিরিয়ে দিয়েছে কি?'

'লাও-শেনের কাছে ছিলোই না কোনোদিন।'

'তাহ'লে তোমার কাছে আছে? তুমি নিশ্চয়ই আমাকে ফিরিয়ে দিতে দ্বিরুক্তি করবে না? আমার আহাম্মকির পুনরাবৃত্তি যাতে না-হয় তার গ্যারান্টি হিশেবে নিশ্চয়ই ওটা রাখতে চাইবে না তুমি?'

'নিশ্চয়ই না।' বললে ওয়াং, 'কিন্তু চিরকুটটা তো আমার কাছে নেই। সত্যি বলতে আমার কোনো অধিকারই নেই ওটার উপর!'

'তার মানে!' কিন-ফো চেঁচিয়ে উঠলো, 'নিশ্চয়ই তুমি বোকার মতো সেটা অন্য-কাউকে দিয়ে যাওনি?'

'তা-ই করেছি কিন্তু,' উত্তর দিলো ওয়াং।

'কেন? কখন? কাকে দিয়েছো?' কিন-ফো ব্যাকুল হ'য়ে উঠলো।

'দিয়েছি —' ওয়াং শান্ত গলায় শুরু করলো।

'কাকে? কাকে দিয়েছো?' বাধা দিয়ে জিগেশ করলো কিন-ফো।

'বলবার সময়টা দিচ্ছো কই? এমন একজনকে দিয়েছি যে নিজেই তোমাকে ওটা ফিরিয়ে দেবার জন্য ব্যাকুল হ'য়ে আছে।'

তার কথা শেষ হবার আগেই কিন-ফো দেখতে পেলে তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে লা-ও, তার বাড়িয়ে-ধরা কোমল হাতে রয়েছে চিরকুটটা; পরদার আড়াল থেকে এতক্ষণ সে সব শুনেছে — এখন আর থাকতে না-পেরে এগিয়ে এসেছে কিন-ফোর কাছে।

'লা-ও!' ব'লেই কিন-ফো তাকে বুকে জড়িয়ে ধরতে গেলো।

কিন্তু লা-ও পিছিয়ে গেলো — যেন যেমন রহস্যময়ভাবে ঘরে এসে ঢুকেছিলো তেমনিভাবেই চ'লে যাবে এক্ষুনি।

'ধীরে, অত তাড়াহুড়ো নয়!' লা-ও বললে, 'আনন্দ করার আগে কর্তব্য শেষ ক'রে নাও। তোমার হাতের লেখা ব'লে চিনতে পারছো এটাকে?'

'সে আর বলতে! জগতে এমন আহাম্মক আর দ্বিতীয় আছে না কি যে এ-রকম লিখবে?'

'সত্যি, এটাই তোমার মত?' লা-ও জানতে চাইলো।

'সত্যি।'

'তাহ'লে কাগজটা তুমি পুড়িয়ে ফেলতে পারো —,' বললে লা-ও, 'সেই সঙ্গে সেই মানুষটারও মৃত্যু হোক, যে এটা লিখেছিলো।' উদ্ভাসিত হেসে তাকে সে ওই ছোট্ট কাগজটা ফিরিয়ে দিলো — যা কিনা এতদিন তার এত যন্ত্রণা ও নিগ্রহের কারণ হয়েছিলো। মোমবাতির শিখায় তুলে ধরলো কিন-ফো কাগজটিকে, যতক্ষণ-না পুড়ে ছাই হ'য়ে গেলো ততক্ষণ তাকিয়ে রইলো একদৃষ্টে। তারপর বাগদত্তা বধূটির দিকে ফিরে তাকে সে বুক চেপে ধরলো, বললো, 'এবার তুমি এসে আমাদের পুনর্মিলন উৎসবের কর্ত্রী হও এখানে! ভোজ্যদ্রব্যের প্রতি যথেষ্ট সুবিচার করতে পারবো বোধহয় এখন।'

'তা আমরাও পারবো অবিশ্যি,' অতিথিরা একযোগে ব'লে উঠলো।

এর কয়েকদিন পরেই রাজশোকের মেয়াদ ফুরিয়ে গেলো। আগের চেয়েও জমকালো সব ব্যবস্থার পর বিয়ে হ'লো দুজনের।

নবদম্পতির ভালোবাসা আর ভাঙবে না কোনোদিনও। পরবর্তী জীবনটা তাদের এমন সুখে কাটতে লাগলো যে শাংহাইয়ের সেই ইয়ামেনে একবার পদার্পণ করলেই আপনি হয়তো অতি সহজেই তার সৌগন্ধ্য ও নির্যাস পেতেন।